আলোর ঠিকানা নেই

সুকন্যা

করুণা প্রকাশনী । কলকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৩৬৭

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা-৯

মুদ্রাকর
শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ
দি অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৯এ, বিধান সরণী
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী
খালেদ চৌধুরী

আমার দাদা

৺শিবদাস গঙ্গোপাধ্যায়কে

ঘুমের আমেজটা আচমকা কেটে গেল। টিনা দুচোখ মেলে সামনের দিকে তাকাল, আর তখনই বুঝতে পারল সে বিছানাতে শুয়ে নেই, রাতের খাওয়া মিটে যাবার পর রেক্সিনেঢাকা গদিমোড়া ডেক চেয়ারটিতে পায়ের ওপর কম্বল টেনে পেছনে মাথা হেলিয়ে সেই যে এসে বসেছিল, আর বিছানায় যায় নি। কখন ঘুম এসে গেছে জানে না।

ঘর অন্ধকার। টিনা হাত বাড়িয়ে বেডসাইড টেবিলের ওপর সুদৃশ্য ঝালরদেওয়া একটি উর্ধ্বমুখ কাশ্মীরী কাঠের পাখির ঠোঁটের ওপর বাল্‌ব-বসানো ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে ঘড়ি দেখল আটটা বেজে চল্লিশ। এমনিতে রাত বেশী নয়। কিন্তু সমুদ্রবক্ষ থেকে ছ-হাজার ফুট উঁচু হিমালয়ের বরফ-পাহাড়ে-ঘেরা শহরে রাত প্রায় ন'টা মানে যথেষ্ট রাত। রাতের নিস্তব্ধতা তখন থেকেই পাহাড়ের গায়ে গায়ে সেঁটে বসতে শুরু করেছে। আর বড়ো জোর ঘণ্টা দুয়েক। তারপর গোটা শহরটাই ঝিমিয়ে যাবে। সমস্ত রাত শহরটা কুণ্ডলি পাকিয়ে আচ্ছন্ন হয়ে থাকবে। নিঃশব্দ রাতে মাঝে মাঝে বয়ে যাবে হিমেল হাওয়া। শনশনিয়ে উঠবে হিমালয়ের জমিদারীতে মাথ-উঁচু করে দাঁড়িয়ে-থাকা প্রকৃতির দরোয়ান অসংখ্য দেওদার বাজ আর পাইনের ডালপালা। তাদের পরস্পরের মধ্যে কানাকানি মাতামাতি শুরু হবে। কেউ মাথা দোলাবে, কেউ দুখানা, তিনখানা ডাল নাড়াবে। কেউ বা পাতার পাতায় জড়াজড়ি করে সেই আলোচনায় যোগ দেবে। গোটা বনভূমি ফিসফিসিয়ে উঠবে। মনে হবে কোথায় যেন ঝর্ণার জল বয়ে যাচ্ছে।

টিনা উষ্ণ কম্বলটা সরিয়ে দিয়ে আস্তে উঠে দাঁড়াল। তার ছিপছিপে সাদা নরম শরীরটা কাঁধ থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত ঢাকা পড়ে আছে ঢিসঢিলে জাপানী পলিয়েস্টার নাইলনের রাত্রিবাসে।

মিস ভার্মা বলেছেন, শীত বাড়ছে, অতএব আগামী কাল থেকে গরম কাপড়ে তৈরী নাইটিতে গা ঢেকে টিনাকে শুতে হবে। এর যেন অন্যথা না হয়। টিনার গরম কাপড়ের নাইটি মোটেই পছন্দ নয়। তবু মিস ভার্মার মুখের ওপর নিজের স্বাধীন মতামত প্রকাশ করার সাধ্য নেই। তা হলে সেই কথা অভিযোগ হয়ে মা-বাবার কানে উঠবে। বাবা একটুও সময় নষ্ট না করে গুরুগম্ভীর ভাষায় চিঠি দেবে—"টিনা, তুমি আমাদের মেয়ে এবং সেই তোমার পরিচয়। আশা করি এই পরিচয়ের মর্যাদা রাখবে। সমাজে তোমার মা-বাবার সম্মান এতটুকু ক্ষুণ্ণ করবে না ·····"

বাবা মাঝে মাঝে কী কঠিন কঠিন বাংলা লেখে, বলে। টিনা ভাবে, বাবা যদি অত ভালো বাংলা জানে, লেখে, তবে সংসারে, সমাজে, চলনে, বলনে এমন সাহেব কেন ?

আর মা ! মার মুখটা স্পষ্ট ভেসে উঠল টিনার চোখের সামনে। কয়েকবছর আগের মা আর বর্তমানের মা, একই লোক, অথচ চেহারায় কত, কত পালটে গেছে। মাঝে মাঝে দুটো চেহারা একসঙ্গে হয়ে কেমন যেন একটা বিকৃত চেহারা টিনা চোখের সামনে দেখতে পায়। তখন শত চেষ্টা করেও মার ঠিক মুখখানা মনে করতে পারে না।

"মার চেহারা এত কেন পালটে গেল সন্তুমাসী"—টিনা মাঝে মাঝেই এই প্রশ্নটা করে বসে। উত্তরের আশায় বড়ো বড়ো চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে মার গ্রামসুবাদে অনাথা বোন সন্তুমাসীর দিকে।

সন্তুমাসী বর্তমানে টিনাদের মস্ত বড়ো বাড়ির সব কাজের লোকদের তত্ত্বাবধায়িকা। এই পদে সন্তুমাসীকে মা-ই বসিয়েছে। দূর সম্পর্ক হলেও বোন তো বটে, তাকে তো পরিচারিকা বলা চলে না।

"অবস্থা পাল্টালে চেহারা, কথাবার্তা সব পালটে যায়, এটাই নিয়ম ··" সন্তুমাসী টিনার বারবার একই প্রশ্নের প্রত্যেকবার ঐ একই উত্তর দেয়। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা কথা প্রত্যেক বারই যোগ

করে—"ভাগ্যিস তোর মা তোর বাবার মতো অমন স্বামী পেয়েছে, তার পাশে পাশে আজ এত উঁচুতে উঠেছে, তাই না সে আশ্রয়হীন, সহায় নেই, সম্বল নেই, আমার মতো গ্রামমুখ্যাদে বোনকে কোলকাতায় নিয়ে এল, আমাকে বেঁচে থাকার পথ দেখাল, নইলে আমি তো এই পৃথিবী থেকে কবে উবে যেতাম ··"

এই সন্তমাসীর কোল ঘেঁষে বসে সাত-আট বছর বয়স থেকে টিনা কতবার মা-বাবার বিয়ের রূপকথা শুনেছে। সন্তমাসী মুখ উজ্জ্বল করে বলেছে, টিনা দু'চোখে কৌতূহল ভ'রে শুনেছে।

বাবা সমীর ব্যানার্জী, মা বিয়ের আগে জয়া ভট্টাচার্য। নবদ্বীপের শশাঙ্ক ভট্টাচার্য তর্করত্নের ছোট মেয়ে। কত ছোট বয়স থেকে ঐ মেয়ে বাবার মাটির ঘরের দাওয়ায় বসে হারিকেনের আলোর মৃদু কণ্ঠে মুখস্থ করত সংস্কৃত ধাতুরূপ, শব্দরূপ। পণ্ডিতমশাই মেয়েকে মুখে মুখে শেখাতেন সংস্কৃত ব্যাকরণ, পাণিনি ব্যোপদেবের টীকা শুদ্ধ সংস্কৃত ব্যাখ্যা। শেখাতেন আর উৎসাহে উত্তেজিত হতেন মেয়ের মেধা দেখে, স্মরণশক্তি দেখে। আশ্চর্য, একবার বললেই কোনো মেয়ে, ছেলেমানুষ একটা মেয়ে, এমনভাবে সব মনে রাখতে পারে!

গোঁড়া পণ্ডিতমশাই কোনদিন ধারণাও করতে পারেন নি তাঁর মেয়ে লেখাপড়া শিখবে। লেখাপড়ার জন্যই সে বড়ো হবে। এক মাইলের মতো রাস্তা হেঁটে গিয়ে সে মেয়েদের হাইস্কুলে পড়বে এবং সেখান থেকে স্কুলের শেষ পরীক্ষায় সংস্কৃত ও অঙ্কে লেটার নিয়ে প্রথম বিভাগে পাস করবে।

স্কুলে বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী উৎসব হল। উৎসব সভায় সভাপতির পদে ছিলেন স্থানীয় এস. ডি ও.। তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন আরেকটি ভদ্রলোক। এস. ডি. ও. পরিচয় দিয়েছিলেন তাঁর বন্ধু অতিথি বলে।

সে বছরের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার নিতে এগিয়ে এল স্কুলের সেরা মেয়ে জয়া ভট্টাচার্য। সেদিন সে পরেছিল অতি সাধারণ একটি মিলের

শাড়ি। ঘাড়ের ওপর চুলের রাশি টেনে মস্ত একটা হাতখোঁপা বাঁধা ছিল, চুলেঢাকা ছোট্ট কপালে ছিল কুমকুমের টিপ।

জয়া ভট্টাচার্য যখন দুহাত জড়ো করে বুক ভর্তি বই নিল, গলায় মেডেল পরল, তখন সভাপতির ঐ বন্ধু ভদ্রলোকটি ঝুঁকে পড়ে দেখলেন জয়া ভট্টাচার্যের মাথা থেকে পা পর্যন্ত।

পুরস্কার দেবার সময় এস. ডি. ও. সাহেব জিজ্ঞেস করলেন—"কলেজে কী নিয়েছো, সায়েন্স না আর্টস!"

"আমি তো কলেজে ভর্তি হইনি··" মেয়েটি এস. ডি ও. সাহেবের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে উত্তর দিল।

এস. ডি. ও. কিছু বলবার আগেই বন্ধু ভদ্রলোকটি বলে উঠলেন, "এমন মেয়ে আর পড়বে না··!"

"না, আমি আর পড়বো না"—মেয়েটি স্পষ্ট উচ্চারণে কথাটা বলে সভামঞ্চ থেকে নেমে গেল। ভদ্রলোকটির বিস্মিত দৃষ্টি বেশ কিছুক্ষণ মেয়েটির পিছু পিছু অনুসরণ করে গেল।

এস. ডি. ও. সাহেব মৃদুস্বরে বন্ধুকে বললেন, "কিহে, একেবারে যে মুগ্ধবোধ···।"

"অকারণে নয়···"

"পরিচয় জানি, এই অঞ্চলের এক ডাকসাইটে পণ্ডিতের মেয়ে· "

"পরে আলোচনা করবো। লক্ষ্য করেছ নিশ্চয়ই মেয়েটি প্রাইজ নিয়েই চলে গেছে! আমার কৌতূহলটা বোধ হয় ওর বুদ্ধির তারে বেমক্কা ঘা মেরেছে ··।"

টিনা আড়ামোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়াল। এখন আর ঘুম আসছে না। আসবেও না। কদিন ধরেই এই জিনিসটি হচ্ছে, টিনা কাউকে বলেনি। বলেনি রীতা ভার্মাকেও। রীতা ভার্মা জানতে পারলেই তো হৈচৈ করে একটা রীতিমতো নাটক তৈরী করবেন। ডাক্তার আসবে, ওষুধ খেতে হবে, আরও কত কী করতে হবে। তার চাইতে চুপচাপ থাকাই ভালো।

ঠিক পাশের প্রশস্ত ঘরটি হল ড্রইং-কাম-ডাইনিং রুম। খাবার জায়গা আর সোফা সেটের মাঝখানে সিলিং থেকে নাইলন নেটের পর্দা নেমে এসেছে মেঝেয়-বিছনো পুরু কার্পেট পর্যন্ত। মাঝখান দিয়ে চেরা পর্দা দুদিকে গুটনো। ঘরটিকে ভালো করে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় এককালে কত সুন্দর, কত ঝকমকে করে ঘরখানা সাজানো ছিল। এখনও আছে, তবে কি যেন নেই। কেন নেই টিনা জানে। টিনা অনেকবার সেই গল্প শুনেছে। ঐ বড় ঘরখানা মিসেস দয়ালের। মিসেস সুভদ্রা দয়াল। যিনি শুধু পাশের ঘরটির নয়, সমস্ত সুন্দর বাড়িটারই মালিক। সুভদ্রা দয়াল এখনও ঘুমোননি। উনি অবশ্য এখন আর ঘুমোন না। ঘুমপাড়ানি ট্যাবলেটের মন্ত্রে সারারাত আচ্ছন্ন হয়ে থাকেন, আর সেই আচ্ছন্ন অবস্থাতে মাঝে মাঝেই ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠেন, নিজের মনে কিসব বিড়বিড় করেন, আবার আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন।

মিসেস দয়াল এখনও বিছানায় যান নি। পিয়ানোর রীডে আঙুল খেলিয়ে যাচ্ছেন। শুতে যাবার আগে অন্তত একঘণ্টা পিয়ানো বাজানো সুভদ্রা দয়ালের দৈনন্দিন রুটিন ছিল। স্বামীর অনুরোধে এ কাজে তাঁকে বসতে হতোই। সুভদ্র দয়াল সুরের জাল বুনতেন আর স্বামী হরিশঙ্কর দয়াল নিজের স্ত্রীভাগ্যের তারিফ করতেন। সুভদ্রা দয়াল তারিফ করতেন স্বামীভাগ্যের, স্বামীপ্রেমে এমন সৌভাগ্যবতী কে!

ঠিক দশ বছর আগে। টিনা হাতের কড় গুণে গুণে হিসেব করল। টিনার বয়স তখন সবে ছয়। সেপ্টেম্বর মাসে একুশ তারিখে জন্মদিনের উৎসব হল, আর অক্টোবর মাসের পুজোর সময় বাবা মা টিনাকে নিয়ে বেড়াতে এল হিমালয়ের এই উপনিবেশে। এতটা টানা রেলগাড়িতে চেপে, তারপর বাসে চড়ে এতদূর বেড়াতে আসা টিনার জীবনে এই প্রথম।

কী শীত তখন এই দেশে। তবু মা কোন্ ভোরে উঠে ঘরের এক কোণে টেবিলের ওপর স্পিরিট ল্যাম্প জ্বালিয়ে টিনার জন্য হরলিক্স আর নিজেদের জন্য কফি তৈরি করে ডিশে বিস্কুট সাজিয়ে বসবার জায়গায় সেন্টার টেবিলে রাখত। টিনাকে বিছানা থেকে গরম র‍্যাপার জড়িয়ে টেনে তুলে গরম জলে মুখচোখ ধুইয়ে একেবারে বাবার পাশে ঝুপুস করে বসিয়ে দিত। বাবা তখন শীতে কাঁপতো। মুখে হুহু শব্দ করে টিনাকে জড়িয়ে নিজের গায়ের সঙ্গে সেঁটে ধরে বলতো—"গায়ে গা লাগিয়ে বোস বুড়ি, নইলে শীত যাবে না…।"

আশ্চর্য, আজকাল বাবা দিনে বা সপ্তাহে তো নয়-ই, মাসেও একবার বুড়ি বলে ডাকে কিনা সন্দেহ। অথচ বাবার আদরের ডাক ছিল বুড়ি! এখন শুধু টিনা। মা ডাকে টিনা, বাবা ডাকে টিনা। কিন্তু তার নাম তো টিনা নয়। আসলে তার নাম টিয়া। নবদ্বীপের পণ্ডিত দাদু নাতনীর নাম রেখেছিলেন টিয়াপাখি। তার ঠোঁট দুটি নাকি টিয়াপাখির ঠোঁটের মতো টুকটুকে লাল।

নবদ্বীপের দাদুর কথা আবার মনে পড়ে গেল। কদিন ধরেই মামার বাড়ির কথা খালি খালি মনে পড়ছে। জ্ঞান হয়ে টিনা সবশুদ্ধ চারবার গিয়েছিল নবদ্বীপে। প্রথম দুবার ট্রেনে, শেষের দুবার গাড়িতে। বাবার নিজের মোটরে। প্রথমবার মোটর চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিল বাবা নিজে। তার পরের বার বাড়ির ড্রাইভার হরি সিং। ততদিনে বাবার আরেকখানা গাড়ি হয়েছে। প্রথমখানা অ্যামব্যাসাডার, পরেরটা ফিয়াট। বছর দুয়েক বাদে অ্যামব্যাসাডার গিয়ে এলো লিমোসিন। বর্তমানে এসেছে আরেকটা ইমপালা। একজনের জায়গায় দুজন ড্রাইভার।

বাবা যেদিন বাড়ি এসে তিন নম্বর গাড়ি কেনার খবরটা মাকে দিল, টিনার মনে আছে, মা, সাজ-গোজ করা সুন্দরী মা, একটু হেসে বলেছিল, "তবু যাই হোক, এতদিন পর নিজের সম্মানের দিকে তাকিয়েছো।"

বাবা টিনার সামনেই মায়ের গাল দুটি টিপে বলেছিল—"শুধু তোমার মুখের এই হাসিটুকুর জন্য।"

মা এক ঝট্‌কায় মুখটা সরিয়ে নিয়ে বলেছিল—"আঃ, মেয়ে বড়ো হয়েছে।" তারপরেই গলা নামিয়ে বলেছিল, "দেখো, কারুর যেন আবার চোখ না টাটায়।"

"বা রে, আমার ব্যবসায় উন্নতি হচ্ছে, আর গাড়ি বাড়ি হবে না?"

"হবে নিশ্চয়ই, তবু " মা বাবার দিকে কেমন একটু বাঁকা চোখে তাকাল। বাবা তাড়াতাড়ি বলে উঠল— "ও নিয়ে তুমি বেশী মাথা ঘামিও না। ন্যায় নীতি দিয়ে সব সময় সব ব্যবসা চলে না।"

টিনা এখন জানে বাবার ব্যবসার এটাই হল সার কথা। ন্যায়-নীতির বালাই রাখলে চলে না। আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-পড়শী সকলেই আড়ালে আবডালে বাবার অতি দ্রুতগতিতে বেড়ে-যাওয়া ঐশ্বর্য নিয়ে অনেক আলোচনা করে, অনেক কিছু বলে, অনেক কৌতূহল দেখায়।

টিনার নিজের মনেও বড়ো কম কৌতূহল নেই। কোথায় ছিল বাগবাজারে একতলার দুখানা ঘরের ফ্ল্যাটে। টিনা জ্ঞান হয়ে অবধি তো ঐ বাড়িকেই দেখেছে, মা তখন কত সহজ সাদাসিধে ছিল, কত কাছে ছিল, কত মিষ্টি ছিল। মা তখন টিনাকে নিজের হাতে স্নান করিয়ে ধুইয়ে মুছিয়ে দিত। নিজের হাতে খাইয়ে দেখতো মেয়ের ঠিক পেট ভরেছে কিনা। তারপর বাড়িতে-কাচা ইস্ত্রি-করা জামা পরে টিনাকে মা হাত ধরে স্কুলে দিয়ে আসতো, আবার নিয়ে আসতো। একটা ছোট টিনের বাক্সে মা বইপত্তর গুছিয়ে দিত। একপাশে থাকতো টিফিন কৌটো। মা তাতে ভরে দিত পাঁউরুটি, কলা তার সঙ্গে কখনও সন্দেশ, কখনও একটুকরো কেক। আব্দার করলে দুখানা পরোটা আর ঝাল ঝাল আলু চচ্চড়ি। টিনার কি প্রিয় টিফিন ছিল মার নিজের হাতে তৈরী নরম মুচ্‌মুচে পরোটা আর তার সঙ্গে আলু চচ্চড়ি। মা অবশ্য প্রত্যেকবারই বলতো— "ঘিয়ে ভাজা খাবার বেশী দেবো না, হজম হবে না, পেট কামড়াবে।"

মা ঐ কথা বললেই বাবা বলে উঠতো—"মেয়েটাকে একটু খেতে দাও তো ও যা ভালবাসে, কেবল টিক্‌টিক্ করবে।"

বাবা টিনাকে কাছে টেনে কানের কাছে মুখ নিয়ে বলতো—"চল্ বুড়ি, আমি আর তুই ঐ মোড়ের রেস্টুরেন্ট থেকে আচ্ছা করে মোগলাই পরোটা আর কষা মাংস খেয়ে আসি আর তোর মার জন্য নিয়ে আসি, দেখি তোর মা তখন কেমন না খায়।"

পাশের ঘরে পিয়ানোর রীডগুলো ঝনঝনিয়ে উঠলো। একটা কুকুর ডেকে সতর্ক সাড়া দিল। গলার আওয়াজেই বোঝা যায় অভিজাত কুকুর।

রিও নামে কুকুরটাকে টিনারও খুব পছন্দ। খাঁটি জার্মান শেফার্ড। চলতি কথায় অ্যালসেসিয়ান। দশ বছর আগে টিনা আর তার বাবা-মা রিওকে প্রথমে দেখেছিল। রিওর তখন সবে এক বছর বয়স হয়েছিল। তাতেই যা চেহারা ছিল, টিনা প্রথমটায় আঁতকে উঠে বাবাকে জড়িয়ে ধরেছিল।

টিনার এখনও সব ছবির মতো মনে আছে। সেই দশ বছর আগে এখানে বেড়াতে আসার একদিন পরেই ভোর না হতে মা তাড়াতাড়ি করে টিনাকে জাগিয়ে মোটা মোটা গরম জামা, মোজা পরিয়ে টুপি দিয়ে কান মাথা ঢেকে বাবাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। রাস্তায় কী তাড়াতাড়ি বাবা-মা হেঁটে গিয়েছিল। মুশকিল হল রাস্তা পার হতে গিয়ে। মা, বাবা, টিনা তিনজনকেই থমকে দাঁড়িয়ে থাকতে হল। মা ছেলেমানুষের মতো দুঃখ করছিল। বাবা একটু হেসে বলেছিল—"কি আশ্চর্য, সূর্যঠাকুর তো আবার কালকেও উদয় হবেন। সান-রাইজ তো আজকেই শেষ হয়ে যাচ্ছে না!"

"তা যাচ্ছে না, কিন্তু রোজ রোজ তো এই শীতে সাত সকালে উঠে এই বাচ্চাটাকে টেনে বাইরে বেরুতে পারবো না।" মার গলায় ক্ষোভ ঝরে পড়ছিল।

বাবার ওপরেও তো মা পুরো ঝালটা ঝাড়তে পারছিল না।

দোষটা তো আর বাবার নয়। দোষটা ছিল ঐ শহরের মালটানা ট্রাকগুলোর। উত্তর দিকে একটা আপেল বাগান ছাড়িয়ে আরও উঁচুতে পাহাড়ের মাথায় একটা বিরাট মিলিটারী ক্যান্টনমেণ্ট। সেখান থেকে এক নাগাড়ে খাকি রঙের মিলিটারী ট্রাক আর জীপ ছুটে যাচ্ছিল একেবারে দক্ষিণে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে। কী নাকি একটা উৎসব আছে সেখানে। জাঁদরেল সব মিলিটারী অফিসারেরা উপস্থিত থাকবেন। টিনা সেদিন গুণে গুণে দেখেছিল ট্রাক গিয়েছিল পর পর সতেরোখানা। জিপ খানপাঁচেক, সব শেষে খানকয়েক মোটর সাইকেল।

"উঃ, শেষ আর হবে না।" মা ছটফটিয়ে বলে উঠেছিল।

বাবা বলেছিল, "পাহাড়ে রাস্তা তো, তাই গাড়িগুলো একটু আস্তে যাচ্ছে।"

এক সময় রাস্তা পরিষ্কার হল। ওরা তিনজন হেঁটে হেঁটে যতদূর ছোটা যায়, ছুটল। কিন্তু বৃথা, ততক্ষণে সূর্যের আলো পাইন গাছের পাতায় পাতায় ঝিলিমিলি খেলে যাচ্ছে। একটু দূরে পথের ধারে সিমেণ্ট দিয়ে তৈরী বেঞ্চিতে বসবার জন্য যখন তিনজনে পায়ের গতি থামিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ওদিকে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় সাদর আহ্বান এল বাঁদিকের একটু উঁচু জমির ওপর ছবির মতো তৈরী বাংলোর গেট থেকে।

"আপনারা সান রাইজ দেখতে যাচ্ছেন!" পরিষ্কার বাংলায় এক ভদ্রমহিলা জিজ্ঞেস করলেন। পাশে দাঁড়িয়ে স্মিতমুখ এক ভদ্রলোক। ভদ্রলোকটির প্রায় পা পর্যন্ত ঝোলানো গরম কাপড়ের মোটা ড্রেসিং গাউন, মুখে পাইপ। এত লম্বা মানুষ টিনা এর আগে কখনও দেখেনি। বাবা লম্বা, কিন্তু এতটা নয়। ভদ্রলোক আর তার স্ত্রী দুজনে বাবার সঙ্গে ইংরেজীতেও কথা বলছিল। ভদ্র-লোকটিকে কি সুন্দর দেখতে লাগছিল। গায়ের রং তামাটে। খাঁড়ার মতো উঁচু নাক। চওড়া কপাল। কথা বলার সময় চোখ দুটো ঝক্‌ঝক্ করছিল। টিনার মনে হয়েছিল লোকটি যেন রবিন

হুড কিংবা অর্জুন। আবার কর্ণও হতে পারে। তবে সেরকম পোশাক পরলে। মায়ের কাছে শুনে শুনে এদের সব গল্পই টিনার জানা আছে।

ভদ্রলোকের স্ত্রীকে ঠিক রঙিন প্রজাপতি বলে মনে হচ্ছিল। মোমের মতো ফর্সা রং। পাতলা ছিপছিপে শরীরটা সামান্য বাতাসের ছোঁয়ায় তিরতির করে কাঁপছিল। ভদ্রমহিলা পরে ছিলেন ভারী মতো সিল্কের শাড়ি. গায়ে জড়ানো ছিল লাল কালো ডোরা-কাটা পাহাড়ী পশমী চাদর। মাথা ভর্তি কোঁকড়ানো চুল থোকা থোকা নেমে এসেছিল ঘাড় ছাড়িয়ে সামান্য নিচু পর্যন্ত। চুলগুলি গোছা করে ঘাড়ের কাছে একটা ক্লিপ দিয়ে আটকানো। সুতীক্ষ্ণ নাক আর টানা টানা ভ্রূর নীচে কালো দুটি চোখ দেখে টিনা যেন আর অন্য দিকে তাকাতে পারছিল না।

ভদ্রমহিলাটি টিনার মাথায় একখানা হাত রেখে বললেন, "আজ তো সান রাইজ হয়ে গেছে। কালকে আসবেন। একটু আগে। আমার বাড়ির পেছনের লন থেকে খুব সুন্দর সান রাইজ দেখা যায়। কাল সকালে আপনারা আমাদের এখানে এসে চা খাবেন। নিশ্চয়ই আসবেন।"

সেদিন ওখানে আরও ঘন্টাখানেক থেকে বাড়ির তৈরী কেক আর গরম চকোলেট খেয়ে টিনারা বাড়ি ফিরে এসেছিল। আসবার আগে টিনাদের সমস্ত বাড়ি আর বাগান দেখানো হল আর তার সঙ্গে মন-বিস্মিত-করা আরও যে জিনিসগুলি দেখানো হল, সেগুলি হল একরাশ পুতুল। এক মুহূর্তে গোটা ঠাকুমার ঝুলিটা যেন উপুড় করে ঢেলে দেওয়া হয়েছিল টিনার সামনে। পশ্চিমদিকের লম্বাটে মতো একটা ঘরের চার দেয়ালে গোটা পাঁচেক শো-কেস। তার মধ্যে সাজানো আছে কত রূপের, কত সাজের পুতুল!

"সব আমার গিন্নীর হাতের তৈরী।" দু চোখ উজ্জ্বল করে লম্বা শরীরকে আরও টান টান করে ভদ্রলোকটি বললেন।

"সিজনের সময় প্রচুর লোক এখানে বেড়াতে আসেন। অনেক

লোকের সঙ্গে আলাপ হয়। ফিরে যাবার সময় একটি করে উপহার দিই এই পুতুল। আমার বড় ভালো লাগে। যাকে দিই সে বড় খুশী হয়। ক'দিনের জীবনে এই লাভটুকু বড়ো কম নয়।"

মা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠল, "সুন্দর হাতে সুন্দর পুতুল। দেখে মনে হচ্ছে এই জগতে কোন দুঃখ নেই।"

ভদ্রমহিলা মায়ের হাত দুখানা জড়িয়ে ধরেছিলেন, তারপর টিনাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—"কোন্ পুতুলটা তোমার পছন্দ বল।"

টিনা মার কোলে মুখ লুকিয়ে ফেলেছিল। পুতুল পাওয়ার আশায় বুক দুরদুর করছিল। ভদ্রমহিলা নিজেই বেছে একটা পুতুল তুলে দিলেন টিনার হাতে।

"আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা সহ এই সুখী পরিবারটির হাতে তুলে দিলাম পুতুলটি, আমাদের মনে রেখো।"

সেলোফেন পেপারে মুড়ে চমৎকার একটি জাপানী গেইসা গার্ল টিনা হাত পেতে নিয়েছিল। বুকে জড়িয়ে হোটেলে ফিরে এসেছিল।

"যাঁরা বেড়াতে আসেন, তাঁরা এই পুতুল কিনতে চান। বিক্রি আমি করি না, উপহার দিই। ঐ দেখুন ডেনমার্কের গয়লানী, টেক্সাসের কাউবয়, রেড ইণ্ডিয়ান। আবার ওদিকে বাংলার বধূ, বাঙালী বিয়ের বরকনে, নৃত্যরতা মণিপুরী মেয়ে, নাগা যোদ্ধা, আর এইপাশে ভারতবর্ষের নানা জায়গার আদিবাসী মেয়ে-পুরুষের যুগল চেহারা।"

ভদ্রমহিলা খানিকটা চুপ করে থেকে মৃদুস্বরে বললেন—"বড়ো ভাল লাগে সামান্য পুতুল উপহার দিয়ে অসামান্য হাসিটুকু দেখে।"

ভদ্রলোক নিজেদের পরিচয় দিয়েছিলেন। মিস্টার হরিশঙ্কর দয়াল, স্ত্রী মিসেস সুভদ্রা দয়াল। হরিশঙ্কর দয়াল লোহা থেকে সোনা বার করে আনছেন। তাঁর ব্যবসা ভারত জুড়ে। সুভদ্রা দয়ালকে মাঝে মাঝে ডাকেন লছ্মী। লছ্মী আসবার পরেই নাকি তাঁর ঐশ্বর্যে বান ডেকেছে। এমন লছ্মী হাজারে একটি মেলে না।

"আমার মিসেসটি স্টুডেন্ট হিসেবে দারুণ ছিলেন। যেমন লেখাপড়ায়, তেমনি খেলায়। সংস্কৃত অনার্সে প্রথম। আর ওদিকে দু-দুবার আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয়ে টেবিল-টেনিস চ্যাম্পিয়ান।"

হরিশঙ্কর দয়াল কথা শেষ করবার আগেই গোলাপী হাতের একটা মৃদু চড় খেলেন।

সুভদ্রা দয়াল স্বামীকে থামিয়ে বললেন, "বিজনেসের চাপে যখন খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েন তখনই ছুটে চলে আসেন এখানে। আমার পাবলিসিটি অফিসার হিসেবে ওঁর যোগ্যতা তুলনাহীন। লোকের সামনে আমাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখাতে একটু বেশী ভালোবাসেন।"

"অকারণে নয়।" বাবা হেসে উত্তর দিয়েছিল।

সেদিন আরও খানিকক্ষণ গল্প করে টিনারা হোটেলে ফিরে এসেছিল। তারপর যে কটা দিন ছিল ওরা বার বার হরিশঙ্কর দয়ালের বাড়ি গেছে। হোটেলের ডিনার-লাঞ্চ দু'দিন বাদ গেছে। মাত্র দশ দিনের মধ্যে কী করে যে দুটি পরিবারে এত ঘনিষ্ঠতা হল, আশ্চর্য। ওখান থেকে চলে আসবার সময় কী মন খারাপ মা বাবার। টিনার হাতে তখন আরও দুটো পুতুল এসে গিয়েছিল। একটা খুব সুন্দরী বউ, কপালে লাল টিপ, হাতে গলায় গয়না, চুমকি বসানো লাল শাড়ি পরা। আরেকটা মেমসাহেব। মাথায় টুপি, হাতে বেঁটে ছাতা, পায়ে জুতো। এখনও ওগুলো টিনার ঘরে আলমারিতে সাজানো আছে।

টিনার মনে পড়ল সন্তুমাসীর কাছে বার বার শোনা গল্পটা। মা-বাবার বিয়ের গল্প। রূপকথা। রাজপুত্র এলো এস. ডি. ও-র বন্ধু হয়ে। দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বাড়িতে মাটির দাওয়ায় শতরঞ্চির আসনে বসে রাজপুত্র নিবেদন জানালো—"আপনার মেয়েকে আমি বিয়ে করতে চাই, যদি আপনার আপত্তি না থাকে।"

বৃদ্ধ পণ্ডিত অভিভূত হয়ে তাকিয়েছিলেন অত্যন্ত সপ্রতিভ ছেলেটির দিকে। ছেলে নয়, ভদ্রলোক। বয়সে তাঁর মেয়ের চাইতে

অন্তত বছর পনেরো বড়। মেয়ের বয়স যদি ষোল পেরিয়ে তিনমাস হয়ে থাকে তো ভদ্রলোকের বয়স একত্রিশ-বত্রিশ তো বটেই।

সঙ্গে ছিলেন এস. ডি. ও.। কিছু বলবার আগে উনি বললেন, "এর হয়ে আমি জামিন থাকবো পণ্ডিতমশাই, পাত্র হিসেবে এর কোন ত্রুটি নেই। ছেলেবেলা থেকে আমরা এক সঙ্গে বড়ো হয়েছি। ও নিজের চেষ্টায় দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। আমি জানি ও একদিন অনেকের মাথা ছাড়িয়ে উঁচু হয়ে দাঁড়াবে।"

মেয়ের কোষ্ঠীতে তো ঐরকম ভবিষ্যদ্বাণীই রয়েছে। পণ্ডিতমশাই মনে মনে ভাবলেন।

"তারপর সন্তমাসী…" টিনা স্বপ্ন দেখার মতো মা-বাবার গল্প শুনতো।

"তারপর আর কী। একদিন সন্ধ্যের লগ্নে বিয়ে হয়ে গেল। তোর মার গায়ে গয়না বলতে ছিল শুধু সোনা বাঁধানো দুগাছা পলার বালা আর দু কানে এইটুকুটুকু দুটি টাব। ওদিকে মাত্র কয়েকজন বন্ধুবান্ধবকে ডেকে তোর বাবা বউভাতের উৎসব করলো।"

"তার পর কী হল বল।" টিনার উৎসাহে সন্তমাসীর উৎসাহ বাড়ে।

"তারপর তোর বাবা তোর মার আঙুলে পরিয়ে দিল একটা পাথর বসানো আংটি, গলায় দুলিয়ে দিল সোনার হার।"

"মা খুব হেসেছিল গয়না পেয়ে!"

"হাসবে কি রে। তোর মা তো তখন ভয়ে কাঁপছে। না দিচ্ছে একটা কথার উত্তর, না বলছে নিজের থেকে কোন কথা।"

"বাবা তো বকে দিলে পারতো।"

"বাবা বকবে কী, ভড়কে গেল। তোর মাকে জিজ্ঞেস করলো তার কী চাই, আর তোর মা কি উত্তর দিল জানিস।"

"কি?" টিনার বুকে তখন অপার কৌতূহল।

বলল, "আমি সন্তুদির কাছে যাবো, ওর কাছে শোবো।" সন্তু-মাসী হেসে লুটিয়ে পড়ল।

"মা তোমার কাছে এসে শুয়ে পড়ুক।"

সন্তুমাসী আবার হেসে লুটিয়ে পড়ল। টিনার গাল দুটো টিপে ধরে বলল—"ওরে আমার টিয়াপাখি। তোর যে বড়ো হতে এখনও কয়েক বছর বাকি রে। কবে তুই বড় হবি আমার টিয়া রাণী।"

টিনার এখন ষোল বছর বয়সে এই সব কথা মনে পড়লে খুব হাসি পায়।

আজ থেকে ঠিক চার বছর সাত মাস আগে টিনা আচমকা বড়ো হয়ে গিয়েছিল। এর দু বছর আগে টিনার বাবা সবাইকে নিয়ে ভবানীপুরে তিন কামরার ফ্ল্যাট ভাড়া করে চলে এসেছিল। সেখানে বছর দেড়েক থেকে একটা বড় বাড়ি নিয়েছিল বালিগঞ্জে ফার্ন রোডে। একেবারে আলাদা একটা বাড়ি ভাড়া করেছিল। বাড়িতে কাজ করবার দাসী-ভৃত্যের সংখ্যা বেড়েছিল। তাদের চালাতো সন্তুমাসী।

আর মা! টিনা তখন বুঝতে পারতো না মা প্রায় রোজই সন্ধ্যের সময় কি সুন্দর সেজে বাবার সঙ্গে গাড়িতে চেপে কোথায় যেতো। বাড়ি ফিরতো অনেক রাতে। টিনার খাওয়া-দাওয়ার তদারক করতো সন্তুমাসী। টিনার ঘরও তখন আলাদা। টিনা বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে দেখত তার মা, অত সাদাসিধে মা সেজেগুজে কেমন অন্য রকম হয়ে যাচ্ছিল। কেমন মিষ্টি হেসে চমৎকার ভাবে কথা বলতো, টিনার সঙ্গে ততটা নয়, যতটা বাবার বন্ধু মিণ্টু চৌধুরী, সুমন দত্তরায় বা মিস্টার খাণ্ডেলওয়ালার সঙ্গে! আবার বাবার ব্যবস্থায় মা সপ্তাহে তিনদিন দু'ঘণ্টা করে মিসেস র‍্যাঙ্কেলের কাছে ইংরেজীতে কথাবার্তা শিখতে লাগল। মার যা বুদ্ধি আর স্মৃতিশক্তি, মাত্র বছরখানেকের মধ্যেই ইংরেজীতে কি সুন্দর কথা বলতে

লাগল বাবার ব্যবসায়ের পার্টনার মহিন্দর সিং আর কৈলাস বর্মণের সঙ্গে। টিনার জন্মদিনে মা ইংরেজীতে আপ্যায়ন করল মেয়ের ইংরেজী স্কুলের বন্ধুদের, অন্যান্য অবাঙালী অতিথি অভ্যাগতদের। অথচ এই সেদিনও মার হয়ে বাবা সব কথা বলতো, মা হাসিমুখে একটু লজ্জা লজ্জা ভাব নিয়ে তাকিয়ে থাকতো। সত্যি মার খুব বুদ্ধি। সন্তমাসী বলে মার খুব মেধা, টিনারও তাই, তবে মার মতো অতটা নয়। টিনা লক্ষ্য করেছে ধাপে ধাপে মায়ের পরিবর্তন। নবদ্বীপ থেকে বাগবাজার। বাগবাজার থেকে ভবানীপুর। সেখান বালিগঞ্জ, সেখান থেকে তারপর একলাফে নিউ আলিপুরের সব চাইতে অভিজাত পাড়ায় দারুণ সাজানো-গোছানো নিজেদের মস্ত বাড়িতে।

আজ থেকে চার বছর সাত মাস আগে টিনা একদিন সকালবেলা খুব ভয় পেয়েছিল। কেঁদে ফেলে মাকে ডেকেছিল। মা মেয়েকে একান্তে ডেকে বলেছিল—"মনে রেখো টিনা, আজ থেকে তুমি বড়ো হচ্ছ। এবার থেকে সব সময় বুদ্ধির দরজা খুলে চলবে।"

মার কথায় টিনা আরও ভয় পেয়েছিল। ইচ্ছে থাকলেও মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করতে পারেনি বুদ্ধির দরজাটা কোথায়, কি করে খুলতে হয়।

সন্ধ্যার ঘোরলাগা অন্ধকারে সন্তমাসী টিনার দু কাঁধ ধরে ফিস্-ফিস্ করে বলেছিল, "শোন টিয়াপাখি, এখন থেকে আর যখন তখন যার তার সামনে হাঁটু দেখিয়ে চলবে না, বসবে না।" সন্তমাসী আরও একটু ঘন হয়ে টিনাকে বলেছিল, "ঐ দত্তদের বাড়ি রোজ রোজ আর ক্যারাম খেলতে যেতে হবে না, ছেলেদের সঙ্গে আর মিশবে না। শুধু দু চারটে কথা বলবে, চলে আসবে।"

টিনা ভীষণ ভয় পেয়ে সন্তমাসীকে জড়িয়ে ধরেছিল, "কেন খালি খালি মা আর তোমাতে মিলে আমাকে ভয় দেখাচ্ছ!"

সন্তমাসী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলেছিল—"অনেক পাপ করলে তবেই মেয়ে হয়ে জন্মায় রে টিয়া সোনা। মেয়েদের জীবনে অনেক অভিশাপ।"

টিনা বড়ো হচ্ছিল। আর বড়ো হচ্ছিল বাবার পকেট। ক্রমশ লম্বা হয়ে যাচ্ছিল। বাবা টাকার ভার চাপাচ্ছিল আর ইলাস্টিকের মতো পকেট আরও, আরও বড়ো হয়ে সব টাকার জায়গা করে দিচ্ছিল। আর সেই দিনগুলির মধ্যেই বাবা হঠাৎ একদিন টিয়াকে টিনা বলে ডাকল। বুড়ি নামটা ভুলে গেল। একেবারে ভুলে গেল আগের ঘনিষ্ঠ পরিচিত ভবানীপুরের হরেন জেঠুকে, লক্ষ্মী জেঠিমণিকে, লেখাপড়ায় দারুণ ভালো তাদের একমাত্র ছেলে শোভনকে, যাকে কিনা বাবা কত ভালো ভালো বই, কলম কিনে উপহার দিয়েছে। বাবা ভুলে গেল ভূদেব মাস্টারমশাইকে, স্টেশনারী দোকান ভট্টাচার্য ব্রাদার্স এর মালিক শাম্ভু ভট্চাযকে। বাবা এদের বেমালুম ভুলে গেল। শুধু নিজে ভুলল না, মাকে দিয়ে ভোলাল, মেয়েকে দিয়ে ভোলাল।

"টিনা, এখন বড়ো হচ্ছ, চোখের দৃষ্টিটা সব সময় উঁচু দিকে রাখবে। আজ শোভনের সঙ্গে অতক্ষণ ধরে গল্প না করলেও চলতো। সময় নষ্ট করা আমি একদম পছন্দ করি না।"

টিনা সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত না ঘুমিয়ে ছটফট করেছিল। এই বাবাই না মাত্র ক' বছর আগে ভবানীপুরে ভাড়া বাড়ির ঠিক পেছনের ফ্ল্যাটের বাসিন্দা লক্ষ্মীজেঠিমণি, মার্চেন্ট অফিসে চাকরি করা তার ভালোমানুষ স্বামী হরেন জেঠুর চোখের মণি একমাত্র ছেলে শোভনকে দেখিয়ে বলত, "ছেলের মতো ছেলে শোভন। বুড়ি, যদি লেখাপড়ায় ভাল হ'তে চাও তো শোভনের মতো ছেলের সঙ্গে মিশবে, কথা বলবে। আমি তাজ্জব হয়ে যাই ছেলেটার আউট-নলেজ দেখে। ঐটুকুন ছেলে কত বই পড়েছে, কত কী এরই মধ্যে জেনেছে!"

বাবা-মা দুজনেই খুশী হতো শোভন যখন টিনাদের বাড়ি এসে টিনার সঙ্গে গল্প করতো, নানা বইয়ের আলোচনা করতো। ইংরেজী শব্দভাণ্ডার বাড়ানোর জন্য ভারী ডিক্সনারী নিয়ে দুজনে স্ক্র্যাবলেট খেলতো।

টিনা ক্ষীণস্বরে বলল, "শোভনের সঙ্গে তো বাবা স্কটের লেখা আইভান হো বইটা নিয়ে কথা বলছিলাম। শোভন বলছিল বঙ্কিমচন্দ্র নাকি ঐ বইটা পড়ে দুর্গেশনন্দিনী লিখেছিলেন, যদিও বঙ্কিমচন্দ্র নিজে বলেছিলেন ..."

বাবা হঠাৎ অধৈর্য হয়ে টিনাকে থামিয়ে দিয়েছিল। ডান হাতের আঙুল উঁচিয়ে টিনাকে ধমকে বলেছিল, "স্কট, বঙ্কিমচন্দ্র আমি কিচ্ছু শুনতে চাই না। তোমাকে জ্ঞান দেবার জন্য আমি দুজন টিউটর রেখেছি, আর আছেন মিস ভার্মা।"

টিনা দুচোখ মেলে বাবার মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

বাবা একটু রাগ করে আবার বলে উঠল, "মনে রেখো টিনা, তুমি এখন নিউ আলিপুরে নিজের বাড়িতে থেকে বড় হচ্ছ, আর শোভন যে ভবানীপুর, সেই ভবানীপুরেই আছে, যতই কেননা সে হায়ার সেকেণ্ডারীতে স্ট্যাণ্ড করে বি. ই. কলেজে চান্স পাক। এখন তোমার সঙ্গী হবে চিন্টু, চিন্টুর বোন লালি।"

টিনার কানে কিছুই ঢুকছিল না। তবে এইবার সে বুঝতে পারল আজ সেই সকাল আটটায় এসে শোভন চলে গেল সাড়ে দশটায়। অথচ তাকে একমাত্র ব্রেকফাস্ট দেওয়া ছাড়া অন্য বারের মতো মা একবারও বললো না—"এখানে দুপুরে খেয়ে, সারাদিন থেকে তারপর বাড়ি ফিরবি বাবা।" অথচ টিনা জানে শোভন এই বিষয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে সারাদিনের জন্যই টিনাদের বাড়ি এসেছিল। নিউ আলিপুরে টিনাদের এখন কি সুন্দর বাড়ি। শোভনকে দেখে বাবা নেহাতই ভদ্রতা করে বলেছিল, "এই যে, খবর ভাল তো।" তারপরেই টিনার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, "মনে আছে তো টিনা, আজ আমাদের ঠিক এগারোটার সময় বেরোতে হবে।" টিনা বাবার এই কথাটায় একটু থতমত খেল। কই বাবা তো তাকে একবারও বলেনি যে বেলা এগারোটার সময় তারা কোথাও যাবে।

মায়ের মুখে হাসি ফুটে উঠলেও শোভন এখানেও হোঁচট খেলো। মা তো কই আগের মতো গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে

সকলের কথা খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করলো না। নেহাতই মামুলি ছুটো একটা কথা বলে খাবার টেবিলে চিজ টোস্ট, ডিমের ওমলেট আর ছুটো সন্দেশ দিয়ে সাজানো একটা ডিশ শোভনের সামনে ঠেলে দিল। শোভন চা খায় না। অন্যান্য বারের মতো একবারও মা শোভনকে সাধ্যসাধনা করলো না বড় গ্লাসের এক গ্লাস ছুধ খাওয়ার জন্য!

শোভন বুদ্ধিমান। তাই তো সে কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে আগের মতোই টিনার সঙ্গে গল্প করে ঠিক দশটার সময় বাড়ি যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালো।

"এক্ষুনি যাবে?" টিনা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

শোভন একটু হেসে উত্তর দিল, "তোমার মনে নেই টিয়া, কাকামণি বলছিলেন এগারোটার সময় তোমাদের কোথায় যেন বেরোবার কথা আছে।"

টিনার ছুচোখ ভিজে উঠেছিল শোভনের কথা শুনে। শোভন না খেয়ে চলে যাচ্ছে, এবং শোভন চলে গেল।

মায়ের কাছে অনুযোগের সুরে টিনা বলেছিল, "এটা কেমন হল মা। শোভন যখন আসে, ছুপুরবেলা আমাদের সঙ্গে ভাত খেয়ে তবে তো যায়।"

টিনার কথা শেষ না হতেই মা মাথা ঝাঁকিয়ে বলে উঠেছিল, "বাবা যখন যেটা পছন্দ করবে না, সেটা নিয়ে কোন প্রশ্ন কোরো না।"

টিনা মায়ের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখল। বাড়িতেও আজকাল মা কি সুন্দর সাজগোজ করে থাকে। মায়ের সারা গায়ে কী যেন একটা গন্ধ মাখানো থাকে, আর ঐ গন্ধটার জন্যই এখন টিনা মায়ের কাছ ঘেঁষে বসতে পারে না। ঐ গন্ধটা বাধা দেয়। ধাক্কা দিয়ে টিনাকে সরিয়ে দেয়।

"শোভন আর আসবে না, তুমি দেখো।"

টিনা বিস্মিত হল মা'র উত্তর শুনে—"ভবানীপুরের ছেলে নিউ আলিপুরে তো আসবেই না। এটাই তো নিয়ম।"

"কত নিয়ম আছে মা!"

"আরও একটু বড়ো হও, পৃথিবীর আরও কিছু জানো, তখন বুঝতে পারবে কত নিয়ম আছে।" মা'র নিরুত্তাপ, ঠাণ্ডা গলা শুনে টিনার কেমন যেন ভয় করতে লাগল।

বিকেলের দিকে মা-বাবা বেরিয়ে গেলে সন্তমাসী টিনাকে কাছে ডেকে বলেছিল, "টিয়ারাণী সব বুঝতে শেখ্ মা, এখন বড় হচ্ছিস। সবদিক থেকে বড় হচ্ছিস। এখন তোদের টাকা হচ্ছে, তোরা এখন টাকার নিয়মে চলবি। নইলে শোভনের সঙ্গে গল্প করা বারণ, আর তোকে কিনা মিশতে বলে চিন্টুর মতো হাড়-পাকা ছেলেটার সঙ্গে!"

হাড়-পাকাই বটে। সন্তমাসীর সেই সাবধান বাণী বলার মাত্র বছরখানেক পরেই তো টিনা যে বড় হচ্ছে সেটা বুঝতে পারল। বুঝতে পারল ঐ চিন্টুদের বাড়ি গিয়ে। টিনা তখন তেরোয় পা দিয়েছে। চিন্টুর ছোট বোন লালির জন্মদিন ছিল পাঁচই অক্টোবর। লালির জন্মদিনে টিনা একা গিয়েছিল চিন্টুদের বাড়ি। সমস্ত সন্ধ্যেটা ধরে কত হৈচৈ খাওয়া-দাওয়া হল। ট্রের ওপর বার্থ-ডে কেক রেখে লালিকে তার সামনে বসিয়ে দেওয়া হল। সামনে জ্বালানো হল মোমবাতি। লালি ফুঁ দিয়ে দিয়ে বাতি নেভালো। তারপর কেক কাটল। ছেলেমেয়েরা গান ধরল হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ। সাজানো-গুছনো ঘরের এক কোণ থেকে অন্য কোণ পর্যন্ত চারদিকে টাঙানো নানা রঙের বেলুন দুলে দুলে ঝুলছিল। এর পর খাওয়া। টেবিলে সার দিয়ে সাজানো ছিল ফ্লুরির পেস্ট্রি, স্যাণ্ডউইচ, গাঙ্গুরামের সন্দেশ, শোনপাপড়ি। খাওয়ার শেষে আইসবক্স খুলে প্রত্যেকের হাতে কোয়ালিটির আইসক্রীম।

টিনা পর পর দুটো আইসক্রীম খেয়েছিল। দু নম্বরেরটা জোর করে খাইয়েছিল চিন্টু। বেলবটস্ পরা, সোনালী রঙের লম্বা চুলওয়ালা চিন্টুকে দেখতে লাগতো হিন্দী সিনেমার বড়োলোক বাপের ছোট ছেলের মতো। সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে কমার্সের ছাত্র। বয়স বড়োজোর কুড়ি। লম্বা শরীরটাকে মেয়েদের মতো উঁচু হিল-

ওয়ালা জুতো পরিয়ে আরও লম্বা করে দিয়েছিল। সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁটে, কথায় কথায় শ্রাগ করে, মুখে ইংরেজী কথার খৈ ফোটে।

টিনারও জন্মদিন হয়। তবে প্রথম আটটা জন্মদিনের উৎসব পরের জন্মদিনের উৎসবগুলির চাইতে একেবারে আলাদা ছিল। আটবারের বার যে জন্মদিন হয়েছিল, টিনার মনে তার প্রতিটি মুহূর্ত এখনও জ্বলজ্বল করে। তখন ওরা ছিল ভবানীপুরের বাসায়। জন্মদিনের দিন মা কোন্ ভোরে স্নান ক'রে টিনাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলেছিল। গায়ে হাত বুলিয়ে কি মিষ্টি করে বলেছিল, "বুড়ি, এবার উঠে পড়্ মা, মুখ-হাত ধুয়ে ঠাকুর প্রণাম কর্। তোর বাবাকে প্রণাম কর্। তুই যে আজ ন'য়ে পা দিলি। আরও এক বছর এগিয়ে গেলি।"

স্নান করে নতুন জামা পরে ঠাকুর প্রণাম সেরে সেদিন বাবা, মা, সন্তুমাসীকে প্রণাম করতে টিনার কি ভালোই না লেগেছিল। প্রতি-বারের মতো সেবারও বাবা বাজার থেকে বুড়ির প্রিয় মাছ, তরকারী, মিষ্টি কিনে নিয়ে এসেছিল। মা, সন্তুমাসী দুজনে মিলে কত কি রান্না করেছিল। বাবার পাশটিতে টিনা খেতে বসেছিল। সেদিন বাবা কাজ থেকে ছুটি নিয়েছিল। স্কুলে চিঠি লিখে বাবা টিনারও ছুটি করে নিয়েছিল। টিনা সেদিন মাটিতে কার্পেটের আসনে খেতে বসেছিল। মা সামনে মস্ত বড়ো ঝকঝকে একখানা কাঁসার বগি থালায় চুড়ো করে ভাত সাজিয়ে রাখল। সন্তুমাসী তার চারপাশে দশ-বারোটা বাটি সাজিয়ে দিল। শেষের বড়ো বাটিটায় ভর্তি পায়েস। একটু দূরে পেতলের পিলসুজে মা প্রদীপ জ্বালিয়ে শাঁখে ফুঁ দেবার আগে টিনাকে বলল, "বুড়ি, মা, দুচোখ বুজে হাত জোড় করে ভগবানের কাছে আশীর্বাদ চাও, যেন ভালো মেয়ে হতে পার। শরীর মন যেন ভালো থাকে, সুস্থ থাকে।"

"তুমি তো সকাল থেকে কতবার আমার হয়ে বলেছ। আবার আমি বললে ভগবানের কাছে একঘেয়ে লাগবে।"

মা হেসে ফেলেছিল। বাবা মেয়ের মাথাটা নাড়িয়ে দিয়ে বলেছিল—"একেবারে পাকা বুড়ি।"

"আগে একটু পায়েস মুখে দে। তারপর ভাতে-মাছে হাত দিবি।"

সেসব দিনের জন্মদিনে কেক থাকতো না, পায়েস থাকতো। মোমবাতির বদলে প্রদীপ জ্বলতো। হ্যাপি বার্থ ডে গানের বদলে ভগবানের কাছে মা-বাবা দুজনে তাদের মেয়ের মঙ্গল কামনা করতো। এরপর বালিগঞ্জ, নিউ আলিপুরে আসবার পর সব কিছু পাল্টে গেল। মা আর বাবা কোন্ দিকে লক্ষ্য করে যে ছুটতে লাগল, কাকে যে নকল করতে লাগল আর সেই নকলে মেকি করে তুলল সব কিছু। কেবল ঠিক রইল সন্তুমাসী।

চিন্টুদের বাড়ির সে ঘটনাটির কথা মনে পড়লে এখনও টিনার গা গুলিয়ে ওঠে। টিনা তখন সবে তেরো বছরে পা দিয়েছে। মাত্র বছরখানেক আগে একটি দিনে মা আর সন্তুমাসী টিনাকে সাবধান করে দিয়েছিল ও নাকি এবার বড়ো হ'য়ে গেছে, এবার থেকে ছেলেদের সঙ্গে মিলতে মিশতে খুব সাবধান।

সন্তুমাসী বলেছিল, "কে বলবে এগারো বছর পার হয়ে মাত্র কয়েক মাস! বাপের মতো ঢ্যাঙা হচ্ছিস, তার ওপর মায়ের রং আর মুখ তো পুরো পেয়েছিস। শোন্ টিয়াপাখি, চারদিকে কুকুর, ফেউ-এর কোনো অভাব নেই রে, সাবধানে চলিস। ঐ চিন্টুটার সঙ্গে বেশী কথা বলিস না, ও তোকে দেখলেই কেমন যেন ঘনিয়ে ঘনিয়ে আসে। আমার ভালো লাগে না।"

এর কয়েক মাস পরেই চিন্টুর বোন লালির জন্মদিনে টিনার নেমন্তন্ন ছিল। খাওয়া-দাওয়ার শেষে সোনালী চুলওয়ালা চিন্টু তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলল—"অনেকগুলি পুরনো স্ট্যাম্প পেয়েছি। ভাবছি একজিবিট করবো। একটা স্ট্যাম্পে রাজার মুখ উলটো ছাপা হয়েছে।"

"কোথায়, দেখবো।" টিনার উৎসাহ দেখে খুশী হল চিন্টু। সামান্য বাও করে চিন্টু টিনার হাত ধরে একটু নীচু গলায় বলল—"ওপরে চল, আমার ঘরে। স্ট্যাম্প অ্যালবামে সাজিয়ে রেখেছি।"

টিনা আপত্তি করেনি। ওর তো ছোটবেলা থেকেই স্ট্যাম্প কালেকশন একটা হবি। চিন্টুর ঘর দোতলায় লম্বা টানা বারান্দার একপাশে। দোতলায় উঠে চিন্টু টিনার হাতখানা নিজের হাত দিয়ে চেপে ধরল। একটা আঙুল দিয়ে টিনার হাতের তালুতে মৃদু আঁচড় কাটতে লাগল। টিনা হাত ছাড়িয়ে নিতে চাইল, পারল না। ঘরের মধ্যে ঢুকে চিন্টু দরজা বন্ধ করল, আর সেই মুহূর্তেই টিনার মনে পড়ল ও বড়ো হয়ে গেছে। মা বলেছে, সন্তুমাসী বলেছে, বলেছে আর সাবধান করেছে।

"আমি আরেকদিন তোমার স্ট্যাম্প দেখবো। এতক্ষণে নিশ্চয়ই আমার গাড়ি এসে গিয়েছে।"

"নো, নট্ অ্যাট অল--আমি তোমাকে যেতে দেবো না"—সোনালী চুলওয়ালা চিন্টু নিজের গোটা শরীরটা দিয়ে টিনাকে দেয়ালের সঙ্গে চেপে ধরলো—"টিনা, মার্সি, আয়াম ম্যাড আফটার ইউ, প্লীজ মার্সি।"

টিনা অজ্ঞাতসারে দুটো হাত বুকের ওপর জড়ো করে রাখলো। আশ্চর্য, টিনা কেন জানি বুঝতে পারলো গোটা শরীরে ঐ অংশটুকুই সকলের আগে বড়ো হয়ে উঠ্ছে, আর বুঝতে পারলো চিন্টুর থাবা ওদিক লক্ষ্য করেই এগিয়ে আসছে।

"চিন্টু সরে যাও। আমি চীৎকার করবো, সন্তুমাসী এইজন্য তোমার সঙ্গে মিশতে বারণ করেছিল।"

"হ্যাঙ ইয়োর সন্টুমাসী, আই ওয়ান্ট ইউ, মাই হনি, জাস্ট ফর এ মোমেন্ট।" চিন্টু টিনার হাল্কা শরীরটাকে দু হাতে তুলে নিয়ে কাছের ডিভানটার ওপর জোর করে শুইয়ে দিল, আর তখনই দরজার গায়ে ধাক্কা পড়লো। চিন্টু সট্ করে ঘুরে দাঁড়ালো। উঠে বসলো টিনা। ওর বুকটা তখন জোরে ওঠানামা করছে, হৃৎপিণ্ডটা

তাকাচ্ছে। চিন্টু দরজা খুলে দিল। দেখলো লালির আয়া দাঁড়িয়ে আছে, টিনার গাড়ি এসেছে। আয়া মুখ কুঁচকে টিনার দিকে তাকালো। ভাঙা বাংলায় বললো—"চলা যাও, আভি জল্‌দি চলা যাও।"

চিন্টু ততক্ষণে গভীর মনোযোগের সঙ্গে একটা বিজনেস ম্যানেজমেন্টের বই টেনে নিয়ে পড়ছে। নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছে—ব্যাড লাক, নইলে এতক্ষণে—

* * *

পাশের ঘরে রিও আবার ডেকে উঠল। রাতের নিস্তব্ধ অন্ধকার ভেদ করে রিও কাকে যেন খোঁজে। টিনা লক্ষ্য করেছে, রিও প্রায়ই হঠাৎ ঐরকম ডেকে দরজার গায়ে কি যেন শুঁকে শুঁকে দেখে। দিনের বেলা খোলা দরজা দিয়ে গেট পর্যন্ত চলে যায়। কাঁকর বিছানো রাস্তা। তার দুপাশে অজস্র টবে সার দিয়ে সাজানো হিমালয়ান লিলি, লাল টুকটুকে কারনেশন, আর ঈষৎ গোলাপী ও হাল্‌কা বেগুনী রঙের গোল-বলের মতো ফরগেট-মি-নটের গুচ্ছ।

রিও আরেকবার ডেকে উঠল। টিনা একবার নিজের ঘরের বন্ধ দরজার দিকে তাকাল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে পা টিপে টিপে দরজার ভারি পর্দার গায়ে কান পেতে প্রায় নিস্পন্দ হয়ে কি যেন শুনতে চাইলো। এবং শুনতে পেলো, হাল্‌কা পায়ের শব্দ। টিনা জানে শুধু রিও নয়, তার সঙ্গে উঠে এসেছেন মিসেস দয়াল। সাদা মোমবাতির মতো উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ঋজু শরীরটি নিয়ে দাঁড়িয়েছেন রাস্তার দিকে মুখকরা বিরাট কাঁচের জানালার সামনে। পর্দা সরিয়ে আকুল চোখে তাকিয়ে দেখছেন বাগান পেরিয়ে সামনের গেটের দিকে। কেউ কি এসেছে? এক্ষুনি গেট খুলে বড়ো বড়ো পা ফেলে এগিয়ে আসবে শীতের পোশাক পরা সেই দীর্ঘদেহী বলিষ্ঠ লোকটি, আর তার বুকে দু পা তুলে অভ্যর্থনা জানাবে রিও! তারপর! তারপর সব অন্ধকার।

"কেন বলতে পারেন?" মিসেস দয়াল হাজার বার আকুলভাবে এই প্রশ্নটি করেছেন তাঁর প্রতিটি পরিচিত জনকে।

মিস রীতা শার্মা একবার আড়ালে ঠোঁট উল্টে বলেছিল—"সিলি, সো সেন্টিমেন্টাল। ভদ্রমহিলার এই ইনস্যানিটি যেন কোনোদিন যাবে না, কতদিন তো হয়ে গেল।"

টিনা উৎকর্ণ হ'য়ে শোনে একটি হতাশ পদক্ষেপ আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে ড্রইংরুম পেরিয়ে ওপাশের শোবার ঘরের দিকে। টিনা যেন স্পষ্ট দেখতে পায় সমুদ্র-নীল-রঙা গরম কাপড়ের নাইটিতে আচ্ছাদিত মিসেস দয়ালের পালকের মতো হাল্কা শরীরটা কেমন কাঁপতে কাঁপতে লুটিয়ে পড়েছে বিছানার ওপর।

টিনা দরজা থেকে ফিরে এলো। টিনার ঘুম চলে গেছে। এখন ঘণ্টা তিনেকের জন্য নিশ্চিন্ত তো বটেই। টিনার ঘুম খুব কমে গেছে। একেই বোধহয় বলে ইনসোমনিয়া। কাউকে বলেনি, টিনার এরকম হয়েছে মা-বাবা বাইরে বেড়াতে চলে যাওয়ার পর থেকে। মিস রীতা শার্মা টিনাকে নিয়ে এখানে এসেছে মাসদেড়েক হল। মিস শার্মার কাছেই টিনা জানতে পেরেছে তাদের এখানে আরও মাসখানেক থাকতে হবে। মা-বাবা বেড়াতে গেছে। ভারতবর্ষের বাইরে, এখান থেকে হংকং। সেখান থেকে জাপান হ'য়ে ইউরোপ, তারপর স্টেট্স্। টিনা প্রায় সব জায়গা থেকেই মা-বাবার চিঠি পেয়েছে। সুন্দর ছবিওলা কার্ড পেয়েছে। মা-বাবা আপাতত আছে ওয়াশিংটনে। আরও কিছুদিন থেকে ফিরে আসবে, ঠিক করে, পরে জানাবে। জানাক, টিনার খুব একটা কৌতূহল নেই। নইলে একটা চিঠি কোন্ বিকেল চারটে থেকে পড়ে আছে টেবিলে, টিনা জানে ওটা মা কিংবা বাবার। তবু খোলেনি, খুলে পড়েনি! বরঞ্চ বন্ধু নিনার চিঠি কতবার পড়েছে।

টিনা যখন দশ বছরের, তখন এখান থেকে মিসেস ক্লার্ক একখানা চিঠি দিয়েছিলেন টিনার বাবাকে। টিনার মনে আছে চিঠি পড়ে বাবা ভীষণ চমকে চীৎকার করে মাকে ডেকেছিল। মা

চিঠিটা পড়েছিল। বাবা সেদিন থেকে কয়েকদিন কী গম্ভীর হয়েছিল। মা তু' তিনদিন ভালো করে খায়নি।

সন্তুমাসী টিনাকে চুপি চুপি বলেছিল, "তোদের খুব জানাশোনা কে ছিল হরিশঙ্কর দয়াল, সে পাহাড় থেকে ছিটকে পড়ে মারা গেছে।"

টিনার পাতলা শরীরটা ঝাঁকুনি দিয়ে কেঁপে উঠেছিল। অনেকক্ষণ ধরে কেঁপেছিল। টিনা জানতো মানুষ মরে যায় নিজের বিছানায় শুয়ে শুয়ে। টিনা দেখেছে ওর বন্ধু রেবেকার ঠাকুমা অনেকদিন বিছানায় শুয়ে থেকে থেকে তারপর স্বর্গে গিয়েছিল। ক্লাসের আরেকটি মেয়ে নির্মলা অরোরাও তো টাইফয়েডে ভুগে বিছানায় শুয়ে মারা গেল। গাড়ি চাপা পড়ে বা ধাক্কা লেগেও লোক মারা যায়। যাকে বলে অ্যাকসিডেন্ট। কিন্তু তাই বলে জলজ্যান্ত একটা লোক, হরিশঙ্কর দয়ালের মতো অমন লম্বা-চওড়া লোক কী করে পাহাড় গা থেকে পড়ে মারা গেল! সন্তুমাসী বলেছিল এই পৃথিবীতে না কি কিছুই আশ্চর্য নয়। তাই আশ্চর্য নয় হরিশঙ্কর দয়ালের মৃত্যুও।

টিনা মা বাবার কাছ থেকে সব শুনেছিল। পরে আবার শুনেছিল মিসেস ক্লার্কের কাছ থেকে।

হরিশঙ্কর দয়াল মোরাদাবাদ থেকে নিজে গাড়ি চালিয়ে আসছিলেন। পাশে বসেছিল নেপালী ড্রাইভার রামবাহাদুর। রামবাহাদুর একবার সাহেবকে গাড়ির স্পীড কমাতে বলেছিল। কোন ফল হয়নি। পুরো পাঁচ মাস বারোদিন পরে হরিশঙ্কর দয়াল বাড়ি ফিরছেন। এতদিন তিনি সুভদ্রাকে দেখেন নি। পুরো পাঁচ মাস বারোদিন! গাড়ির গতি আরেকটু বাড়ালেই বা দোষ কী! আর তা ছাড়া এসব রাস্তায় গাড়ি চালিয়ে চালিয়ে তো হরিশঙ্কর দয়াল ঘুণ হয়ে গেছেন।

রামবাহাদুর আরেকবার প্রভুর দিকে তাকালো। ঐ খড়্গনাসা, দীর্ঘদেহী লোকটির মুখের দিকে সরাসরি তাকাতে কেমন যেন লাগে। পাশ থেকে তাকিয়ে রামবাহাদুর দেখলো প্রভুর মুখ উজ্জ্বল, ঠিক এই

মুহূর্তে উল্লসিতও। এতদিন লোকটি বাড়ি ছাড়া। বাড়িতে মেম-সাহেব একা, অবশ্য মিসেস ক্লার্ক আছে। আছে একগাদা কাজ করার লোক, তবু বাড়ির মালিক তো নেই।

এতক্ষণে ঠিক ঠিক ঘাট-পথ শুরু হল। অর্থাৎ হিমালয়ের খাস রাজত্ব। তার মানে বাড়ি আর মাত্র ত্রিশ কিলোমিটার। সাহেবের হাতে স্টিয়ারিং থাকলে ঐ দূরত্ব ঝাঁ ঝাঁ করে কমে আসবে। রায়বাহাদুর একবার মৃদুকণ্ঠে আবেদন করলো, সাহেব ক্লান্ত হয়ে পড়বেন। এবার না হয় সেই গাড়ি চালাক। সাহেব মাথা নাড়লেন, অর্থাৎ না।

রাস্তার ধারে মাঝে মাঝে নির্দেশফলকে সাবধান-বাণী লেখা রয়েছে—বিওয়্যার, সার্প বেণ্ড অ্যাহেড। পথে একটা সাইনবোর্ডে বড়ো বড়ো করে লেখা আছে, "ইট ইজ বেটার টু বি লেট ইন দিস ওয়ার্লড্ দ্যান টু বি আর্লিয়ার ইন দ্য নেক্সট।" অর্থাৎ পাহাড়ে রাস্তা, তড়িঘড়ি কোরো না, একটু এদিক-ওদিক হলেই দুর্ঘটনায় এ জগতের সঙ্গে সম্পর্ক টুটে যাবে।"

সাহেব কি এই নির্দেশগুলিও মানবেন না।

রায়বাহাদুর আর থাকতে পারলো না। ও জানে আর মাত্র দু' কিলোমিটার দূরে রয়েছে সেই খুনী বেণ্ড, যেটা লুপ বেণ্ড, ভূতুড়ে বেণ্ড, যেখানে প্রচুর গাড়ি পড়ে গড়িয়ে গেছে, প্রচুর লোক প্রাণ হারিয়েছে। যে বেণ্ডটা আসবার আগেই নীল ফলকে বারকয়েক সতর্ক নির্দেশ দেওয়া আছে, 'কশন, ড্রাইভ স্লোলি, ড্রাইভ উইথ কাম নার্ভস।'

"সাহব, ইত্‌নী জোরসে ড্রাইভ না করিয়ে, খতরনাক খুনী বেণ্ড সামনে আ রহা হ্যায়।"

"সো হোয়াট! তো ইস্‌মে ক্যা? কিঁউ ডর রহে হো।"

সাহেবের এই কথার ওপর রায়বাহাদুর আর কিছু বললো না। ভালোয় ভালোয় বাড়ি পৌঁছে সোজা মেমসাহেবের কাছে রিপোর্ট করে দেওয়া। মেমসাহেব তো সাহেবের খাওয়া-দাওয়া, বিশ্রাম

নেওয়া সব কিছুই খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করবেন, রায়বাহাদুরের কাছে জানতে চাইবেন। সেই সুযোগ এবার আর ছাড়া চলবে না। গাড়ি চালানোর ব্যাপারে সাহেবের বয়স যেন দিনকে দিন কমছে।

বেণুটা এসে গেল। হরিশঙ্কর দয়াল মনে মনে হিসেব করলেন বাড়ি পৌঁছতে আর বড়োজোর মিনিট চল্লিশ। বিকেল হবার আগেই সর্বসুখেভরা নিজের বাড়িটিতে পৌঁছে যাওয়া। সুভদ্রা কি করছে! স্বামী সম্বন্ধে ও বড়ো বেশি চিন্তা করে। স্বামীর স্বাস্থ্য নিয়ে, স্বামীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে ওর বড়ো ভয়। হরিশঙ্কর দয়ালের চোখ দুটো ঝাপ্‌সা হয়ে এলো। বুকের ভেতরে টনটনিয়ে উঠল।

ঠিক কোন্‌ মুহূর্তে ঘটনাটি ঘটেছিল কেউ জানে না। সবাই জানে অত দামী বিরাট গাড়িখানা পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে ছ' হাজার ফুট নীচে খাদের দিকে ছিট্‌কে পড়েছিল। আর অনুমান, গাড়ির চাইতেও অনেক জোরে ছিট্‌কে গিয়েছিলেন হরিশঙ্কর দয়াল। পরদিন সকালে ছোট্ট পাহাড়ী গ্রামের চাষীরা তাদের পায়েচলা রাস্তায় একটা তালগোল পাকানো রক্তাক্ত দেহ দেখে চীৎকার করে উঠেছিল। পুলিশ এসে আবিষ্কার করেছিল তোবড়ানো গাড়িটা। পুলিশ বিস্ময়ে হতবাক্‌ হয়েছিল রায়বাহাদুরকে দেখে। পাহাড়ের ধারে কয়েকটি আলিঙ্গনাবদ্ধ গাছের ডালে আটকে রায়বাহাদুরের দেহটা ঝুলছিল। প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়ে জ্ঞান হারানো আর ডান পায়ের বুড়ো আঙুলের হাড় ভেঙে যাওয়া ছাড়া রায়বাহাদুরের আর কিছু হয়নি।

সুভদ্রা দয়াল সেইদিনই দুটোর ডাকে একখানা চিঠি পেয়েছিলেন। স্বামীর চিঠি।

···এবার থেকে বছরে কয়েক মাস কাটাতে হবে বম্বে আর ভারতবর্ষের বাইরে। একটি চেক্‌ কোম্পানীর সঙ্গে কথাবার্তা ঠিক। প্রাহায় আমাদের একটি অফিস খুলবো। বন্ধু পার্টনার মিস্টার শর্মা ওখানে আসছে সপ্তাহে ফ্লাই করছে। লক্ষ্মী এখন আমার হাতের

মুঠোয়। এখন থেকে বছরে অনেক মাস আমাকে বাড়ি ছেড়ে থাকতে হবে। তুমি জানো আমার পক্ষে তোমাকে এতদিন ছেড়ে থাকা সম্ভব নয়, তাই এবার থেকে তুমিও আমার সঙ্গে থাকবে। আমার মিষ্টি সুভদ্রা, তুমি যখন এই চিঠিখানা পড়ছো, তার ঘণ্টা কয়েক পরেই আমি তোমার কাছে যাচ্ছি। আমার রিওকেও খবরটি দিয়ে রেখো—রাগ করলে না তো ?"

টিনার দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল, যখন এই খবরটি খুঁটিয়ে শুনছিল মিস ভার্মা। বলছিলেন মিসেস ক্লার্ক। মিসেস ক্লার্ক কেঁদে ফেলেছিলেন, "ঠিক এখানটায় এসে আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলি মিস ভার্মা, ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করি।"

টিনা বিদেশ-থেকে-আসা নীল এয়ার-লেটারটা হাতে একবার তুলে নিয়ে আবার রেখে দিল। ওয়াশিংটন থেকে মা লিখেছে। খামের ওপাশে মায়ের নাম লেখা। আজকাল সমাজে উঠতে গেলে এবং টাকার সামর্থ্য দেখাতে হলে, টিনা জানে, কন্টিনেন্ট তো বটেই, আমেরিকা থেকেও ঘুরে আসতে হবে। আমেরিকা বলে গেঁইয়ারা, আধুনিক মতে বলতে হবে স্টেট্‌স্। স্টেট্‌স থেকে না বেড়িয়ে এলে পুরো অভিজাত হওয়া যায় না। টিনাকে যদিও বলা হয়েছে ব্যবসার খাতিরে বাবা ওদেশে গেছে, সঙ্গে মাকে নিয়ে গেছে, তবু টিনা জানে আভিজাত্য পুরো দেখানোর জন্যই মা-বাবার এই বিদেশ ভ্রমণ।

মায়ের চিঠি যখন, তখন নিশ্চয়ই আগের প্রত্যেকটা চিঠির মতো উপদেশে ঠাসা। আর ঐ লাইনটা তো থাকবেই—"তোমার ভাগ্য ভালো যে রীতা ভার্মার মতো একজন গার্ডিয়ান টিউটর পেয়েছো।" টিনার খুব হাসি পায়। বছরখানেক আগেও মা বলতো গার্জেন, এখন বলে গার্ডিয়ান। এডুকেশনকে বলে এজুকেশন, কমফার্টকে কামফার্ট, গার্লকে বলে গের্ল। অতিথি-আপ্যায়নে প্রথম কথাই হল 'হট অর নক্‌ট প্লিজ ?' এবং বলবার স্টাইলটাও মা কি

সাংঘাতিকভাবে রপ্ত করে নিয়েছে! টিনা লক্ষ্য করেছে আজকাল মা কী নিপুণভাবে সুন্দর আঙুলের আলতো ছোঁয়ায় বুকের ওপর শাড়িটা টানটান্ করে টেনে দেয়। প্রায়ই আঁচল কাঁধ থেকে খসে আসে, মা কথাবার্তায় এত ব্যস্ত থাকে যে ওদিকে খেয়াল রাখতে পারে না। কিন্তু টিনা জানে, খুব ভালো করেই জানে, ঐ আঁচল পড়ে যাওয়া, সে বিষয়ে উদাসীন থাকা, সব মার জ্ঞাতসারে হয়।

মাত্র দেড় বছর আগে নবদ্বীপের দাদু মারা গেলেন। খবর পেয়ে টানা গাড়িতে মা ছুটে গেল। সঙ্গে টিনা গেল, বাবা গেল, আর গেল বাচ্চা চাকর হারু। একদিন থেকে বাবা চলে এলো। মা, টিনা আর হারু রইলো। হারুকে নিয়ে যাওয়া মার সুবিধের জন্য। টিনা জানে মার এখন কত কী অভ্যেস হয়েছে। কোন ভোরে বেড টি, তারপর ব্রেকফাস্ট, তারপর ··তারপর···তারপর। কত কী নিয়ম এখন মার জীবনে।

নবদ্বীপে দাদুর বাড়ি যত এগিয়ে এলো, মার চোখ দুটি জলে ভ'রে উঠল। টিনা মার ডান হাতখানা জড়িয়ে ধরল। বাড়ির দরজায় গাড়ি থামতেই ভেতর থেকে ডুকরে কেঁদে উঠেছিল দিদিমা আর মামীমা। মাকে দুজন জড়িয়ে ধরেছিল। মা কাঁদছিল, খুব কাঁদছিল, আবার তারই ফাঁকে মা ইনটিমেট সেন্টের গন্ধেভরা রুমাল বারবার নাকে মুখে চেপে ধরছিল। দিদিমার শাঁখাহীন হাত দুখানা জড়িয়ে ধরেছিল মার হাল্কা, সুন্দর, ফর্সা শরীরটাকে। টিনা লক্ষ্য করেছিল মা কিছুক্ষণ পরে কেমন নিজেকে সেই জড়ানো হাত দুটি থেকে ছাড়িয়ে নিল। বিধবা মামীমা দাপিয়ে দাপিয়ে কান্নাকাটি করছিল। "ও জয়ি, আমাদের যে সর্বনাশ হল, মাথার ওপর থেকে আকাশ সরে গেল রে।"

মা বিসদৃশভাবে দিদিকে ধমকে উঠল। "তোমার ঐ গেঁয়ো কান্না রাখ তো! বাবা চিরকাল থাকবেন বলে এসেছিলেন?

আমরা সবাই থাকবো? কোথায় ঠাণ্ডা মাথায় ভাববে কী করে বাবার কাজটুকু ভালো করে করা যায়, তা না সমানে দাপাচ্ছ।"

মার কথায় মাসীমা একেবারে চুপ করে গিয়েছিল। স্বামী হারিয়ে মাসীমা দু বছর ধরে বাপের বাড়িতেই আছে। সবাই জানে মাসীমার বাকি জীবনটা ওখানেই কাটবে। মাসীমার একটা মাত্র ছেলে স্কুলের গণ্ডীটুকু পার হতেই দুবার হোঁচট খেয়েছে। আর এগোয়নি। মার আঁচল ধরে সেও নবদ্বীপেই আছে। এখন মনে হচ্ছে ভাগ্যিস ওরা মা-ছেলে নবদ্বীপে এসেছিল, নইলে বুড়ি দিদিমাকে দেখাশুনা করতো কে?

মাসীমার ছেলে কানাইকে দেখে টিনার খুব মজা লেগেছিল। আঠারো-উনিশ বছরের ছেলে। মুখখানা বোকা সরলতায় ভরা। আবার ওদিকে তেল চুকচুকে চুল সামনের দিকে ফাঁপিয়ে সিঙাড়া করে আঁচড়ানো, কানের পাশে লম্বা জুলপি, ঠোঁটের ওপর গোঁফের ল্যাজ ঝুলে পড়েছে। টিনার হাসি পেল যখন কানাই সামনের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে-থাকা হারুকে বলল, "আপনি বসুন এই টুলটায়, ধুলো ঝেড়ে দিচ্ছি।" হারু টিনার সামনে ভীষণ লজ্জায় জিভ কাটলো, জোরে জোরে মাথা নাড়লো। এতক্ষণ সে বসেই এসেছে, এখন আর বসবার দরকার নেই।

মা দিদিমার কাছে বসে কাঁদছিল, মাঝে মাঝে ফোঁপাচ্ছিল। মাসীমা মার পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। মাসীমা মার গলার হারটা একবার তুলে দেখল। হাতের বালা ধরে কয়েকবার ঘোরালো।

রাত্রিবেলায় বিছানায় শুয়ে টিনা শুনলো মা বাবাকে গলা নামিয়ে বলছে—"আমিও কাল সকালে তোমার সঙ্গে ফিরে যাবো।"

বাবা অবাক হ'য়ে বললো—"সে কী করে হয়, তোমাদের চতুর্থী আছে, কদিন পরে বাবার কাজ। পরশুদিন তোমার জ্যাঠতুতো ভাইরা আসছে। তোমাদের নিজের ভাই নেই যখন, তখন তো তুমি এসব ছেড়ে এখন কিছুতেই যেতে পারো না।"

মা মাথা ঝাঁকিয়ে বলে উঠলো—"চতুর্থী আমি আমার বাড়িতে

ভট্‌চায মশাইকে ডেকে করবো। আর এখানে তো আমি সমস্ত খরচপত্র দিয়ে যাচ্ছি, যাতে শ্রাদ্ধ-অনুষ্ঠান ভালো করে হয়। তা ছাড়া শ্রাদ্ধের আগের দিন না হয় আবার আসবো!"

"সে হয় না, তুমিই ভেবে দেখো কতখানি দৃষ্টিকটু লাগবে। আর তা ছাড়া মায়ের মনটাও তো দেখতে হবে!"

বাবা পাশ ফিরে শুল। টিনা জানে মা আরও কিছু বলবার জন্য অনেক জেগেছিল। কিন্তু বাবার আন্তরিক অসহযোগিতায় কিছু সুবিধে হল না।

টিনা বুঝতে পারছিল মৃত বাবার জন্য মন কেঁদে উঠলেও মা নবদ্বীপের বাড়ির অতিসাধারণ জীবনের সঙ্গে এক মুহূর্তের জন্যও চলতে পারছে না, মার কষ্ট হচ্ছে।

তবে মায়ের কর্তব্য জ্ঞানের তারিফ টিনা কিন্তু সত্যিই করে। টিনা জানে বুড়ি দিদিমার বর্তমান জীবনধারণে স্বাচ্ছন্দ্যের যাতে এতটুকু এদিক-ওদিক না হয়, তার সব দায়িত্ব মা নিয়েছে। খাওয়া, পরা, চিকিৎসা—সবকিছুর। শুধু দিদিমার নয়, মাসীমা এবং তার ছেলের। মায়ের পাঠানো অর্থ আর জমির ফসল, এই দিয়ে দিদিমা, মাসীমা আর তার ছেলের দিব্যি চলে যাচ্ছে।

টিনার ঘরের ডানপাশে এটাচ্‌ড্‌ বাথ। তার পাশে আরেকটি ঘর। কয়েক বছর আগে, ডন হোটেলের জন্মের আগে ওটা ছিল মিসেস দয়ালের ড্রেসিং রুম, সাজঘর, বেশ বড়ো ঘর। তখন ঐ ঘরটার চার দেয়ালে চারখানা মানুষসমান আরশি ছিল, দুটো ঢাউস ওয়ার্ডরোব ছিল, আর ছিল ঝকমকে একটা ড্রেসিং টেবিল। হোটেল ডন হবার পর অনেক কিছু পাল্‌টে গেল। এখন সেই ড্রেসিং রুমটা হয়েছে রীতিমতো একটা দামী বেডরুম। বর্তমানে এই ঘরের অধিকারিণী মিসেস ক্লার্কের অত্যন্ত খাতিরের মিস রীতা শর্মা। লাগোয়া লম্বা দালানের ঘরের ঠিক পাশের অংশটি কাঠ ও ঘষাকাঁচের দেয়াল ও দরজা দিয়ে আলাদা করে সেটিকে আপাতত মিস রীতা

ভার্মার শোবার ঘরের এটাচ্‌ড্‌ বাথে পরিণত করা হয়েছে। বাকী দালানটায় খান বারো উজ্জ্বল সবুজ রং করা, কুশন দেওয়া বেতের চেয়ার পর পর সাজানো। মেঝেতে রং মিলিয়ে ম্যাট্রেস পাতা। মিসেস ক্লার্কের মাথা থেকে এইসব প্ল্যান বেরিয়েছে। গরমের সময় এই ঠাণ্ডা বরফের দেশে আসবার জন্য ভারতবর্ষের 'রইস' আদমীরা আই-ঢাই করে। তখন মাত্র ঐ ছ-খানা স্যুটের হোটেল বাড়িটাতে কুলোয় না, এই ঘর আর টিনার ঘরটিতে লোক ঢোকাতে হয়। টিনা যে ঘরটিতে থাকে, সেখানে তো মোটা রেটের বিনিময়ে বোর্ডার থাকে।

আর থাকবে না কেন। হোটেল কি করে চালাতে হয়, ঘরদোর কী করে সাজাতে হয়, কার সঙ্গে কেমন করে কথা বললে কে কেমন ভিজবে মিসেস ক্লার্কের সব জানা আছে। কয়েক বছর আগে তার নিজের রাস্টিক বোর্ডিং হাউস চলেনি টাকার অভাবে, আর সেই ভয়ঙ্কর ঘটনাটা ঘটে যাওয়ার জন্য, নইলে মিসেস ক্লার্কের রান্নার তারিফ কে না করতো! স্ম্যাস্‌ড্‌ ডালের সঙ্গে শাকপাতা সেদ্ধ চটকে পেঁয়াজ রসুন দিয়ে বড়া ভেজে যখন সামি কাবাব নাম দিয়ে বোর্ডারের ক্ষুধার্ত মুখের সামনে সাইড ডিশ ধরে দিত, তখন কেউ ধরতে পারতো ওতে মাংসের ছিটে-ফোঁটাও নেই! কিংবা ভেজিটেব্‌ল অ্যাণ্ড মিট্‌ স্যালাড! ক টুকরো মিট থাকতো! কিন্তু সাজানোর কায়দা দেখে বোর্ডার মুগ্ধ হতো। এগ অ্যাণ্ড মিট বল্‌সে অবিশ্যি একটু খরচ পড়তো। তেমনি "অন অর্ডার" তৈরী করা হতো আর দামও হতো চড়া। যেমন ডিশ, তার তেমনি প্রণামী। এ ছাড়া চাইনিজ কুই-জিন—বিজ্ঞাপন দেওয়া হতো বটে, তবে সে সব ডিশ বছরে একবারও হতো কি না সন্দেহ।

যাই হোক, ঠুকঠুক করে "রাস্টিক বোর্ডিং হাউস" সিজনের সময় চলতো মন্দ না, অবশ্য মিসেস ক্লার্কের ভাষায় বেশির ভাগ রাস্টিক ছেলেমেয়েগুলিই এখানে ঠাঁই নিত। কিন্তু তাও গুড়েবালি হয়ে

গেল যখন ঐ ঘটনাটা ঘটে গেল। মনে করলে এখনও মিসেস ক্লার্কের সারা শরীর হিম হয়ে যায়।

একেবারে নিজের চেষ্টায় কত কষ্ট করে মিসেস ক্লার্ক তাঁর রাস্টিক বোর্ডিং হাউস করেছিলেন। কজন বোর্ডারই বা হতো, আর কজনারই বা জায়গা ছিল! তবু যাই হোক দিন চলে যেত। "জীবনের সব সুখ খুইয়েই তো এখানে এসেছিলাম। এই অতি ছোট্ট, নগণ্য বোর্ডিং হাউসটি করে তাই কোন রকমে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ঈশ্বর তাতেও বাদ সাধলেন, এলো সেই দিনটা।" আজও সেই দিনের সেই ঘটনাটি উল্লেখ করতে গিয়ে মিসেস ক্লার্ক বিবর্ণ হয়ে যান।

টিনার দুখানা হাত জড়িয়ে ধরে মিসেস ক্লার্ক মিস শার্মাকে গোটা ব্যাপারটা বলেছিলেন—

নভেম্বর মাসের তখন দ্বিতীয় সপ্তাহ। কনকনে ঠাণ্ডা পড়েছিল, তারই এক হিমেল সন্ধ্যায় রাস্টিক বোর্ডিং হাউসের দরজায় ঘা পড়লো। মিসেস ক্লার্ক দরজা খুলতেই দুটো ছেলেমেয়ে হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়লো। ঢুকেই অর্ডার দিল একটু আগুন, দু মগ গরম কফি, দু ডিশ প্রন-চাউমিন, তার সঙ্গে সুইট অ্যাণ্ড সাওয়ার সস্।

একটা ছোট্ট লোহার চুল্লীতে তাড়াতাড়ি কাঠকয়লা আর শুখনো পাইন ফল দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে ঘরের মধ্যে দিয়ে মিসেস ক্লার্ক কিচেনে গিয়ে ফাঁপরে পড়লেন। প্রন-চাউমিন তো চাই, কিন্তু প্রন কোথায়? আর চাউমিন বলতে তো সেই কবেকার কেনা একবাক্স এগ্ নুডল্স্ পড়ে আছে। প্যানট্রিতে রয়েছে দুটো মাত্র ডিম, কিছু আলু, বিন, গাজর, শসা আর পেঁয়াজ। আবার কি থাকবে নভেম্বর মাসের এই শেষ বেলায়? তবে নড়বড়ে কাবার্ডের পাল্লা খুলে প্রাণে খানিকটা বল এলো। মিসেস ক্লার্ক দেখলেন সেখানে এক বোতল ভিনিগার আছে, একটা বাটিতে আছে অল্প একটু আপেলের চাটনি। আর এক পাশে ডিশের ওপর পড়ে আছে ছ দিনের বাসি মাটনের খানিকটা থোড়া মাংস। সুতরাং এবার শুধু হাতের গুণ আর মুখের

বাকি্য। আর কিছু দরকার নেই এই দুটো পাগ্‌লা ছেলেমেয়েকে ভোলাবার জন্য। নাম বললো মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস ডেভিডসন। সবে বিয়ে হয়েছে, হনিমুনে এসেছে।

রাত্রিবেলা ডাইনিং টেবিলে যখন ওদের খেতে দেওয়া হল, তখন ধূমায়িত চাউমিন দেখে সাহেব-মেমের মুখে হাসি ফুটে উঠল। ডিমের ওমলেটের টুকরো করে তার সঙ্গে গাজর আর বিন সেদ্ধ করে ছড়ানো চাউমিনের অপূর্ব স্বাদে ওরা কৃতজ্ঞতা জানালো মিসেস ক্লার্ককে। তার ওপর আবার সাইড ডিশ হিসেবে ধরে দেওয়া হল মাটন আলুর টিকিয়া। অন্যদিকে আপেলের চাটনির সঙ্গে ভিনিগার মিশিয়ে স্যুইট অ্যাণ্ড সাওয়ার সস্।

ওরা দুজনে কি তৃপ্তি করেই না খেল, তারপর চুল্লীর ধারে বসে দুজন দুটো সিগারেট ধরালো। সেদিন কত রাত পর্যন্ত ঐ হিপিমার্কা ছেলেমেয়ে দুটো আগুনের ধারে বসে গল্প করলো। মিসেস ক্লার্কের কাছে ঐ পাহাড়া দেশটার কোথায় কী দেখবার আছে সব খুঁটিয়ে জেনে নিল।

ছেলেটা বললো—"এনচ্যান্টিং। এখানে আমরা আমাদের মূল্যবান হনিমুনের অন্তত সাতটা দিন কাটিয়ে যাবো।"

"হাউ সিলি, তুমি তো একটু আগেই বলছিলে কালকে সকালেই আমরা নীচে নেমে যাবো।" মেয়েটা ভ্রূ কুঁচকে ছেলেটার দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে বললো।

ছেলেটা একটু শ্রাগ করে বললো, "মার্থা, তুমি তো আমাকে চেন। তুমি জানো আমি যে-কোন সময় যে-কোন ডেসিসন নিতে ভালোবাসি।"

ছেলেটা খুব জোরে জোরে সিগারেটে টান দিল। মেয়েটা কেমন একটু থম্‌থমে চোখে আগুনের দিকে তাকিয়ে রইলো। হাতে-ধরা সিগারেটের আগুন ক্রমশ আঙুলের দিকে এগোতে লাগলো।

দূরের মিলিটারী মেসবাড়িটার ঘড়িতে রাত এগারোটা বাজতে শোনা গেল। মিসেস ক্লার্ক ভাবনায় পড়লেন। ইলেকট্রিক

পুড়ছে, চার্জ কত হবে কে জানে। মেয়েটা পায়ের কাছে রাখা বাস্কেট থেকে আরও দুটো শুকনো পাইন ফল আগুনে ফেলে দিল। আগুন জোরালো হল অর্থাৎ এই দুটোতে আরও বসবে!

চারদিকে নিস্তব্ধ অন্ধকার জমাট বেঁধে আসছে, তাপমাত্রা ক্রমশ নীচের দিকে নামছে। মিসেস ক্লার্ক আজকে এই খাওয়ার ঘরটিতে শোবেন। এতক্ষণ আগুন জ্বালিয়ে ঘরটা, বেশ গুম্ হয়ে উঠেছে। এই ছেলেমেয়ে দুটোর জন্য কাঠ খড়ও তো কম পুড়লো না। সেই সন্ধ্যে থেকে শরীর মনের তো কম পরিশ্রম যায়নি! এখন শুতে পারলে বাঁচা যায়।

সাড়ে এগারোটা বেজে যাবার পর মিসেস ক্লার্ক বাধ্য হয়েই দুজনকে শুভরাত্রি জানালেন। জিজ্ঞেস করলেন, বেড টি কখন দেবেন।

"সাতটার আগে নয়"—ছেলেটি উত্তর দিল।

ওদের নির্দিষ্ট ঘরে ওরা চলে গেল। অবশ্য ঘর বলতে তো ঐ একটাই। ঘরটা একটু আলাদা, আসা-যাওয়ার দরজা বাইরের দিকে। দরজা বন্ধ করে দিলে একেবারে নিজস্ব ঘর। খাবার ঘর, রান্নাঘরের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকে না। আর যে ঘরখানায় মিসেস ক্লার্ক থাকতেন তাকে ঘর না বলে খুপরি বলাই উচিত, তা হলেও আরেকজন বোর্ডার এলে মিসেস ক্লার্ক ভাগ্যের তারিফ করে ঐ ঘরখানাও ছেড়ে দিতেন, ডাইনিং স্পেসটুকুতে নিজের বিছানা পাততেন।

কোনোরকমে, নেহাতই কোনোরকমে দিন চলছিল। কিন্তু আর চললো না, বাদ সাধলো ঐ ছেলেমেয়ে দুটো। বোর্ডিং হাউসের রেজিস্টারে যদিও স্বামী-স্ত্রী হিসেবেই ওদের নাম ছিল, কিন্তু মিসেস ক্লার্ক জানতেন এই পরিচয় একেবারেই মিথ্যে। তা হোক, মিসেস ক্লার্কের এখন টাকার দরকার, একটু রুটির টুকরো পেটে দেবার জন্যই টাকার দরকার!

অবশ্য কেবল এই রাস্টিক বোর্ডিং হাউসের ওপর নির্ভর করে থাকলে তো পেটে না খেয়ে, আর গায়ে না পরে মিসেস ক্লার্ককে

করেই হুচোখ বুজতে হতো। নেহাতই মিসেস সুভদ্রা দয়াল ছিলেন, তাই না এঁর আগ্রহে আর হরিশঙ্কর দয়ালের অকৃপণ দানে তাদেরই বাড়িতে কুকিং রেসিপির সেন্টার খোলা হল, তবেই না একটু সুরাহা হল তা এক একটা ট্যুরিস্ট সিজনে কম টাকা হতো না। এর একটা পয়সাও হাত দিয়ে ছুঁতেন না মিসেস দয়াল। আর সেদিন এমন একটি দেশী-বিদেশী রান্না শেখানোর স্কুল খুলেছিলেন বলেই তো আজকে এত সুন্দর ডন হোটেলের জন্ম। অবশ্য কোন্ মানুষটির অভাবে এমনটি হল ভাবতেও চোখে জল আসে।

পরদিন ভোরে ঠিক সাতটায় সময় বেড টি দিতে গিয়ে মিসেস ক্লার্ক অবাক হলেন। দেখলেন দরজায় তালা বন্ধ অর্থাৎ ছেলে-মেয়ে হুটো বেরিয়েছে। নিশ্চয়ই সানরাইজ দেখতে গেছে। বয়স অল্প, তায় আবার নতুন বিয়ে। যাক গে, ফিরে এলে পর চা দিয়ে আবার জেনে নিতে হবে ব্রেকফাস্টে বাবুদের কী পছন্দ। ওদিকে তো ভাঁড়ে মা ভবানী। ভাগ্যিস মিস্টার দয়ালের বেয়ারাদের কেউ না কেউ বাজার করে দেয়। শরীর বিকল হলে ওষুধ আনে, ডাক্তার ডাকে। এর ওপর শীতের পোশাক দিয়ে, একসঙ্গে খাবেন বলে প্রায়ই নেমন্তন্ন করে মিসেস দয়াল কী কম সাহায্য করেন!

বেড টি, ব্রেকফাস্ট দূরে থাক, লাঞ্চ টাইম পেরিয়ে গেল, ঐ ছেলেমেয়ে হুটো ফিরলো না। মিসেস ক্লার্ক দরজার তালাটা লক্ষ্য করে দেখলেন ওটা ওঁর বোর্ডিং হাউসের তালা নয়, বোর্ডারের তালা। বোর্ডারদের মধ্যে অনেকেই হোটেলের তালাকে বিশ্বাস করে না। নিজেদের তালা লাগায়। লাগাক, কিন্তু ওরা তো ঘরে ফিরে আসবে!

মিসেস দয়াল হুপুর হবার অনেকটা আগেই বেয়ারাকে দিয়ে বাজার থেকে মাংস, কয়েকটা ডিম, চাল, ডাল, কিছু আনাজ, মাখন, পাঁউরুটি আর হু পাউণ্ড বিস্কুট কিনে পাঠিয়ে দিয়েছেন। দামের কথা উঠতেই দেননি। বলেছেন বোর্ডারের কাছ থেকে টাকা পেলে তবে যেন মিসেস ক্লার্ক বাজারের দাম শোধ করেন।

সন্ধ্যের পর মিসেস ক্লার্ক ভাবনায় পড়লেন। শীতের দেশ। সন্ধ্যে মানেই রাতের অন্ধকার। ও দুটো কখন আসবে, কী খেতে চাইবে কে জানে। মিসেস ক্লার্ক রান্নাই বা কখন করবেন? একটু ভেবে-চিন্তে দুটো ডিম সেদ্ধ করে রেখে মিসেস্ ক্লার্ক এক কাপ কফি আর খানচারেক ড্রাই টোস্ট দিয়ে নিজের ডিনার সেরে নিলেন। ওরা যখন ফিরবে, ওদের কোন অর্ডার, কোন কথায় কান না দিয়ে স্রেফ ডিম সেদ্ধ আর বাটার্ড টোস্টের ডিশ এগিয়ে দেবেন।

রাত সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত টানা অপেক্ষা করে মিসেস ক্লার্ক শুয়ে পড়লেন। রাত্রিবেলা একটানা ঘুম হল না, আজেবাজে স্বপ্ন দেখলেন। খুব ভোরে ঘুম ভেঙে যেতে মিসেস ক্লার্ক তাড়াতাড়ি উঠে ওদের দরজার কাছে গেলেন, দেখলেন তখনও তালা ঝুলছে। কী আশ্চর্য! সারাদিন, সারারাত কেটে গেল। অল্প বয়সের যৌবন উৎসাহের একটা সীমা আছে তো? যতই আকাশের নীল আর বনের সবুজ দেখ না কেন পেটে দুটি খেতে আর রাতে একটু শুতে হবে তো!

মিসেস ক্লার্ক বন্ধ দরজা টেনে দেখলেন, কাঠের ফ্রেমে কাঁচের দরজা। ভেতরে লম্বা পর্দা টান্‌টান্ করে টেনে দেওয়া। বাইরে থেকে ঘরের ভেতর কিছু দেখবার উপায় নেই।

ঘরের পাশ থেকে একটা খচ্‌খচ্ আওয়াজ এলো। মিসেস ক্লার্ক দরজার সামনে থেকে সরে গিয়ে পাশের দিকে তাকালেন। ঘরের পাশে মাত্র ফুট চারেকের মতো সরু ফালি জমি, তারপরেই পাহাড়ের খানিকটা অংশ উঁচু পাঁচিলের মতো দাঁড়িয়ে উঠে আবার সমতল হয়ে গেছে। সেখানে খানকয়েক বসতবাড়ি। ঐ ফালি জমিটা দিয়ে রাস্টিক বোর্ডিং হাউসের জলের পাইপ গেছে। আর আছে ড্রেন। ঘরের পেছনে লাগোয়া বাথরুম থেকে পাতলা টিনের একটা সরু চোঙা বেরিয়ে ড্রেনের ওপর পড়েছে। খচ্‌খচ্ আওয়াজ শুনে মিসেস ক্লার্ক মাথা ঝুঁকিয়ে দেখলেন, একটা কালো লোমশ পাহাড়ী কুকুর। পাড়ায় ঘুরে বেড়ায়। স্ট্রীট ডগ হলেও চেহারা

দেখলে ভয় করে। কুকুরটা বাথরুমের টিনের চোঙটার ভেতরে কি শুঁখছে আর জিভ দিয়ে চাট্‌ছে।

মিসেস ক্লার্ক একটু অবাক হলেন। মুখে হুস্‌ করে শব্দ করলেন। কুকুরটা মুখ তুলে দেখল। মিসেস ক্লার্ক একটা পাথরের টুকরো ছুঁড়ে মারলেন। কুকুরটা কিছুদূর চলে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। মিসেস ক্লার্ক এগিয়ে নর্দমার মুখের দিকে তাকালেন, আর সেই মুহূর্তে গোটা শিরদাঁড়াটার মধ্যে বরফগলা জল নেমে যেতে লাগলো।

কালো জমাটবাঁধা ও কী! কুকুরটা যেখানে চেটে খাচ্ছিল সেখানটায় কাল্‌চে লাল রং!

মিসেস ক্লার্কের তীক্ষ্ণ আর্তনাদে ছুটে এলো ঠিক ওপরেই যে বাড়িটা তার মালিক মিস্টার কাপুর। তারপর এলো আরও অনেকে। খবর গেল দয়াল পরিবারে। হরিশঙ্কর দয়াল ছিলেন। তিনি এসেই খবর পাঠালেন পুলিস থানায়। পুলিস ইন্‌সপেক্‌টর মিস্টার থাপা সামনের দরজা ভাঙলেন। ঐ দরজা ভাঙতে বেশী জোর লাগে না। পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকতেই একটা উৎকট পচা গন্ধ নাকে ধাক্কা দিল। সামনের দিকে দুখানা নড়বড়ে সোফা, পেছনে পাশাপাশি দুখানা সরু খাট, মানে দুখানা নীচু তক্তপোশ। তার পেছনে সবুজ রঙের পাতলা টিনের পার্টিসন করা বাথরুম। এক পাল্লার দরজা, সামনের দিক থেকে ছিট্‌কিনি লাগানো।

মিস্টার থাপা একটানে দরজাটা খুলে ফেলতেই সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য চোখে পড়লো। মেয়েটা মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। মাথার পেছনে আর ঘাড়ে প্রচণ্ড আঘাতে গভীর ক্ষত। অজস্র রক্তপাতে নর্দমার মুখ কালো জমাট বেঁধে প্রায় আটকে গেছে। মেয়েটির মুখখানা কালচে নীল। ছেলেটার চিহ্নমাত্র নেই, চিহ্ন নেই ওরা যেছটো ব্যাগ বয়ে এনেছিল তার।

মিলিটারী হসপিটাল থেকে ডাক্তার এসে মেয়েটাকে পরীক্ষা করে বলল প্রায় ঘণ্টা ত্রিশেক আগে মৃত্যু হয়েছে এবং এটা একেবারে নিছক নির্লজ্জ খুনের ঘটনা। গায়ে একটিমাত্র রাত্রিবাস ছাড়া

মেয়েটার আর কোথাও কোন কিছু পাওয়া গেল না। কেবল যে হ্যাণ্ড ব্যাগটা নিয়ে মেয়েটা এসেছিল, সেটা শূন্যগর্ভ হয়ে বিছানায় পড়েছিল।

ব্যাপারটা কতদূর গড়াতো বলা যায় না। তবে এখানেও মিসেস ক্লার্ক বড়ো বাঁচান বেঁচে গেলেন ঐ একটি মহৎ লোকের জন্য, যাঁর নাম হরিশঙ্কর দয়াল। মিসেস ক্লার্ক দিনসাতেক কথা বলতে পারেন নি, কানে শুনতে, চোখে দেখতে পাননি! শূন্য দৃষ্টিতে কেবল ঐ ঘরটার দিকে তাকিয়ে থাকতেন আর ভাবতেন। হয়তো বা অস্বাভাবিক হয়ে যেতেন যদি না মিসেস দয়াল রাস্টিক বোর্ডিং হাউসে একেবারে তালা মেরে মিসেস ক্লার্ককে নিজের বাড়ি টেনে নিয়ে আসতেন।

"প্রায়ই আমি থাকি না, মিসেস ক্লার্ক থাকলে তবু তোমার নিঃসঙ্গতা খানিকটা কাটবে। সব চাইতে ভালো হয় যদি তুমি তাকে তোমার বাড়ির কেয়ারটেকার করে দাও।" হরিশঙ্কর দয়ালের এই কথার যথার্থতা সুভদ্রা দয়াল বুঝতে পেরেছিলেন আর সেদিন থেকেই মিসেস ক্লার্ক মিসেস দয়ালের সর্বক্ষণের সঙ্গী। হরিশঙ্কর দয়াল চলে যাবার পর আরও ঘনিষ্ঠ। নইলে কার মাথা থেকে হোটেল ডনের পরিকল্পনা বেরুত, কে এই বাড়িখানাকে বিশেষ বিশেষ সিজনে ট্যুরিস্ট বোর্ডারদের আগমনের পথ করে ঝলমলিয়ে রাখত! বেঁচে গেছেন মিসেস ক্লার্ক।

খুব বেঁচে গেছেন মিসেস সুভদ্রা দয়াল। সারাদিন কেটে যায় নানা চরিত্রের বোর্ডারদের দেখে। তাদের সঙ্গে দু-চারটে কথা বলে। কিন্তু যেই সন্ধ্যার পর রাত আসে, আর যে সময় কাটে না। মনে হয় এক্ষুনি কে যেন গেট ঠেলে সামনের বাগানে ঢুকবে। তারপর সতেজ, সশব্দ পা ফেলে ফেলে এগিয়ে আসবে। তারপর? তারপর সব শূন্য—সব খালি, নিরর্থক। হাতের সামনে ভাগ্যিস সাজান থাকে ঘুমপাড়ানি ট্যাবলেট। মিসেস দয়ালের একমাত্র সান্ত্বনা, একমাত্র শান্তি।

সুভদ্রা দয়ালের বাংলো বাড়ির গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে হু ডন, হোটেল ডন। মাত্র ছখানা স্যুইটের ছোট্ট হোটেল। দোতলা। ওপরে তিনখানা স্যুইট, নিচে তিনখানা। ওপরের ঘরের প্রত্যেকটির সঙ্গে লাগোয়া চওড়া ব্যালকনি। কাঁচের জানলায় তিনদিক ঢাকা। ভেতরের দিকে পেলমেট থেকে পর্দা নামানো। ইচ্ছেমতো দাঁড়িয়ে মুখ বার করে বাইরের শোভা দেখ। ঠাণ্ডা লাগলে ভেতরে মাথা গুটিয়ে নিয়ে জানলা বন্ধ করে পর্দা টেনে দাও। ভেতরটা ওম্ হয়ে উঠবে। ইচ্ছে করলে সুদৃশ্য আর্ম চেয়ারে বসে রিল্যাক্স কর। গল্পের বই পড় কিংবা অতীত রোমন্থন কর। কোন অসুবিধে নেই। স্বভাবতই নীচের স্যুইটের চাইতে ওপরের স্যুইটের দক্ষিণা বেশী। একমাত্র বাইরে বেরোবার রাস্তা ছাড়া ডন হোটেলের সব কখানা ঘর পুবমুখো, সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে গোটা বাড়িটা ঝলমলিয়ে ওঠে।

দশ বছর আগে এসে টিনা কিন্তু এসব দেখেনি। তখন হোটেল ছিল না, ছিল মাত্র দুখানা ঘরের গেস্ট হাউস, ঘরের লাগোয়া বাথরুম। আলাদা কিচেন, প্যানট্রি। রাস্তার ধারে, বাউণ্ডারী ওয়ালের গা ঘেঁষে গ্যারেজ, আর বাড়ির একেবারে পেছনদিকে বেয়ারা-বাবুর্চির থাকবার জন্য আউটহাউস। হরিশঙ্কর দয়ালের বড় শখের গেস্ট হাউস। নাম দিয়েছিলেন সানি লজ। কয়েক বছর আগেও সানি লজে হরিশঙ্কর দয়ালের নামী ও দামী বন্ধুরা কতবার কদিনের জন্য সানি লজে আসতেন, বিশ্রাম করতেন আর মিসেস দয়ালের আতিথেয়তায় মুগ্ধ হতেন। স্মৃতির রেশ নিয়ে ফিরে যেতেন।

সে সব দিন এখন বিগত। সেই সাংঘাতিক দুর্ঘটনাটা ঘটে যাবার পর যখন কোনরকমে জোড়াতালি লাগানো জীবনে একটু সয়ে এলো, তখন ঐ বাড়িটাকেই মিলিটারী এঞ্জিনীয়ার মিস্টার বাস্তব কেমন করে যে বাড়িয়ে, বেঁকিয়ে কোনাকুনি ঘর তুলে আরও চারটে চমৎকার স্যুইট করে দিলেন, সেটাও আশ্চর্যের ব্যাপার। অবশ্য এইসব কাজে অনেকখানি মূল্যবান বাস্তববুদ্ধির যোগান দিয়ে-

ছিলেন মিসেস ক্লার্ক। মিসেস মারিয়া ক্লার্ক। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি শ্যামাঙ্গী মেমসাহেব। ভারতবর্ষে জন্ম, আর খুব ভালো করেই জানেন তাঁর মৃত্যু এদেশের মাটিতেই হবে। তবে সবাইকে বলেন তার বাবা-মা ছিলেন খাঁটি ইংরেজ, স্বামীও ছিলেন তাই। নেহাতই ভাগ্যের নির্দেশে স্বামী ইণ্ডিয়ান রেলওয়েতে গার্ডের কাজে নিযুক্ত ছিলেন।

সামনে ফুলবাগান, আর পেছনে একফালি সব্জি ক্ষেতের মাঝখানে লাল রঙের রেলওয়ে কোয়ার্টার্সের কথা মিসেস ক্লার্ক ভুলতে পারেন না। মনে পড়ে সামনের বাগানে নিজের হাতে মাটি খুঁড়ে, গাছ লাগিয়ে রকমারী ফুল ফোটাতেন, পেছনের ঐটুকুন জমিতে ফলাতেন বেগুন, বরবটি, শীতকালে কত না টমাটো, কড়াই-শুঁটি, এমনকি দু'চারটে করে বাঁধাকপি, ফুলকপি পর্যন্ত। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কোয়ার্টার্সের বাগানে ছুটোছুটি করে বেড়াতো দুটি চুলবুলি ছেলেমেয়ে, টার্নার আর মেরিলিন। মা শ্যামা হলেও ওরা দুটি ছিল কি সুন্দর, মিষ্টি মধুর ছেলে আর মেয়ে। 'ওরা ছিল' বলতে গিয়ে মিসেস ক্লার্কের চোখে জল আসে, কিন্তু উপায় তো নেই। স্বামী পাউলের চেহারা, রং, ফিগার নিয়ে কি গর্বই না ছিল মারিয়া ক্লার্কের। কি করে যে অমন স্বামী এমন কালো বউকে এত ভালোবাসতেন! স্বামী চলে গেছেন আঠারো বছর পার হয়ে গেছে এখনও সেই জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটি ঘটনা পুরোপুরি মনে আছে। তখন জীবনে, সংসারে কত সুখ ছিল, সন্তোষ ছিল। মারিয়াকে তখন ওদের সমাজের সবাই হিংসে করতো, মুখে ঠাট্টা করতো, আবার বিস্মিত হতো এক নাগাড়ে এত বছর কোন স্বামী-স্ত্রী সদ্ভাব নিয়ে থাকতে পারে!

টিনা একটু নড়েচড়ে উঠল। একটা ছোট্ট হাই তুলল। যতই অক্সিজেনের অভাব ঘটে হাই উঠুক না কেন, টিনা জানে ঘুম আসবে না, ফের ঘুম আসতে সেই শেষ রাত। যার ঘণ্টা দুয়েক পরেই দরজায় ঠুক্‌ঠুক্ শব্দ হবে। মিসেস ক্লার্ক নিজের হাতে বেড টি নিয়ে

আসবেন, সুপ্রভাত জানাবেন। শুধু টিনাকে নয়, যে কজন বোর্ডার থাকবে, সবাইকে। হোটেল চালাতে গেলে নাকি অনেক সৌজন্য দেখাতে হয়। নইলে বেয়ারা ভৃত্যের তো কোন কমতি নেই।

সকালবেলা ঘুম চোখ খুলেই মিসেস ক্লার্ককে দেখতে বড়ো ভালো লাগে টিনার। কি পরিশ্রম, কি নিষ্ঠা নিয়েই না তিনি এই হোটেল চালান। সারা দিন রাতে বিশ্রাম শুধু বেলা দুটো থেকে চারটে। সেই সময়টুকু আবার শুয়ে বসে বিশ্রাম নয়, হাতে কিছু না কিছু সেলাই থাকবে। নিজের কিছু না, হোটেলের। হয়তো কোন পর্দার দুপাশে নেটের কোথাও একটু সেলাই খুলে গেছে, কিংবা কোন কুশনের একটা কোণ ছিঁড়ে গেছে, অথবা পিলো কেসের বোতাম আলগা হয়ে এসেছে, এগুলি সব আবার ঠিকঠাক হয়ে যাবে মিসেস ক্লার্কের হাতের স্পর্শগুণে।

এই দুটি ঘণ্টার জন্য টিনা প্রতিদিন আকুল আগ্রহে বসে থাকে। মিসেস ক্লার্ক টিনাকে ডেকে নেন, দুজনে চলে যায় সামনের লনে। সেখানে গার্ডেন আমব্রেলার নীচে বেতের চেয়ারে বসে রোদ পোহায়। আর ঐ সময়টুকুতেই টিনা গল্প শোনে। সত্যি গল্প, গল্প বলেন মিসেস মারিয়া ক্লার্ক।

"তারপর, তারপর আন্টি, সেই যে আপনার ফুলের মতো মিষ্টি মেয়ে মেরিলিন ক্লাসে ফার্স্ট হয়ে, অনেক প্রাইজ নিয়ে বাড়ি এলো— তারপর!" টিনার ঔৎসুক্যের যেন শেষ নেই।

"আমার মেয়ে সেদিন একা এলো না, তার সঙ্গে এলো টনি কার্টার, স্কুলের রেক্টর গ্রেগরী কার্টারের ছেলে ··

"সে এসেই কি বলেছিলো, বলুন আন্টি।"

"কি আর বলবে টিনা, ঐসব উঠতি বয়সের ছেলে, কলেজে ভর্তি হয়েছে, ভালো ক্রিকেট খেলে, পাঁচজনে বাহবা দেয়, ভাবে কী না জানি হয়েছি। বাড়ি এসে আমার আর পাউলের সামনেই আমার মেয়েকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলো, তারপর বললো, "আমরা দুজন দুজনকে কথা দিয়েছি, আমরা বিয়ে করবো।"

আপনার মেয়ের বয়স তো তখন সবে চোদ্দ।

"বল, ঐটুকুন মেয়ে লেখাপড়ায় কি ভালো, দেখতে টুকটুকে, কি নরম স্বভাব, তাকে কিনা ভুলিয়ে মেরেছে ঐ চোয়াড়ে ছেলেটা যে কি না প্রায়ই মারামারি করে নানান হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়ে। দু-দুবার পুলিসের খাতায় যার নাম উঠেছে।"

মিসেস ক্লার্ক হাতের কাজ থামিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর বললেন—"পাউল ছিল অতি ভদ্র সজ্জন। সে সেদিন মুখে কিছু বললো না। ঐ ছোকরাটাকে কাছে বসিয়ে চা খাওয়ালো, গল্প করলো, আর রাত্রিবেলাতেই আমাকে বললে"—মিসেস ক্লার্ককে থামতে দেখে টিনা ছটফটিয়ে বলে উঠল, "তারপর, রাত্রিবেলা মেরিলিনের বাবা কী বললেন?"

মিসেস ক্লার্ক বললেন, "ওর বাবা রাত্রিবেলা শুতে এসে আমাকে বললো—মেরিলিনকে আর এখানে রাখা চলবে না। ওকে অন্তত মাস দুয়েকের জন্য শিলংএ ইভলিনের কাছে পাঠিয়ে দাও। পড়াশুনোর খানিকটা ক্ষতি হলেও উপায় নেই।"

"ইভলিন কে?"

"পাউলের সব চাইতে ছোট বোন। শিলংএ স্কুল টিচার। বিয়ে করেনি।"

"তারপর?"

"পাউল তলায় তলায় সব ব্যবস্থা করে ফেলল। আমাদের দুজনকারই মন খুব খারাপ। মেয়েটাকে কি করে ছেড়ে থাকবো, ছেলেও তো তখন কাছে থাকে না। সে তখন সবে মাসখানেক হল খড়্গাপুর ওয়ার্কশপে কাজে ঢুকেছে। কিন্তু উপায়ও তো কিছু ছিল না। মেয়ের ভবিষ্যৎ বলে কথা।"

"তারপর?"

"তারপর মেয়েটাকে একদিন গাড়িতে তুলে দিলাম। চোখের জল ফেলতে ফেলতেও বিস্মিত হয়ে দেখলাম, মেয়ের মুখখানা কি কঠিন, চোখদুটো শুখনো খট্‌খটে। যখন গাড়ি ছেড়ে দিল, আমি

আর ওর বাবা কত হাত নাড়লাম। ও একবার একটুখানি তাকিয়ে সেই যে মুখ ঘুরিয়ে নিল, প্লাটফর্ম ছেড়ে গাড়ি একেবারে না চলে যাওয়া পর্যন্ত আর মুখ ফেরায় নি। স্টেশন থেকে বাড়ি ফেরার পথে পাউল একবার বললো, "টনিকে আমাদের এতটা ভয় না করলেই বোধহয় ভালো ছিল!"

"তারপর আন্টি, কদিন পরে আপনার মেয়ে ফিরে এলো?"

"আর ফেরেনি।"

"মানে!"

"না টিনা, আমাদের মেয়ে মেরিলিন আর কোনোদিন আমাদের কাছে ফিরে আসে নি। গিয়ে একখানি মাত্র চিঠি লিখেছিল, তাতে লিখেছিল, যে-বাবা-মা অন্যের সন্তানের ভয়ে নিজের সন্তানকে সংসার থেকে বার করে দেয়, সেই মা-বাবাকে ও আর চেনে না, কোনোদিন চিন্‌তে চাইবে না।"

"আপনারাই বা একটা মাত্র মেয়েকে এমনভাবে পাঠিয়ে দিলেন কেন? টনির মতো ঐ অসভ্য ছেলেটাকে এত ভয় করতেন!"

"শুধু যদি অসভ্য হতো, তাহলে এতটা ভয় পেতাম না। কিন্তু টনি ছিল গুণ্ডা, ওয়াগন ব্রেকারের দলের সঙ্গে ও হাত মিলিয়ে ছিল। আরও নানা বিদ্যায় ও হাত পাকাচ্ছিল। আমরা জানতে পেরেছিলাম মেরিলিনকে ও স্কুলে যাওয়ার পথে কিড্‌ন্যাপ করার তালে আছে।"

"কিন্তু আন্টি, এমন একটা বিশ্রী ছেলেকে মেরিলিন পছন্দ করলো কি করে, আর ঐ তো ছোট্ট মেয়ে, ওর মনের মধ্যে এসব এলো কি করে!"

"তুমি জানো না টিনা, আমাদের সমাজে ছেলে-মেয়ে পাকা হয়েই মায়ের পেট থেকে পড়ে। নইলে আমরা তো মেয়েকে মানুষ করছিলাম কত যত্নে, কত সাবধানে।"

"তারপর?"

"ইভলিন শিলং থেকে খুশী হয়ে লিখল মেরিলিনের মতো এতো

রুচিশীলা, এতো বুদ্ধিমতী মেয়ে হয় না। আর এর মাত্র মাসখানেক পরেই এলো সেই সর্বনেশে খবর।"

মিসেস ক্লার্কের গলা থমথমিয়ে উঠল। হাতের কাজ থামিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। একটু পরে টিনার কৌতূহলে-ফেটে-পড়া মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ইভলিন মাসখানেক পরেই আরেকখানা চিঠি লিখল, আর তাতে লেখা ছিল—"আশা করি মেরিলিন আর তোমার বোনপো টনি মঙ্গলমতো বাড়ি পৌঁছেছে। তুমি চিঠিতে লিখেছিলে মেরিলিন আমার কাছে অন্তত মাস দুয়েক থাকবে। হঠাৎ কি এমন হোল যে এত তাড়াতাড়ি মেয়েকে নিয়ে গেলে? তোমার বোনপোও কিছু জানে না। শুধু তোমার লেখা চিঠিখানা আমার হাতে দিল, তাতে দেখলাম তুমি লিখেছো বিশেষ দরকারেই নাকি মেরিলিনের বাড়ি ফিরে যাওয়া অত্যন্ত দরকার। তোমরা নাকি মেরিলিনের বিয়ে ঠিক করবে। ছেলে এতদিন বাইরে ছিল। সে ফিরে এসেছে তার সঙ্গে মেয়ের পরিচয় হওয়া দরকার, তাই মেরিলিনকে যেন অতি অবশ্য তোমার বোনপোর সঙ্গে পাঠিয়ে দিই। এতো অল্প বয়সের মেয়েকে কেন এত তাড়াতাড়ি বাগ্‌দত্ত করিয়ে রাখছো জানি না। তবে মেরিলিনের মতো সুন্দরী মেয়েকে বেশিদিন আইবুড়ো করে ঘরে না রাখাই ভালো। যা দিনকাল।"

টিনার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। "টনি ছেলেটা আপনার বোনপো সেজে মেরিলিনকে নিয়ে এল?"

"নিয়ে আসেনি। নিয়ে কোথায় চলে গেল।" মিসেস ক্লার্ক শূন্য চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

"আপনার হাতের লেখা তো মিস্ ইভলিন চিনতেন।"

টিনার বিস্মিত প্রশ্নের উত্তরে মিসেস ক্লার্ক বললেন, "আমার হাতের লেখা চিঠি ইভলিন কটাই বা পেয়েছে? মেরিলিনকে ওর কাছে পাঠানোর ব্যাপারে আমি তো মাত্র একখানা চিঠিই দিয়েছিলাম, আর খানকয়েক চিঠি লিখেছিল পাউল। মাত্র একখানা

চিঠির হাতের লেখা কি কেউ মনে ধরে রাখতে পারে যে আমার লেখা ও চিনবে? জানোই তো আমাদের সমাজে তোমাদের মত আত্মীয়-পরিজনদের সঙ্গে অত কিছু মাখামাখি থাকে না।"

"আঙ্কল পাউল পুলিশে খবর দিলেন না কেন!"

মিস ক্লার্কের মুখে করুণ হাসি ফুটে উঠল—"কোন্ মুখে পাউল পুলিশের কাছে যাবে বল! এই ব্যাপারে আমাদের মেয়ের সায় না থাকলে হাজার টনি কার্টারেরও সাধ্য হত না অমন সাহস দেখাতে।"

"আর কোন খবর পাননি?"

"পেয়েছিলাম প্রায় সাত বছর পরে। ততদিনে ট্রেন দুর্ঘটনায় পাউল মারা গেছে। আমি রেলওয়ে অফিসে টাইপিস্টের কাজ করি। ছেলে জোসেফ চলে গিয়েছিল ওয়েস্ট জার্মানীতে। এমন সময় এক ভদ্রলোক এলেন আমাদের অফিসে। উনি নাকি মিস্টার পাউল ক্লার্কের অনেক খোঁজ করতে করতেই এখানে এসেছেন। শুনেছেন তাঁর স্ত্রী এখানে কাজ করেন। কিছু নাকি বলবার আছে। দৈবঘটনা কাকে বলে দেখ। উনি আমার কাছে এলেন, নিজের পরিচয় দিলেন। দেশ গোয়াতে, থাকেন মরিশাসে। তিনি খবর দিলেন আমার মেয়ে মেরিলিন বর্তমানে মরিশাসে সুখে সংসার করছে। স্বামী আখের ক্ষেতের মালিক। মেরিলিন জানতে চেয়েছে তার মা বাবা ভাই কেমন আছে।"

"জানো টিনা, আমার কেন জানি পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বালা করে উঠল। অনেকক্ষণ কথা বলতে পারলাম না। জানুয়ারী মাস হলেও ঘামছিলাম। লোকটির কথায় সংবিৎ ফিরে পেলাম। বললাম, 'আমি মিসেস পাউল ক্লার্ক নই। মেরিলিনকে গিয়ে বলবেন ওর মা, বাবা দুজনেই মারা গেছে। ভাই কোথায় জানি না'।"

"ওহ্, এই দুঃখের খবরটা মিসেস অ্যামিসকে দিতে হবে, আমি দুঃখিত..."

"ওর স্বামীর নাম কি?" আমি চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলাম।

"জন অ্যামিস।"

"টনি কার্টার নয়?"

"না তো, তবে ওর ছেলের নাম টনি।"

"আপনি আসুন, আমি এবার উঠবো।" মিসেস ক্লার্ক চুপ করলেন।

"তারপর আন্টি! তারপর কি হল?"

"তারপর আর কিছু হল না, পৃথিবী যেমন চলে তেমনি চলতে লাগল, শুধু আমার পেটের মেয়ে জানল তার মা-বাবা বলে আর কেউ নেই। কোনোদিন যদি আমার সঙ্গে ওর কোথাও-না-কোথাও দেখা হয়, ও চমকে উঠে ভাববে ওর মায়ের মতো দেখতে এক মহিলা।"

ডন হোটেলের একতলায় এক নম্বর স্যুইটের বেডরুমে খাটের ওপর মুখ গুঁজে শুয়ে আছে তনিমা রায়। গতকাল এমন সময় সে রাত জেগেছে তার ওপরে তিন স্যুইটের শোবার ঘরে। ঐ ঘরের বাচ্চা ছেলেটা গতকাল সারাদিন আর প্রায় সারা সন্ধ্যা কেঁদেছে, ককিয়ে ককিয়ে কেঁদেছে। দিনের বেলায় কেঁদেছে পেটের অসহ্য যন্ত্রণায়। সন্ধ্যার পর সেই ব্যথা কমে যাবার পর কেঁদেছে খিদেয়। আজ থেকে ঠিক পাঁচদিন আগে স্বামী-স্ত্রী তাদের ছেলেটিকে নিয়ে এখানে এসেছিল। এবং সেই পাঁচদিন তনিমা রায় এই পরিবারটির দিকে তাকায়নি, নিজেকে তাদের সামনে বার করেনি। গতকাল বাচ্চাটি সকাল থেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। কাঁদতে শুরু করেছিল। বছর ছয়েকের ছেলে, অনর্গল কথা বলে। ফুল ছুঁয়ে ছুঁয়ে খেলা করে। সঙ্গে ছায়ার মত থাকে একটি নেপালী আয়া। স্বামী-স্ত্রী একটি বাচ্চা। পাঁচদিন আগে যখন একখানা ট্যাক্সি হোটেল ডন-এর পোর্টিকোর নীচে এসে দাঁড়াল, তনিমা রায় তার জানলার পর্দা সরিয়ে দেখতে চেষ্টা করল নতুন বোর্ডারদের, আর ঠিক তখনই মনে হল একটা বড় ভূমিকম্পে কেন হোটেল ডন মুখ থুবড়ে ভেঙেচুরে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যাচ্ছে না, কিংবা কেন চারদিকে দাবানলের

আগুন জ্বলে সবকিছুকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে শ্মশান করে দিচ্ছে না, অথবা আরও ভয়ঙ্কর কেন কিছু ঘটছে না!

পরশুদিন বিকেলবেলা ঐ তুড়তুড়ে ছেলেটা লনের ঘাস মাড়াতে মাড়াতে তনিমা রায়ের ঘরের জানলা পর্যন্ত এসে আবার চলে গেল। তনিমা রায় পাথর-চোখে তাকিয়ে রইল ছেলেটির পায়ে-মাড়ানো মুচড়ানো ঘাসগুলির দিকে।

তনিমা রায় তো নিজেকে গুটিয়েই নিয়েছে। আজ থেকে পাঁচ বছর ছ' মাস আগে তনিমা রায় সেই বাড়িটা থেকে একটা মাত্র ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল, তারপর কত কী হয়ে গেল। এখন তনিমা রায় একেবারে একা: বাড়ি, আত্মীয়-স্বজন, প্রিয়জন, দাদা-বৌদি, তাদের ছেলেমেয়ে সকলের কাছ থেকে তনিমা রায় সরে এসেছে। কোলকাতার একটা নাম করা ফার্মে এসিস্ট্যান্ট পাবলিক রিলেশন্‌স্ অফিসার তনিমা রায় এই প্রথম পনেরো দিনের ছুটি নিয়ে বিশ্রাম করার জন্য এই নির্জন বরফ-দেশটিকে বেছে নিয়েছে। ছুটি ফুরোতে আর মাত্র কয়েকটি দিন বাকি। ভাগ্য তো অনেক খেলাই খেলছে তনিমা রায়ের জীবন নিয়ে। সবচাইতে ভালো খেলাটা বুঝি অপেক্ষা করছিল এখানে!

গত পাঁচ বছরের জীবনে সব কিছু ওলট-পালট হয়ে তনিমা রায় এখন একেবারে নিঃসঙ্গ। সে এখন থাকে একান্ত নিভৃতে লোয়ার সার্কুলার রোডে বিরাট ম্যানসনের একটা একখানা ঘরের ফ্ল্যাটে। দু বেলা একটি মেয়ে এসে ঠিকে কাজ করে দেয়। সামান্য কিছু রান্না করে। রান্না মানে তো সকালবেলায় অল্প একটু ভাত, তার সঙ্গে ঝোল মতন কিছু। রাত্রিবেলা তনিমা রায়ের খাওয়া আরও সংক্ষিপ্ত। কয়েক স্লাইস পাঁউরুটি, তার সঙ্গে এক মগ স্যুপ, কখনও বাড়ির তৈরি, কখনও বা কিনে আনা টিনের কৌটোর মুখ খুলে গরম করে নেওয়া। সঙ্গে একটা কিছু ফল। ঘুমোতে যাবার আগে এক কাপ গরম দুধ।

অথচ, অথচ কয়েক বছর আগে! তনিমা রায় কি আজ এই

রাত্রে ফেলে-আসা, জোর-করে ভুলে-যাওয়া জীবনটাকে একটু নেড়ে-চেড়ে দেখবে? ছিঁড়বে, ফুটবে? রক্তক্ষরণ একটু হোলই বা!

কয়েক বছর আগে বিকেল হবার আগেই না প্রতিদিন তনিমা বেরিয়ে পড়তো! বৌদি সস্নেহে একবার করে বলতো, বেশী রাত করো না তনু, আমাকে চিন্তায় ফেলো না।

তনিমা তো একা বেরোত না, সঙ্গে থাকত সেই লোকটি। যার নাম ছিল নীলেন্দু। ছিল না, এখনও আছে। নীল আর ইন্দু। তনিমা ডাকত কখনও নীল, কখনও ইন্দু। লোকটা কত হাসত, তনিমার হাত দুখানা ধরে বলত, তোমার ভালোবাসার ঘায়ে আমি দু টুকরো।

"এর পর আহ্লাদে আট টুকরো করে ছাড়বো।" তনিমা জিভ বার করে ভেংচে ভেংচে বলত।

"তুমি যেমনভাবে রাখবে, আমি তাই থাকব মহারাণী, শুধু যখন তখন অমন রাগ-অভিমান কোরো না"—নীলেন্দু হাত জোড় করে দাঁড়াত।

"মানে!" তনিমা ফুঁসে উঠত।

"এই দেখ, এক মুহূর্ত গেল না, ক্ষেপে গেলে।"

"আমি পাগল নই, ও রকম যা তা বলবে না।"

"মাথা খারাপ, মুখ ফস্কে কী একটু বলে ফেলেছি, তুমি কত ভালো, কী লক্ষ্মী।"

"আবার!" তনিমা চোখ পাকিয়ে তাকাত। নীলেন্দু হাসি মুখে সেই চোখের দিকে তাকিয়ে দেখত।

বিয়ের দিন নীলেন্দুর পছন্দ মতো তনিমাকে সাজতে হয়েছিল। মভ কালারের বেনারসী পরেছিল। উজ্জ্বল শ্যামলা রঙে অপূর্ব মানিয়েছিল। হাতে, গলায়, কানে পাথর বসান হাল্‌কা সোনার গয়না! দাদা বৌদির উপহার।

তনিমার শ্যামলা মুখে চন্দন আঁকতে আঁকতে বন্ধু মীনা থুত্‌নি নেড়ে বলেছিল, "নীলেন্দু আজকে তোকে দেখে মুচ্ছো যাবে।"

"মুচ্ছো যাবে কিরে, বল্ মরে পড়ে থাকবে।" তনিমার এই উক্তিতে বৌদি জোরে ধমকে উঠেছিল। "কথার মাত্রা রাখতে শিখলি না তনু, আজকের দিনে এই কথা বলতে হয়!"

"কি যে তোমাদের সংস্কার বৌদি, বললেই কি কিছু ফলে যায়!"

"শুভ অনুষ্ঠানে সংস্কারকে মানতেই হবে, ভারতবর্ষের নিয়ম।"

তনিমা এর উত্তরে মুখ নেড়ে কি সব বলতে যাচ্ছিল, মীনা ধমকে দিল, "ঠোঁট দুটোয় এবার একটু ক্রীম দিয়ে নরম করে লিপস্টিক বুলোতে হবে, বক্‌বকানি থামা।"

সত্যিই সেদিন তনিমাকে ভারী সুন্দর দেখিয়েছিল। নীলেন্দুর ছোট বোন রত্না জড়িয়ে ধরেছিল তনিমাকে, "এমনটি না হলে বৌদি ."

আর নীলেন্দু! শুভদৃষ্টির সময় কী গভীরভাবে তাকিয়েছিল তনিমার দিকে। তনিমা ঠোঁট টিপে চোখ বুজেছিল। চারপাশের অনুরোধে চোখ মেলে নীলেন্দুর চোখের দিকে তাকিয়ে কেন জানি কান্না পেয়ে গিয়েছিল। নীলেন্দু তাকে এত কেন ভালবাসে! ফুল-শয্যার রাতে নীলেন্দু তনিমাকে অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে দেয়নি। নিবিড়ভাবে স্ত্রীকে কাছে টেনে নিয়ে বলেছিল, "কোন কথা নয়, আজকে আমাকে শুধু ভাবতে দাও, বুঝতে দাও তোমাকে আমি পেয়েছি। শেষের সেই দিনটি ছাড়া আমাকে তোমাকে কেউ বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না।"

অন্ধকারের মধ্যে তনিমা রায় আপন মনে হেসে উঠল। চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ল দু' গালে।

মনে হয় এই সেদিনকার ঘটনা। সংসারে লোক বলতে তো ঐ নীলেন্দু আর ছোট বোন রত্না। নীলেন্দু যখন তের বছরের, রত্নার চার, তখন ওদের বাবা মারা যায়। আর নীলেন্দু যখন সবে চব্বিশে

পা দিয়ে চাকরিতে ঢুকেছে, রত্নার বয়স পনের, তখন ওদের মা চলে গেলেন। তনিমার চোখ দুটি জলে ভরে উঠত ওদের দু ভাইবোনের দুর্ভাগ্যের সেই ইতিহাস শুনে।

"জানো তনু, যখন অফিস থেকে ফিরে এসে সারাদিন একা, সংসারের যাবতীয় খাটুনি খাটা রতনের ক্লান্ত, বিমর্ষ মুখখানা দেখতাম, মা-বাবার ওপর রাগ হত, মনে হত পৃথিবীতে সবচাইতে অসুখী আমি। আমি সব কাজে কেমন থমকে যেতাম। এমন সময় কোন্ দৈবের বিধানে আমাদের হতাশায়-ভরা ভাইবোনের সংসারে এসে আশ্রয় নিলেন ন' মাসীমা। ছেলেপুলে হয়নি। স্বামী মারা যেতে আমাদের আঁকড়ে ধরলেন, আমি বেঁচে গেলাম। আরও বেশী বাঁচল রতন। কত কষ্ট করে প্রাইভেটে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষাও মোটামুটি-ভাবে পাস করে কলেজে ভর্তি হল। মাসীমা সংসারের হাল ধরলেন। আমার কাজে উন্নতি হল, আর তারপরেই আমি তোমার দেখা পেলাম।"

"তুমি আমার, একেবারে আমার।" ফুলশয্যার রাতে কি নীলেন্দু পাগল হয়ে গিয়েছিল! পরে একদিন তনিমা নীলেন্দুকে জিভ ভেংচে ভেংচে বলেছিল, "এমন আদেখলাপনা করেছিলে না!"

"আদেখলাপনা করব না তো কি করব! আমি কি তোমাকে পাওয়ার আগে কখনও প্রেম করেছি—তাই নতুন কিছু পেয়ে লোকে যেমন করে আমিও তাই করেছি।"

"আর আমিই বুঝি আগে প্রেম করেছি! কই তোমার মতো ঐ রকম মাথা খারাপ তো করিনি!"

"তোমার কথা আলাদা, তোমার সঙ্গে কারও তুলনা! বাপ্স এত সাহস আমার নেই।"

"দেখ কথায় কথায় অমন ঠাট্টা কোরো না বলছি।" তনিমা চোখ পাকিয়ে তাকিয়েছিল।

ঝর্ণার জলের মতো তর্ তর্ করে দিন কাটছিল। সংসার যেমন

ন' মাসীমার পরিচালনায় চলছিল, তেমনি চলতে থাকল। বিয়ের পর দু বছরের মাথায় এক বৃহস্পতিবারের সকালে ন' মাসীমা শাঁকে ফুঁ দিলেন। নীলেন্দু সারারাত জেগে নার্সিংহোম থেকে খবর নিয়ে এল তনিমা মা হয়েছে, ছেলের মা। মা হতে কষ্ট পেয়েছে। এখন ভালো আছে।

নীলেন্দু সেদিন বোনের সঙ্গে খুব খুনসুটি করল। ন' মাসীমার সঙ্গে খানিকটা গল্প করল। ঘরের সামান্য পরিসরটুকুতে মিনিট পনেরো পায়চারি করল। মনে হল সেদিন সকাল থেকেই বেশ কিছুটা বয়স বেড়ে গেছে। মাথার ওপর এখন অনেক দায়িত্ব। ছেলেকে মানুষ করতে হবে, চাট্টিখানি কথা নয়। তনু নার্সিংহোম থেকে ফিরে এলে এই নিয়ে আলোচনা করে একটা প্ল্যান ছকে ফেলতে হবে। এখন তারা দুজনেই তো মা আর বাবা। বাবা আর মা। নীলেন্দুর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

তনিমা এই ব্যাপারেও নীলেন্দুকে কত মুখ ভেংচে ঠাট্টা করেছে। "কেউ যেন ছেলের বাপ হয় না।"

ছেলের নাম কি হবে এই নিয়েই কি কম তর্ক, কম কথা কাটাকাটি! আর তারপর তো সব কিছু নিয়েই কথা কাটাকাটি শুরু হল। আশ্চর্য, নিজের মতের সঙ্গে না মিললেই তনিমা চেঁচিয়ে উঠত। "যাও, এই ব্যাপারে আমাকে আর কোনদিন কিছু বলতে এস না।"

নীলেন্দু অবাক হয়ে বলত—"কি আশ্চর্য, তুমি এই সামান্য ব্যাপারে এত রেগে যাচ্ছ কেন তনু, একটু বুঝে দেখ!"

"আমি কিচ্ছু বুঝতে চাই না, তুমি যাও এখান থেকে।"

নীলেন্দু ভাবতে শুরু করেছিল। তনিমা, অমন মিষ্টি, ভদ্র তনিমা একটুতেই কেন মেজাজের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। কথায় কথায় হঠাৎ এত চটে ওঠে কেন? অথচ রাগ যখন চলে যায় মেজাজ ঠাণ্ডা হয়, তখন কাছে আসে, কেঁদে ভাসিয়ে দেয়, কি নরম হয়ে ক্ষমা চায় নিজের কর্কশ ব্যবহারের জন্য। "এবার থেকে দেখো, আর কখ্খনো

আমি এরকম করব না, খারাপ কথা বলব না।" কী ছেলেমানুষের মতো কথা। নীলেন্দুর বুক স্নেহ মমতায় ভরে উঠত। স্ত্রীর মাথায় হাত বুলিয়ে বলত—"ওরে বাবা, খুব ভালো মেয়ে হয়ে দরকার নেই, আমি তাহলে ভয় পাব।" সঙ্গে সঙ্গে একটা কিল এসে পড়ত পিঠের ওপর। কয়েক মুহূর্ত দুজন দুজনের কাছে বন্দী হ'য়ে ভাবত "কি সুখী, কি সুখী আমরা। ঈশ্বর তুমি আছ।"

"ছাই আছে।" তনিমা রায় কম্বল সরিয়ে অস্থির পায়ে উঠে দাঁড়াল। "ঈশ্বর নেই, কোনদিনই নেই। নইলে আমাকে কেউ চিনল না, কেউ বুঝতে চাইল না কেন?"

বিয়ের আগে বৌদি মাঝে মাঝে সাবধান করে দিত। "তনু, তোর এই হঠাৎ চটে ওঠা আর মুখের ভাষায় কোন আগল না রাখাটা কিন্তু অভ্যেসে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। এর ফল কিন্তু ভালো হবে না।"

তনিমা আরও চেঁচিয়ে উঠত। "তুমি শুধু-মুদু আমাকে শাসন করবে না বলছি।"

"কি আশ্চর্য তনু, তোকে আমি শাসন করছি! আচ্ছা আজ তুই রাধার মায়ের সঙ্গে অমন বিশ্রীভাবে কথা বললি কেন বলত? ভদ্রমহিলা কি ভাবলেন! ভদ্রতা, সৌজন্য বলেও তো একটা জিনিস আছে!'

বৌদির মুখের কথা শেষ না হ'তেই তনু দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলেছিল—"ওঃ ভদ্রতা! আর ঐ মহিলা যখন আমাকে পরীক্ষার রেজাল্ট নিয়ে মুখ বাঁকালেন। বললেন কালো রং রেজাল্ট দিয়ে ঢেকে রাখবি। তোমার হাতের অমন সুন্দর বোনায় ভুল না থাকলেও যখন বাজে বাজে ভুল দেখালেন, তখন তুমি চুপ করে রইলে কেন? আমার দাদার মেয়ের চুল নেই বলে কুট কুট করে ঠাট্টা করল কেন?"

বৌদি হেসে বলেছিল, "ওরে বাবা, তোকে পাগলা কুকুরে কামড়ালে কি তুইও তাকে কামড়াবি। এম. এ. পরীক্ষায় অত ভালো রেজাল্ট করে তোর এই শিক্ষা হয়েছে!"

এর উত্তরে তনিমা বৌদির বুকে মুখ লুকিয়ে ফিক্ করে হেসে বলেছিল, "এতক্ষণ বললেই তো পারতে রাধার মা পাগলা কুকুর। তা হ'লে তো আমি মোটেই চেঁচামেচি করতাম না।"

"উঃ, কি মেয়েরে তুই, আমি রাধার মাকে ঐ বলেছি। তনু, মনে যতই রাগ হোক, দুঃখ হোক, বাইরে অত দেখাস না। জীবনে চলতে গেলে অনেক মানিয়ে গুছিয়ে চলতে হয়।"

"ঐখানটাতেই আমার গোলমাল হল।" তনিমা রায় নিজের মনে বলে উঠল।

গতকাল এমন সময় তনিমা রায় ওপরের ঘরে রাত জেগে বসে ছিল। নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে দেখছিল প্রায় নেতিয়ে পড়া ঘুমন্ত ছেলেটির দিকে। বেলা এগারোটা-বারোটা থেকে ছেলেটি একটানা কেঁদেছে। নেপালী আয়া হিমসিম খেয়েছে কান্না থামাতে, পারেনি। মিসেস ক্লার্ক খবর পেয়ে ঐ ঘরে ঢুকেছিলেন, ছেলেটির পাশে বসে অনেক আদর করে করে কারণ জেনেছিলেন, পেটে অসহ্য যন্ত্রণা। এই দিনটিতে ঐ ছেলেটির জন্য মিসেস ক্লার্কের একটু অতিরিক্ত দায়িত্ব রয়েছে, কারণ ওর মা-বাবা ভোরবেলা ট্যুরিস্টকারে প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার দূরে অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যেভরা এক নির্জন শৈলপিঠে তার অসাধারণ সূর্যোদয় দেখতে বেরিয়ে গেছে। সারাদিন, সারারাত ওখানে থেকে ভোর চারটের সময় উঠে সূর্যোদয় দেখে ফিরে আসতে পরের দিন বেলা আটটা। এসেই আবার বেলা বারোটার মধ্যে হোটেল ছেড়ে যাত্রা করবে কোলকাতার উদ্দেশে।

তনিমা রায়ের সারা শরীরে সেই রাগের আগুন জ্বলে উঠেছিল। কি প্রচণ্ড রাগ। ঐ দুজনে বরফের শোভা দেখে কি করছে, কতটা আনন্দ পাচ্ছে? সূর্যের রক্তিম ছটায় ওরা কতখানি রাঙিয়ে যাবে! ছেলেটা চেপে চেপে কাঁদছে। মিসেস ক্লার্ক স্থানীয় ডাক্তার গুপ্তেকে ডেকেছিলেন। উনি দেখেশুনে ওষুধ দিয়ে গেছেন। কি খেতে দিতে হবে বলেছেন। কোন ত্রুটি মিসেস ক্লার্ক রাখেননি। ওঁর ভরসাতেই

বাচ্চার মা-বাবা ছেলেকে রেখে গেছেন। বরফের রাজ্যে অত ঠাণ্ডায় ঐটুকুন ছেলেকে নিয়ে যেতে উনিই বারণ করেছিলেন।

তনিমা রায় বিকেলবেলায় মিসেস ক্লার্কের সঙ্গে ওপরের স্যুইটে গিয়েছিল। ঘরে ঢুকে তাকিয়ে দেখেছিল অসুস্থ ছেলেটিকে, ঝড়ের তাণ্ডব কি শুধু বাইরেই দেখা যায়! বুকের মাঝখানে, প্রতি রক্তকণিকায় এর অস্তিত্বে অস্থির হয়ে উঠল তনিমা রায়। মাথার মধ্যেও যেন এক টুক্‌রো আগুন ঢুকে গিয়েছিল। কিন্তু মাথা ফেটে চৌচির হল না, বুক চিরে রক্ত বেরুল না এবং কিছুই হল না—তনিমা শুধু নিস্পন্দ, নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সামনে শুয়ে থাকা রুগ্ন দেহটির দিকে।

মিসেস ক্লার্ক ছেলেটির কপালে হাত দিয়ে ডাকলেন, "মাস্টার টুকুন, এখন কেমন লাগছে?"

"ভালো, আমাকে আইসক্রীম দাও, তুমি দেবে বলেছিলে!"

মিসেস ক্লার্ক হেসে জড়িয়ে ধরলেন টুকুনকে—"আজকে আইস-ক্রীম নয়। আরেকটু পরে দেখ তোমাকে কি সুন্দর বার্লি স্যুপ করে দেব। দেখবে কি ভালো খেতে। পেটের যন্ত্রণা আর একদম না হলে পাঁউরুটির মাঝখানটা সুন্দর টোস্ট করে দেব, তুমি চিনি দিয়ে মুড়মুড়িয়ে খাবে—"

"আইসক্রীম কখন দেবে?" টুকুনের নেতিয়ে পড়া চোখ দুটো চক্‌চক্ করে উঠল।

"তোমার পেট যখন একেবারে লক্ষ্মী হয়ে যাবে তখন!"

মিসেস ক্লার্ক ঘর থেকে চলে গিয়েছিলেন। সারা হোটেল জুড়ে তাঁর কাজ। এক জায়গায় খুব বেশীক্ষণ তাঁর থাকা চলে না।

তনিমা রায় খাটে বসে টুকুনকে কাছে টেনে নিল। দুহাতে তাকে জড়িয়ে চিবুকে হাত দিয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। "তোমার টুকুন নামটা কে রেখেছে সোনা?"

"বলব না" টুকুন ঠোঁট ফুলিয়ে মুখ গম্ভীর করে উত্তর দিল।

টুকুনের ডান কানের ঠিক নীচে ছোট্ট একটা লাল জড়ুল।

তনিমা জড়ুলটার ওপর তর্জনী দিয়ে বুলিয়ে দিল। "ওখানে হাত দিও না, হালুম করবে।" টুকুন তনিমা রায়ের আঙুলটা সরিয়ে দিল।

"তোমাকে হালুম করে বুঝি?" তনিমা টুকুনের গাল দুটো আলতোভাবে টিপে দিল।

"করেনি, করবে। বাবাই বলেছে ওখানে আঙুল দিয়ে চুলকোলে রক্ত বেরুবে আর আমাকে হালুম করবে।"

"তোমার মা তোমাকে কি বলে, সোনা?" তনিমা আরও নিবিড় হয়ে টুকুনের কাছে বসল। সুযোগ বুঝে "এক্ষুনি আসছি" বলে আয়াটি বাইরে গেল।

"মা খেলতে বলে—"

"আর কিছু বলে না!"

"আমাকে পড়তে বলে, লিখতে বলে। আমি লিখি না, পড়ি না।"

"কেন?"

টুকুনের ঠোঁট ফুলে উঠল, "আমার ভালো লাগে না, আমি স্লেট ভেঙে দিয়েছি, বই ছিঁড়ে ফেলেছি!"

"তোমার মা তোমাকে বকেনি?"

"না তো, কানে ধরেছিল।"

রাগে তনিমার মাথাটা কি টলে উঠল!

"তুমি নিজে নিজে খেতে পার, খোকন?"

"খোকন কে?"

"আমার ভুল হয়ে গেছে সোনা। তুমি টুকুন, মিষ্টি টুকুন।"

"তুমি আমার মা হবে, আমার সঙ্গে খেলবে?" তনিমার নিশ্বাস আটকে এল। "মা খেলে বুঝি?"

"হুঁ, বাবুয়ার সঙ্গে ওর মা খেলে। বাবুয়া বল ছুঁড়ে দেয়, ওর মা লুফতে পারে না।"

তনিমা রায় টের পায়নি কখন আয়া এসে পেছনে দাঁড়িয়েছে। তনিমাকে তাকাতে দেখে মুখে চুক্ চুক্ শব্দ করে বলল, "এই বাচ্চা

লেড়কাকে ওর মা একদম পেয়ার করে না, কাছে ভি ডাকে না। হামি না এলে তো ঐ লেড়কা রুদতে রুদতে খতম হয়ে যেত।"

"কেন, তোমার সাহেব কি করে ? ছেলেকে দেখে না! বাপ হয়ে তো প্রথম প্রথম কম আদেখলেপনা দেখায়নি !'

আয়া একটু বিস্মিত দৃষ্টিতে তনিমা রায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, "সাহেবের পেয়ারের কোনো মানে হয় না। দিন-রাতে একবার কি দুবার শুধু আয়ার কাছ থেকে শুনে নেয় লেড়কা কি খেয়েছে, ওর শরীর কেমন আছে। সাহেবের দোষ কি! হর রোজ তো বাড়িতে হল্লা লেগে আছে। এ আসছে, ও খাচ্ছে। বহুজী তো কেবল হল্লা নিয়ে মেতে আছে। কেউ না এল তো দুজনে গাড়ি করে বেড়াতে যায় বন্ধুর বাড়ি, সিনেমায়, আরও কত জায়গায়। কত রাতে বাড়ি ফেরে। কখনও খেয়ে আসে, কখনও এসে খায়।

"টুকুন কার কাছে শোয়, ঘুমোয় !"

'হামার কাছে এক আল্‌হাদা কামরায় খাটের ওপর বাচ্চা নিদ্‌ যায়, হামি ভুঁয়ে শু যাই। উর বিমারি উমারি সব কুছ্‌ তো হামাকে তল্লাসি কোরতে হয়।"

"বাড়িতে কোন বুড়ি মাইজি নেই ?"

"উ তো তিন সাল আগে মরে গেছে।"

"উনি মারা গেছেন !" তনিমা রায় রুদ্ধ নিশ্বাসে বলল।

"বুড়ি মাইজি জিন্দা থাকলে তো কোই বাত ছিল না। উও যো সাল মে চলা গিয়া, তো এক সাল বাদ সাহেব সাদি করেছে। পইলে বহুজী তো এ লেড়কাকে এক সাল দেখে মারা গেছে।"

"মারা গেছে! বাঃ বাঃ—" তনিমা হেসে ফেলল। "তোমার সাহেবের তো তাহলে খুব দুঃখ।"

আয়া এই কথাটা ঠিক বুঝতে না পেরে তাকিয়ে রইল।

"সাহেবের আর ভাইবোন নেই ?"

"এক বহিন আছে, লেকিন ওর তো সাদি হোয়ে গেছে, উ থাকে রাজস্থানে। উর আদমি ভি আচ্ছি কাম করে।

"বোন খুব ভালো আছে।"

"হাঁ জী, বহীন খুব আচ্ছা আছে।"

"বেঁচে থাক, সুখে থাক।" তনিমা রায় নিজের মনে বলে উঠল।

টুকুন ঘুমিয়ে পড়েছিল। পেটের যন্ত্রণাটা নিশ্চয়ই একেবারে সেরে গেছে। আজ সারাদিনে বার দুয়েক ছানার পাতলা জল ছাড়া আর কিছু খায়নি। এখন যত সুস্থ হচ্ছে, খিদে পাচ্ছে। শরীর নেতিয়ে পড়েছে। মিসেস ক্লার্কের একেবারে নিয়মে বাঁধা কাজ। ডাক্তারবাবু বলে গেছেন সন্ধ্যে আটটা পর্যন্ত দেখে তবেই একটু বার্লি স্যুপ আর পাঁউরুটির মাঝখানের ছোট্ট একটি পাতলা স্লাইস টোস্ট করে দিতে।

তনিমা রায়ের হাতের ওপর টুকুনের চুলভর্তি মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে। অসীম ক্লান্তিতে টুকুন ঘুমোচ্ছে। তনিমা রায়ের গোটা শরীরটা কাঁপছে। টুকুন, আমার সোনা, ঘুমোও। ঠিক আটটার সময় আমি তোমাকে খাইয়ে দেবো, আবার ঘুম পাড়িয়ে দেবো। সোনা, তোমার বাবাইটা এমন নিষ্ঠুর কেন? এমন বোকা কেন? কেন অন্য কারও কষ্ট বোঝে না, কারও মন বোঝে না।

তনিমা রায় কাঁদছে। দু' গাল বেয়ে জলের ধারা নেমেছে। আয়া বাথরুমে কা সব যেন ধুচ্ছে। তনিমা রায় তো আর বেশী সময় পাবে না কাঁদবার জন্য। তনিমা টুকুনের ঘুমন্ত মাথাটা আস্তে করে কম্বল চাপা দিল। শুকনো, নরম ঠোঁটের ওপর আলতোভাবে চুমু খেল। ওর মুখের ওপর কয়েক ফোঁটা জল পড়তে তনিমা আলতোভাবে মুছিয়ে দিল।

কখন কোথায় কি যে ঘটে গেল, এখনও তনিমা রায় সবটা একসঙ্গে ভাবতে পারে না। তবে মনে পড়ে নীলেন্দু মাঝে মাঝেই যেন অধৈর্য হয়ে তনিমাকে বলে উঠত—"তনু, তুমি সব সময় অমন মেজাজ খারাপ কোরো না। আজকাল দেখছি তুমি চাকর, ঝি মান

না, ন'মাসীমাকে তো মানই না। সকলের সামনেই খিঁচিয়ে উঠছো।" কথা থামবার আগেই তনিমা চেঁচিয়ে উঠত, "আমি যাতে চটে যাই, সেইরকম কথা তুমিই বা বলবে কেন।"

নীলেন্দু সত্যিই ক্ষুণ্ণ হত, ক্ষুণ্ণ হত বোন রত্নাও। বৌদি এমন করে কেন! এদিকে বাড়ির সবাইকার জন্য এত বিবেচনা, এত যত্ন-আত্তি, দাদার কিসে সুবিধে হবে, কি করে ভালো হবে, তার জন্য এত চিন্তা, এত পরিশ্রম—অথচ দাদার সামান্য কথাতেও কি সাংঘাতিক অধৈর্যের পরিচয় দেওয়া, চটে ওঠা! চীৎকার করবে, বকাবকি করবে, কাঁদবে, খাবে না, কথা বলবে না! অথচ এই বৌদি যখন শান্ত মনে থাকে তখন কি তার কোন তুলনা পাওয়া যায়।

নীলেন্দু কতদিন ঝাঁঝিয়ে-ওঠা তনিমার মাথাটা জোর করে নিজের বুকে চেপে ধরে বলেছে, "তনু, একটু শান্ত হও, মাথাটা ঠাণ্ডা করো, গোটা জিনিসটা একবার তলিয়ে বোঝ,—পাগলামি করো না।" মাঝে মাঝে তনিমা বলত—"আমাকে এত আদর করো কেন? আমাকে মাথায় তুলে নিয়ে আবার বকুনি দেওয়া হচ্ছে!"

নীলেন্দু নিজের ঠোঁট দিয়ে তনিমার কথা বন্ধ করে দিত, বলত, "তুমিই তোমার উপমা।"

"এই, ছেলে হয়ে ওরকম ন্যাকা ন্যাকা কথা বলবে না।" তনিমা জোর ধমক দিত।

নীলেন্দু হাসত, রত্না হাসত। সব কিছু শুনে আড়ালে হাসতেন ন'মাসীমা।

তনিমা রায় উঠে দাঁড়াল। মাথার মধ্যে জ্বলে যাচ্ছে। ঘাড়ের পেছনে একটা শিরা টন্‌টন্ করছে। আজকাল প্রায়ই ঐ জায়গাটা ব্যথা করে। মাঝে মাঝে ব্যথাটা অসহ্য হয়ে ওঠে। ডাক্তার দেখিয়ে, ওষুধ খেয়েও কিছু হয়নি, হবে না। ডাক্তারবাবু বলেছেন, চিন্তা-ভাবনা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে দিবারাত্রি ঠাণ্ডা মাথায় থাকতে, কোন কিছুতেই যেন উত্তেজিত না হন।

"ননসেন্স", তনিমা রায় ফ্যাসফেসে গলায় বলে উঠল, "চারদিকের সব কিছুই তো উত্তেজক। আমাকে ঠুকঠুক করে ঘা মেরে যাবে, আমাকে বুঝবে না, দেখবে না, আর আমি উত্তেজিত হব না, আমি নরম মাটি হয়ে থাকব।"

সেই ভয়ঙ্কর দিনটি তো ঐ কথা দিয়েই শুরু হয়েছিল!

"তুমি আমাকে বুঝতে চাও না" তনিমা রুখে উঠেছিল।

নীলেন্দুও সেদিন তার স্বভাবের একেবারে বিপরীত কঠিন স্বরে বলেছিল, "তোমাকে বোঝবার ক্ষমতা আমার নেই। একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে এত তুলকালাম করার কোন অর্থ আছে!"

"সামান্য ব্যাপার! তুমি বাড়ি এলে না, আমাকে কিছু জানালে না, সমস্ত রাত সবাই মিলে দুশ্চিন্তায় জেগে রইলাম, আর তুমি কি না এতটুকু সঙ্কোচ না করে সমানে বলে যাচ্ছ সামান্য ব্যাপার নিয়ে আমি তুলকালাম করছি!"

কিন্তু ব্যাপারটা কি সত্যিই এতদূর গড়াবার বিষয় ছিল! তনিমা রায় নিজেকে জিজ্ঞেস করল। বুকের ভেতরটা একেবারে শূন্য হয়ে যায় সেদিনকার কথা মনে পড়লে। অভিমান, অনুশোচনায় দেহমন নিথর হয়ে যায়। কেন নীলেন্দু সেদিন অন্য দিনের মত ওর মুখ চেপে ধরল না। কেন কথার ওপর কথা বলতে গেল! নীলেন্দু কি তনিমার স্বভাব জানে না!

তনিমা রায় চেয়ার টেনে বসে পড়ল। ঘাড়ের পেছনে সেই ব্যথাটা টন্‌টনিয়ে উঠছে।

এমন কী ঘটেছিল! অফিসে বন্ধু অনুতোষ নতুন বাড়ি করেছে কোন্নগরে। কবে থেকে সমানে নীলেন্দুকে বলছে একবার তার বাড়িখানা দেখে আসতে। সেই কোন্ ছেলেবেলায় স্কুলে একসঙ্গে পড়ে আসা বন্ধু। অনুতোষের চাইতে অনেক ওপরের গ্রেডে চাকরি করলেও নীলেন্দু কখনও অনুতোষকে দূরে সরিয়ে দেয়নি, মেলামেশা কমায়নি। তাই একজন ওপরওয়ালার মৃত্যুতে সেদিন যখন আচমকা অফিসটা ছুটি হয়ে গেল, অনুতোষ ছাড়ল না, ওর বাড়ি নিয়ে গেল।

ওর স্ত্রী, বৃদ্ধ বাবা, ছেলেমেয়েরা যেন হাতে স্বর্গ পেল। ওদের আন্তরিকতায় নীলেন্দু মুগ্ধ হল। প্রথমে চা জলখাবার, তারপর রাত্রির খাওয়া। দুটোই এলাহি ব্যাপার। রাতের খাওয়া না খাইয়ে কি ছেড়ে দেওয়া যায় নীলেন্দুর মতো বন্ধুকে, আবার ওপর শ্রেণীর অফিসারকে!

'বাড়ি ফিরতে হবে তো! আমি তো কিছু বলে আসিনি।'

প্রতিদিনের ডেলিপ্যাসেঞ্জারি করা অমুতোষ নীলেন্দুর কথা উড়িয়ে দিল, প্রচুর ট্রেন আছে। আর বৌদি না হয় একদিন ভাবলেনই খানিকটা। কি আছে তাতে।'

বন্ধুর রসিকতায় নীলেন্দু মুখে হেসেছিল। কিন্তু মনের মধ্যে শঙ্কার মেঘ জমে উঠল। নীলেন্দু সত্যিকারের ভয় পেল যখন দেখল খেতে দিল রাত ন'টার সময়। মস্ত বড়ো থালার ওপর একরাশ ফুলকো লুচি, আর তার চারদিকে থরে থরে খাদ্যবস্তু সাজান ন' দশটা বাটি। সব কিছুই মনে হচ্ছিল বিস্বাদ, বিশ্রী, নীলেন্দু স্পষ্ট চোখের সামনে দেখছিল তনু থমথমে মুখ নিয়ে দোতলার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আছে। যেখানে যেখানে সম্ভব অস্থির হয়ে ফোন করছে, একটুতে চীৎকার করে বাড়ি মাথায় করছে। রত্না আর ন'মাসীমা শুখনো, ভীত মুখে নীরবে ছটফট করছে।

"ট্রেন পাবো তো?" নীলেন্দুর শুখনো গলায় তখন অমুতোষের স্ত্রীর সনির্বন্ধ অনুরোধে মুখে তুলে নেওয়া ছানার পায়েস আটকে আটকে যাচ্ছে।

"ও নিয়ে তুই ভাবিস না, তোকে ট্রেনে তুলে দেবোই।" অমুতোষের কথায় কিন্তু নীলেন্দু এতটুকু সান্ত্বনা পেল না।

অমুতোষের বাড়ি থেকে নীলেন্দু যখন বেরিয়ে এল, তখন ন'টা বেজে গেছে। লাস্ট ট্রেন ছাড়তে আর মিনিট দশেক বাকি। অমুতোষ একটু লজ্জিত গলায় বলল, "এতটা রাত হবে বুঝতে পারিনি। আমি কিন্তু ভাই মিসেসকে বলেছিলুম একটু তাড়াতাড়ি করতে।"

"এত কিছু আয়োজন করলে আর কত তাড়াতাড়ি করা যায়।" নীলেন্দু মুখে হাসি ফুটিয়ে ভদ্রতা করলেও মন প্রাণ তখন রাগে কস-কস করছে। নিজের ওপরেই বেশী রাগ হচ্ছিল। অমুতোষ তো ওকে মোষবাঁধা দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখেনি! মনের মধ্যে সত্যিকারের ব্যস্ততা থাকলে নীলেন্দু বিকেলে চা-জলখাবারের পাট চুকতেই তো ট্রেন ধরে বাড়ি ফিরতে পারত!

স্টেশন কাছেই। কিন্তু সেখানে এসে একটা খবর শুনে নীলেন্দু চিন্তায় জমে গেল। প্ল্যাটফর্মে লোকের ভিড়। লাস্ট ট্রেন তো দূরের কথা, এর আগের ট্রেনটাও আসেনি। শ্রীরামপুরের কাছে একটা মালগাড়ির দুখানা বগি ডিরেইলড হয়েছে, সুতরাং গাড়ি চলাচল বন্ধ। রেললাইন পরিষ্কার হতে এখন কত দেরি, স্টেশন-মাস্টারমশাই বলতে পারছেন না। তিনি যে কথাগুলি বলছেন তার সারমর্ম হল, অ্যাকসিডেন্ট ইজ অ্যাকসিডেন্ট, এর ওপর কারও হাত নেই। শুধুমুদু তার ঘরে হামলা করে কোন লাভ নেই।

নীলেন্দুর বুকে তখন হাপরের শব্দ। "এখন কি হবে!" নীলেন্দু অমুতোষের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল, সে মুখও তখন চিন্তায় ভারী হয়ে উঠেছে।

"বাস নেই?" নীলেন্দুর এই প্রশ্নের জবাবে অমুতোষ বলল—"ও সব চিন্তা করে লাভ নেই। এখন প্রায় দশটা বাজে, লাস্ট বাস চলে গেছে। আজকের রাতটা আমার বাড়িতেই ঘুমুবি চল, আর যখন কোন উপায় নেই।"

নীলেন্দুর দু চোখের সামনে তখন ভারী কালো পর্দা নেমে এসেছে, আর সেই পর্দাটা সারারাত বিনিদ্র চোখের সামনে ঝুলে রইল। ভোরের আলো না ফুটতেই নীলেন্দু বেরিয়ে পড়েছিল। অমুতোষের স্ত্রী ধূমায়িত চা-এর কাপ এনেও নীলেন্দুকে পাঁচ মিনিট বসিয়ে রাখতে পারল না।

নীলেন্দু যখন বাড়ি ফিরে কলিং বেল টিপল, তখন দরজা খুলল রত্না। "দাদা, কি হ'য়েছিল তোমার? সারারাত আমরা"—রত্নার

চীৎকার নীলেন্দু দু হাত তুলে থামিয়ে দিয়ে বলল—"একটু অপেক্ষা কর্ তোরা, সব বলছি, আগে একটু চা দে।" ন'মাসীমা সামনে এসে দাঁড়ালেন। জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দিয়ে নীলেন্দুর মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝলেন এখন ওকে কোন প্রশ্ন করা মানে ওকে ঘা মারা। আগে ও মুখ-হাত ধুয়ে চা জলখাবার খেয়ে নিক, তারপর যার যত খুশী প্রশ্নের বান ডাকুক।

পর্দা সরিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে নীলেন্দু থমকে দাঁড়াল। বিছানার ওপর খোকন ঘুমোচ্ছে, আর তার পাশে পা গুটিয়ে পাথরের মতো বসে আছে তনু। সমস্ত রাত ধরে চিন্তা-ভাবনার যে নিদারুণ যন্ত্রণা সহ্য করেছে, তা কালো দাগ টেনে দিয়েছে তনুর দু চোখের নীচে, মুখের নীচে। মুখের চামড়া পর্যন্ত কি করে এক রাতে অমন শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে যায়, নীলেন্দু আগে তা জানত না।

"তনু" নীলেন্দু বুকের সব কাঁপুনি থামিয়ে সেদিন কি যেন বলতে গিয়েছিল। তবু নীলেন্দুকে কথা বলতে দেয়নি। একটা আঙুল উঁচিয়ে বলেছিল, "নির্লজ্জের মতো কোন মিথ্যে কৈফিয়ত দিতে এস না। তুমি বেরিয়ে যাও, আমার মুখের সামনে থেকে বেরিয়ে যাও।"

"তনু", "বৌদি"—একই সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠেছিল নীলেন্দু আর তার পেছনে এসে দাঁড়ানো রত্না।

"তুমি কি একবার জানতেও চাইবে না আমার কালকে কোথায় কিভাবে কেটেছে! কেন রাত্রিবেলা আমি বাড়ি ফিরতে পারিনি!"

"না, সমস্ত রাত ধরে তুমি ভেবেচিন্তে যে কাহিনী তৈরী করে রেখেছ, আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে সে গল্প শুনতে আমার গা বমি-বমি করছে।"

"কেন! আমি যা বলব তা বিশ্বাস করবে না কেন? তুমি না আমার স্ত্রী, আমার সন্তানের মা!"

"থামো, এটা থিয়েটারের মঞ্চ নয়।"

"তুমি কি বলতে চাইছ! তুমি কেন আমার কথা শুনবে না।"

"তুমি যদি মানুষ হ'তে তো শুনতাম।"

"তুমিই কি মানুষের মতো আচরণ করছ আমার সঙ্গে? আমার মুখের চেহারা দেখেও বুঝতে পারছ না কাল সারারাত কোথায় কিভাবে আমার কেটেছে! আজ এক কাপ চা পর্যন্ত মুখে দিইনি, ছুটে এসেছি!"

"ভারী মহত্ত্ব দেখিয়েছ। কাল গোটা রাত সবাইকে যমযন্ত্রণা দিয়ে সকালবেলা ছুটে এসেছ আষাঢ়ে গল্প শোনাবার জন্য।"

"তুমি বিশ্বাস কর তনু।"

"আমি তোমাকে বিশ্বাস করব না, করতে চাই না, তুমি যাও।"

"তোমাদের ছেড়ে কোথায় যাব?"

"নরকে যাও, জাহান্নমে যাও, কাল সারারাত যেখানে ছিলে।"

"তনু!"—আর্তনাদ করে উঠেছিল নীলেন্দু, "তুমি নিজেকে অত নীচু করো না।"

"ইতরের সঙ্গে কথা বললে নীচে নামতেই হয়—"

"কি বললে তুমি! আমি ইতর!"

তনিমা রায় এতটুকু থমকালো না। ঘাড় উঁচু করেই বলল, "কতবার তো বললাম তুমি ইতর।"

এর পর ঘটনা কতদূর গড়িয়েছিল! তনিমা রায় ছটফট করে উঠল। ডান হাত মুঠো করে বারকতক নিজের কপালে ঠুকল, কানের মধ্যে কেমন যেন ঝমঝম শব্দ হ'তে থাকল।

তনিমা রায় সেদিন লাজলজ্জার মাথা খেয়ে চীৎকার করে কেঁদে উঠেছিল। নীলেন্দু বলেছিল, "আমি ইতর, কিন্তু তুমি! তুমি ইতরের চাইতেও অধম।"

ঠিক ঐ সময় ঘুম ভেঙে গিয়ে খোকন জোরে কেঁদে উঠেছিল। নীলেন্দু ঝুঁকে ছেলেকে ধরতে যেতেই তনিমা রায় ঝাঁঝিয়ে উঠেছিল, "খবরদার, ওকে তুমি ছোঁবে না, ওকে তাহলে আমি গলা টিপে মেরে ফেলব—"

"ইতরামি করো না।" নীলেন্দু আবার ঝুঁকে ছেলেকে ধরতেই তনিমা রায় লাফিয়ে উঠে ছেলের গোটা মুখটা দু হাত দিয়ে জোরে চেপে ধরেছিল, আর তারপরেই ছিটকে পড়েছিল খাট থেকে। নীলেন্দুর ডান হাতের সমস্ত শক্তি আছড়ে পড়েছিল তনিমার পিঠের ওপর। "খুনে কোথাকার, হাত দিয়ে চেপে তুমি খোকনের নিশ্বাস আটকে তাকে মেরে ফেলতে চাইছ! তুমি এক্ষুনি, এক বস্ত্রে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে। এক্ষুনি!"

"তাই যাব!" তনিমা রায় হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে কথা বলছিল, আর তারপর ছেলেকে কোলে নিতে গিয়ে আবার একটা ধাক্কা খেল। নীলেন্দু কি সাংঘাতিক, কঠিন গলায় গর্জে উঠল, "তুমি আমার ছেলের গায়ে তোমার ঐ নোংরা হাত ঠেকাবে না। যে মা তার সন্তানকে মেরে ফেলতে চায়, সে কুৎসিত, সে বর্বর—সে এই বাড়ি থেকে চিরকালের মত চলে যাবে"

"আমি খোকনকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলাম!" তনিমা ককিয়ে বলে উঠল।

"তা নইলে কি আদর করবার জন্য ঐ দুধের বাচ্চাটার নাক-মুখ চেপে ধরেছিলে! তুমি চলে যাও, এক মুহূর্তও এখানে থাকবে না। তোমার নামে আমি ডিভোর্সের কেস ফাইল করব।"

ন'মাসীমা নীরবে ঘরের মধ্যে ঢুকে দুজনের মাঝখান থেকে খোকনকে কোলে তুলে নিলেন। তনিমা রায় চীৎকার করে বলে উঠল, "ওকে আমার কাছে দিন। ওর দুধ খাবার সময় হয়েছে।"

"আগে মায়ের মতো শান্ত হও, মায়ের মতো ধৈর্য ধর, তারপর ছেলেকে কোলে তুলে নেবে।"

রত্না খাটের বাজুর ওপর মাথা রেখে ফুলে ফুলে কাঁদছিল। তনিমা রায় রত্নার পিঠে হাত রেখে কি কথা বলতে চেয়েছিল। রত্না ঝাপ্‌টা মেরে উঠে দাঁড়াল, বৌদির হাতটা সরিয়ে দিল। ঝড়ের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দরজার কাছ থেকে একবার মুখ ফিরিয়ে বলল—"দাদা, চলে এস, ওখানে বেশীক্ষণ থেকো না।"

তনিমা রায় মাথাটা একেবারে পেছন দিকে হেলিয়ে বসল, মাথার মধ্যে কেমন যেন একটা শব্দ হচ্ছে। শূন্যতার শব্দ। মাথার ভেতরটা যে একেবারে খালি হয়ে গেছে। তার মধ্যে এখন আর কোনো বোধ নেই, অনুভূতি নেই।

কোনো মা, সুস্থ স্বাভাবিক মা, তার সন্তানকে মেরে ফেলতে পারে! তনিমা রায় সেদিন খোকনের মুখ চেপে ধরেছিল ঠিকই, কিন্তু জোরে কি মেরে ফেলবে বলে! আগের রাতে স্বামীর বিপদের আশঙ্কায় কি কান্না কেঁদেছিল তনিমা! কত দেবতার কাছে পুজো মানত করেছিল, কতবার বলেছিল, "ঈশ্বর, খোকনের বাবা যেন নিরাপদে বাড়ি ফিরে আসে।" নীলেন্দু কি জানে না তনুর ভালোবাসা কি গভীর, কত সীমাহীন? আর তোমরা একসঙ্গে কি না তনিমাকে আক্রমণ করলে! ছেলেকে কোল থেকে টেনে নিলে! তোমরা কি কেউ জানতে না তোমাদের তনুর ঐ প্রচণ্ড রাগের তলায় কি নরম, কোমল প্রাণটুকু ধুক্ ধুক্ করছে!

তনিমা রায় সেদিন সারাদিন বাড়ি রইল, কেউ একটা কথা বলল না, খেতে ডাকল না, কাছে এসে দাঁড়াল না। বিকেলবেলা তনিমা রায় তার ঝোলানো ব্যাগটা গুছিয়ে নিল। সবাইকে দেখিয়ে দেখিয়ে দু'চারখানা শাড়ি-ব্লাউজ ঢুকিয়ে নিল, কেউ একবার ও-বিষয়ে একটা জিজ্ঞাসাবাদ করল না। সন্ধ্যে হবার একটু আগে বেরুবার জন্য প্রস্তুত হয়ে তনিমা পাশের ঘরে নীলেন্দুর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। নীলেন্দু আজ সারাদিন ঐ ঘরের ডিভানে শুয়েছে, ওখানেই থেকেছে। অফিসে যায়নি, কোথাও বেরোয়নি।

"আমি তা হলে যাচ্ছি।"

"আমার অনুমতি নেবার দরকার নেই।" নীলেন্দু না তাকিয়েই বলল।

"খোকনকে দেবে না?"

"বাজে কথা বলো না। নিজে যাচ্ছ যাও, ওকে আমি কষ্ট পেতে দেব না।"

"তুমি এত নিষ্ঠুর!"

"তোমার মতো নয়। খোকনের গলা টিপতে যাইনি।"

"তুমি বিশ্বাস কর, আমি ওকে মেরে ফেলতে চাইনি।"

"ন্যাকামি করো না। আর এখানে দাঁড়িয়ে থেকে পাড়া-প্রতিবেশীর মুখ হাসিয়ো না। তোমার ঐ কুৎসিত রাগের খ্যাপামি আমি আর সহ্য করতে পারছি না। রত্না আর ন'মাসীমাও আর পেরে উঠছেন না।"

"আমি তো ন'মাসীমাকে কখনও অযত্ন, অশ্রদ্ধা করিনি। রত্না তো আমারও খুব স্নেহের।" তনুর মনের মধ্যে তখন বরফ গলে দু' চোখে জলের ধারা নেবেছিল।

নীলেন্দু কঠিন গলায় বলেছিল, "তোমার এই রাগ, এই চোখের জলের খেলায় আমি আর তাল দিতে পারব না। তোমার সম্পর্কে আমার স্বামী হিসেবে কর্তব্যেব এখানেই শেষ।"

সত্যিই, ঐখানেই সেদিন সব কিছুর শেষ হয়েছিল।

তারপর! তনিমা রায়ের চোখের সামনে সেই মোড়ো ইতিহাস এখনও প্রতি মুহূর্তে স্পষ্ট ছবি হয়ে ফুটে ওঠে। নিজের সংসার, নিজের বাড়ি থেকে বেরিয়ে দাদা-বৌদির কাছে যাওয়া। সেখানে কঠোর বকুনি। তনুর মতো এত লেখাপড়াজানা মেয়ের পক্ষে এই স্বামী সন্তান ত্যাগ করে আসা শুধু অন্যায় নয়, অমার্জনীয় ও অসামাজিক। সবোপরি বৌদি! অমন স্নেহময়ী বৌদির সেই কঠিন উক্তি। "তোর এই আচরণ তোর দাদার মেয়ের বেড়েওঠা জীবনেও দাগ কাটবে, ছায়া ফেলবে। মনে রাখিস আমার মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, তোর দাদাকে সামাজিকতা রক্ষা করে, সম্মান নিয়ে চলতে হবে।"

"আমাকে একটু সময় দাও বৌদি, আমি এখানে থাকতে আসিনি।" তনু নিশ্বাস চেপে বলেছিল।

বৌদি লজ্জা পেয়ে বলেছিল, "ও সব কথা বলছিস কেন, তোর দাদার বাড়ি।"

সপ্তাহখানেক পরে নীলেন্দু ফোন করেছিল। জানতে চেয়েছিল তনুর সঙ্গে একবার দেখা হবে কি না। খুব দরকার। আর এই শোনা মাত্রই, তনিমা রায়ের মনে আছে, ফোনেই সে খিঁচিয়ে উঠেছিল, "তোমার মতো ইতরের সঙ্গে আমি দেখা করি না"—এবং সঙ্গে সঙ্গে নীলেন্দু ফোন রেখে দিয়েছিল। অথচ নীলেন্দু স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি তনিমা ঐ কথাটা বলেই জিভ কেটেছিল, অনুশোচনায় মরে যাচ্ছিল। ঐ মুহূর্তে ওর মুখ দিয়ে ঠিক ঐ ধরনের উক্তি বেরোবার কথা ছিল না, তবু কেন এমন হল!

সমস্যাটা ওখানেই। ছোটবেলা থেকে তনিমা রায় ঐ সমস্যাতেই ভুগছে। নইলে ফোন বেজে উঠলেই যখন সে ছুটে ছুটে যাচ্ছিল নীলেন্দুর সাদর আহ্বান শুনবে ব'লে, তার গলা শুনবে ব'লে, আর সেই নীলেন্দু যখন ফোন করল, তনিমার সঙ্গে কথা বলতে গেল, দেখা করতে চাইল, তনিমা তখন কি করে অমন তিক্ত জবাব দিল! আর সেদিন! যে কিনা স্বামীর বিপদের আশঙ্কায় কাঠ হয়ে সমস্ত রাত জেগে বসে কাটাল, সে কি করে স্বামীকে দেখামাত্র ঐ রকম কুৎসিত ভাষায় আক্রমণ করল! নীলেন্দু আরো কয়েকবার ফোন করে কথা বলতে চেয়েছিল। বৌদিকে দিয়ে তনিমাকে অনুরোধ জানিয়েছিল একবার দেখা হয় কিনা, আর আশ্চর্য, প্রত্যেক বারই তনিমা রায় খিঁচিয়ে উঠেছে, বৌদিকে দিয়ে বলিয়েছে, আর কোনদিন যেন নীলেন্দু তনিমাকে বিরক্ত করার সাহস না দেখায়।

এরপর! এরপর জীবনের কয়েকটা পাতা খুব তাড়াতাড়ি উল্টে গেল। পর পর সাজানো ঘটনা।—ঘটনার অবসানে তনিমার চাকরি, এক-কামরার ফ্ল্যাটে স্বেচ্ছানির্বাসন, বর্তমানে একেবারে একা, একেবারে নিঃসঙ্গ।

টিনা জানে তনিমা রায় একেবারে একা। কেন, তাও জানে। জেনেছে মিসেস ক্লার্কের কাছ থেকে, যিনি সবকিছু শুনেছেন তাঁর হোটেলের শুভার্থী বোর্ডার মিস্টার সাধন গোস্বামীর কাছ

থেকে। সাধন গোস্বামী তনিমা রায়ের অফিস 'বস'। তিনি প্রত্যেক গ্রীষ্মে এই ঠাণ্ডা দেশে আসেন। হোটেল ডন-এ ওঠেন। এই বছর এসে বলে গিয়েছিলেন সেপ্টেম্বর মাসে তনিমা রায় এখানে আসবে, উঠবে হোটেল ডন-এ। মিসেস ক্লার্ক যেন একটু ওকে দেখেন শোনেন। এত ভালো মেয়েটা বড়ো দুঃখী। সাধন গোস্বামী আর তাঁর স্ত্রী, দুজনেরই খুব স্নেহের পাত্রী তনিমা রায়। টিনার সঙ্গে আলাপ হয়েছে তনিমা রায়ের। বিষণ্ণ, গম্ভীর চেহারা। কথাবার্তায় এত ভালো মহিলার ভাগ্যটা এমন কেন! স্বামী ভদ্রলোকটির দুর্ভাগ্য, নইলে এমন স্ত্রীকে কেউ ডিভোর্স করে?

টিনার চকিতে মনে পড়ল আজ বিকেলেই মিসেস ক্লার্কের একটি কথা। "বুঝলে টিনা, আমার কিন্তু একটা সন্দেহ হচ্ছে। আমি দেখেছি আমার সন্দেহ প্রায়ই ঠিক হয়।"

"কি সন্দেহ?"

"আমার মনে হচ্ছে ওপরের স্যুইটে যে ভদ্রলোক ছিলেন স্ত্রী-ছেলে নিয়ে, যাঁরা আজ চলে গেলেন, সেই ভদ্রলোকই বোধহয়..." ঠিক এমন সময় রায়বাহাদুর এসে খবর দিল, যে-জরুরী ফোনটা আসবার কথা ছিল, সেটা এসেছে। ট্রাঙ্ককল। দেরি করা চলে না, মিসেস ক্লার্ক সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলেন।

টিনার কানে ভেসে এলো রীতা ভার্মার মৃদু কণ্ঠের গান। 'হোয়েন আই লস্ট মাই হার্ট অ্যাট সানফ্রানসিস্‌কো।' টিনা আস্তে হেসে ফেলল। কি জানি কোথায় হৃৎপিণ্ড দান করেছিল মিস ভার্মা। গানটা প্রায়ই শোনা যায় মিস ভার্মার গলায়।

মনে আছে, বাবা কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল মেয়ের জন্য একজন গভর্নেস অভিভাবিকা চাই। তারই আবেদন গ্রাহ্য হবে যে নিখুঁত উচ্চারণে ইংরেজী বলতে কইতে পারে, নির্ভুল ইংরেজী লিখতে পারে, চেহারা ও ব্যবহারে যে হবে শ্রী ও রুচিসম্পন্না। এর ওপর টাইপ জানার দক্ষতা থাকলে অতিরিক্ত সম্মান-দক্ষিণা

দেওয়া হবে। বয়স যেন কিছুতেই ত্রিশের ওপর না যায়। টিনা জানে বিজ্ঞাপনে ঐ বয়সের উল্লেখ করা হয়েছিল মায়ের নির্দেশে।

"আবার বয়স বেঁধে দিচ্ছ কেন? আমার তো মনে হয় বছর চল্লিশ-বিয়াল্লিশ হলেই সেই মহিলা সবটুকু দায়িত্ব নিয়ে টিনার গভর্নেস-গার্ডিয়ান হতে পারতো।"

বাবার কথা শেষ হ'তে না হ'তে মা বাবার গায়ে প্রায় থাবা মেরে বলেছিল, "তোমার যদি ঐ বুদ্ধিটা থাকতো তা হ'লে তো এ সংসারে আমার কোন দরকারই ছিল না. গভর্নেসের তো টাইপ জানা না থাকলেও চলে। সব কিছু একটু তলিয়ে বুঝবে তো!" টিনার মনে হলো মা খুব উত্তেজিত। মায়ের অনুরোধেই দরখাস্তকারিণীদের ফটোশুদ্ধ আবেদন করবার নির্দেশ ছিল। অনেক আবেদন, অনেক ফটো এলো। কারণ মাসিক পারিশ্রমিকটা অত্যন্ত লোভনীয় ছিল। উপরন্তু খাওয়া-থাকার রাজসিক ব্যবস্থা। খাওয়ার ব্যাপারে বেড-টি থেকে আরম্ভ করে রাতে শুতে যাবার আগে গরম ওভালটিন পর্যন্ত সব দেওয়া হবে। ধোবি খরচ, চিকিৎসার খরচ নিজের পার্স থেকে দিতে হবে না। থাকার ব্যবস্থা টিনার ঘরের পাশে। সুন্দর সাজানো গোছানো বেডরুম, লাগোয়া আধুনিক বাথরুম, ঘরের সামনে ব্যালকনি। বেতন ছশো, সর্টহ্যাণ্ড-টাইপ জানলে আরও দুশো। ছাত্রীর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রতি বছরে বেতনবৃদ্ধি।

দরখাস্ত পড়েছিল তিনশ পাঁচখানা। বাছাই হয়ে সেই সংখ্যা হল ত্রিশ। ইন্টারভিউতে ডাকা হল বাইশজনকে। তার থেকে সর্বসম্মতভাবে বাছাই হয়েছিল মিস রীতা ভার্মা।

মা-বাবা টিনাকে ডেকে রীতা ভার্মার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। "তোমার গাইড এবং গার্ডিয়ান মিস রীতা ভার্মা। এখন থেকে ওঁর নির্দেশে তোমার দৈনিক রুটিন চলবে। আশা করি আমাদের মেয়ের ব্যবহারে কোনদিন উনি ক্ষুণ্ণ হবেন না।"

রীতা ভার্মাকে সিলেক্ট করার ব্যাপারে যিনি সবচাইতে বেশী

সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন তিনি মিস্টার রনজিত সিন্‌হা, বাবার বিজনেস পার্টনার, যাঁকে টিনা একেবারেই পছন্দ করে না। রীডা ভার্মার ইন্টারভিউ হয়ে যাবার পরে টিনার সামনেই রনজিত সিন্‌হা মন্তব্য করে ছলেন, "সি ইজ আ নাইস লেডী, কালচার্ড এণ্ড কমপিটেন্ট, অ্যাট দ্য সেম টাইম সি লুক্‌স্ সেক্‌সি।"

দু বছর আগেও 'সেক্‌সি' কথাটায় ঠিক কি বোঝায়, টিনা জানত না। টিনাকে 'সেক্‌সি' কথার অর্থ প্রথম বুঝিয়ে দিয়েছিল ওর চাইতে দু ক্লাস উঁচুতে পড়া ছাত্রী বিম্‌লা মিশ্র। টিফিন বা এমনি কোন অবসরের ফাঁকে টিনাকে প্রায়ই একেবারে কোলের কাছে টেনে বুকের কাছে সাপ্‌টে জড়িয়ে বিম্‌লা ফিসফিসিয়ে বলত, "আমার সুইটি, আমার হনি—তোমাকে আমি সমস্ত রাত স্বপ্নে দেখি, তোমার সঙ্গে কথা বলি, তোমাকে এমনি করে জড়িয়ে তোমার ঐ সুন্দর নরম শরীরটার ওপর শুয়ে পড়ি। তোমাকে আমি কতরকম প্রসেসে আদর করি। টিনা, তুমি একদিন আমাদের বাড়ি চল। আমার ঘরে গিয়ে আমাকে একদিন, শুধু একটি দিন এই স্বপ্নের খেলা খেলতে দাও, প্লীজ, মার্সি, টিনা, মার্সি।"

টিনার ঐ সব কথা শুনে গা বমি বমি করত। রাগে গা জ্বলে যেত যখন ক্লাসের মেয়েরা বিম্‌লার সঙ্গে ওর নাম জড়িয়ে বিশ্রী বিশ্রী সব ঠাট্টা করত।

একদিন টিনা মরিয়া হয়ে সব সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে রুখে দাঁড়িয়েছিল। বিম্‌লার শক্ত হাত দুটো থেকে নিজের শরীরটাকে ছাড়িয়ে নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলেছিল, "এবার আমি মাদার সুপিরিয়রকে তোমার এই ব্যবহারের কথা বলতে বাধ্য হব।"

"না, কিছুতেই তুমি এসব নিয়ে কোন কথা ওঁদের কানে তুলবে না। তুমি আমাকে কথা দাও।"

"তার আগে বল, কেন তুমি আমার সঙ্গে যখন তখন ওরকম কর।"

টিনার প্রশ্নে বিম্‌লা মিশ্র কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। বিম্‌লার ফর্সা ভারী গাল দুটো তখন লাল, পুরু ঠোঁট দুটো ফুলছিল।

"তোমাকে কেন ওরকম করি তুমি জান না? জান না এমন সেক্‌সি চেহারা নিয়ে মেয়েদের এইরকম জ্বালায় জ্বলতে হয়?"

"সেক্‌সি চেহারা কাকে বলে?" কথাটায় টিনার অবাক লাগছিল।

"কাকে বলে দেখবে? এই দেখ—দেখ এইরকম, এমনি সব কিছু দিয়ে তোমার এত সুন্দর শরীর, তুমি, তুমি হয়ে গড়ে উঠেছ। তাই তুমি সেক্‌সি।"

সেদিন, সেই মুহূর্তে টিনার সমস্ত শরীরে সীসে গলে আঠার মতো লেগে যাচ্ছিল। টিনা সজোরে ধাক্কা মেরেছিল বিমলা মিশ্রকে। বলেছিল, "তুমি খারাপ, তুমি অসভ্য।" টিনা ছুটে পালিয়ে আসতে আসতে শুনেছিল বিমলা মিশ্রের খিলখিলে হাসি আর শুনেছিল ওর ছুঁড়েমারা কথা।

"যাও খুকু, ফিডিং বোতল মুখে দিয়ে শুয়ে পড়। আমি ছেলে হ'লে এতদিনে তোমাকে দিয়ে আমার ছেলের মুখে ফিডার ধরাতাম।"

এর পর থেকেই 'সেক্‌সি' কথাটার ওপর টিনার কেমন একটা যেন গা-গুলনো রাগ। আর ঐ শব্দটাই কিনা ইন্দ্রজিত সিনহা ব্যবহার করল টিনার গুডনেস সম্বন্ধে! আর আশ্চর্য, টিনার মা-বাবাও ঐ কথাটায় সোৎসাহে সমর্থন জানাল!

"মনে হচ্ছে, আমাদের কাজেকর্মে ঐ মহিলাটি ভালোই সাহায্য করতে পারবে।" বাবা সেদিনই একটু নীচু গলায় মাকে বলেছিল।

মা একটু হেসে উত্তর দিয়েছিল—"ঘুড়ি তো ছাড়ছি, দেখা যাক কতদূর যেতে পারি।"

"তুমি লক্ষ্মী পাশে থাকলে অনেকদূর যাবো, ন্যায়-অন্যায় মানবো না।"

"ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন টেনো না, তা হলে আর মনের সঙ্গে বোঝা-পড়া করতে পারবে না।" ইদানীং মা-বাবার এই ধরনের কথাবার্তা শুনে টিনার মনে হয় রহস্য সিরিজের কোনো বইএর পাতা।

মিস রীতা জার্মা কেমন সুন্দরী! সুন্দরী কি? টিনা কতবার

মনে মনে ভেবেছে আর খুঁটিয়ে দেখেছে তার গার্ডিয়ান-গভর্নেস রীতা ভার্মাকে। দৈর্ঘ্যে পাঁচ ফুটের ওপর বড় জোর ইঞ্চি দুয়েক। রং ফর্সা নয়, তবে কালোও নয়। ঠিক ঠিক বলতে গেলে বলা চলে রীতা ভার্মার গায়ের রং ব্রাউন, হাত-মুখের চামড়া তেলতেলে, টান টান, চক্‌চকে। রীতা ভার্মার মুখের আকার গোল, তবে চিবুকের দিকটা একটু লম্বাটে, গাল দুটো তুলতুলে, ঠোঁট দুটি পাতলা নয়, বরঞ্চ একটু ভারী, বিশেষ করে নীচের ঠোঁট যার মাঝখানটা একটু ঝুলে এসেছে। চিবুকের মাঝখানে একটা গভীর গালের মতন খাঁজকাটা থাকায় গোটা মুখখানায় কেমন একটু আদুরে আহ্লাদে ভাব এসেছে। মাথায় ঢেউ খেলানো ঈষৎ কটা চুলের ঘন রাশ, তার নীচে ছোট্ট কপাল। চোখ দুটি বড়ো, ভাসা ভাসা। কোন কিছুতে বিস্ময় বা কৌতূহল জাগলে সে চোখ আরও বড়ো হয়। চোখের ওপরের পাতা ভারী হওয়ায় সব সময় চোখ দুটিকে মনে হয় সদ্য ঘুম থেকে ওঠা। চোখের ওপরে ভ্রূ দুটি সরু, কালো, বঙ্কিম। মুখের লাবণ্য যে ভ্রূ-সৌন্দর্যের ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল এ বিষয়ে রীতা ভার্মা অত্যন্ত সচেতন। তীক্ষ্ণ নাসিকার অধিকারিণী রীতা ভার্মা নন, তবে যা আছে তা সুন্দর মানানসই। টিনা এবং সবাই মুগ্ধ হয় রীতা ভার্মা যখন হাসে। উজ্জ্বল দু সারি নিখুঁত দাঁত। দু পাশে ছোট্ট দুটি গজদন্ত হাসিটিকে মাদকতায় ভরিয়ে দেয়। হাসির সঙ্গে দু গালে দুটি অনুমান টোল পড়ে, রীতা ভার্মাকে তখন মনে হয় মায়াবী, লাবণ্যে ঢলঢল। রীতা ভার্মার ফিগার-স্ট্যাটিসটিক্‌স বিউটি কনটেস্টে মার খাবে, কারণ ঈষৎ পৃথুল। তাই বলে দেহ সৌষ্ঠবের কোন ঘাটতি আছে! মাঝে মাঝে টিনার মনে হয় মিস্ ভার্মার গোটা শরীরটা যেন ফোম রাবারে তৈরী। যত ঘনিষ্ঠভাবেই নিষ্পেষণ করা না কেন তার তল বা শেষ খুঁজে পাবে না। এবং রীতা ভার্মা তার এই দেহ-সম্পদ সম্পর্কে সচেতন, অতিমাত্রায় সচেতন। তাই তার সাজ-পোশাকের মধ্যেও কি সূক্ষ্ম রুচি আর সৌন্দর্যবোধ। টিনা দেখে মিস্ ভার্মার শাড়ি আর ব্লাউজের ভেতর দিয়ে তার শরীরের প্রতিটি

কার্ভেচার ফুটে উঠে কি নিদারুণ রহস্যের সৃষ্টি করে, বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিতদের মনে কি উন্মাদনা জাগিয়ে তোলে। রীতা ভার্মার শাড়ি পরার স্টাইল, বুক ও কাঁধের ওপর আলতোভাবে শাড়ির আঁচল ফেলার কায়দা আজকাল অনেকেই হুবহু অনুকরণ করছে, এমনকি মা পর্যন্ত।

মিস্ ভার্মার কাছে বসে যখন টিনা লেখাপড়া করে, তখন মাঝে মাঝেই ঝলক দিয়ে অদ্ভুত একটা সুবাস বেরিয়ে আসে রীতা ভার্মার ব্লাউজের ভেতর থেকে। কতবার জানতে ইচ্ছে করেছে টিনার, রীতা ভার্মা কি সেন্ট ব্যবহার করে, কোথায় পাওয়া যায়।

রীতা ভার্মা নিজের হাতের আঙুলের সৌন্দর্য সম্বন্ধে সদাই সচেতন। ম্যানিকিওর করা আঙুল প্রতিদিন শাড়ির রঙে রং মিলিয়ে নেইলপালিশে রঞ্জিত হয়। সকালে লাগিয়ে রাত্রিবেলা শোবার আগে রিমুভার দিয়ে আঙুলের নখ একেবারে রঙহীন করে দেওয়া হয়।

শুতে যাবার আগে রীতা ভার্মার অনেক কাজ। বাথটবে বসে ঈষদুষ্ণ জলে সাবানের ফেনায় মুখ হাত, পা, গা ধুয়ে মোটা টার্কিশ তোয়ালে শরীরে চেপে চেপে সব জল শুষিয়ে ফেলবে। এরপর মাখনের মত ক্রীম মাখবে, মাসাজ করবে মুখে, ঘাড়ে, গলায় আর দু হাতে। তারপর রাত্রিবাস পরে কলিং বেল টিপে জানিয়ে দেবে নীচে বাবুর্চিখানায়। এক কাপ গরম বোর্নভিটা। সঙ্গে সঙ্গে সন্ত্রস্ত বেয়ারা রাজেন ট্রের ওপর বোর্নভিটার কাপ বসিয়ে চলে আসবে। ঘরে ঢোকার আগে দরজায় ঠুক্ ঠুক্ শব্দ করবে। রীতা ভার্মা মিঠে মিহি গলায় বলবে, 'ইয়েস', রাজেন ঢুকবে। ঠিক পনেরো মিনিট পরে রাজেনই এসে আবার কাপ ডিশ নিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে চলে যাবে।

টিনাকে রীতা ভার্মা বার বার বলেছে ঠিক এমনটি করতে পারলে তবেই দেহলাবণ্য বজায় থাকে। রাত্রিবেলা স্বাচ্ছন্দ্যে ভরা ঘুম শরীর প্রাণকে অতল বিশ্রামে জুড়িয়ে দেবে। ফলে বয়স কমবে, আয়ু

বাড়বে। "টিনা, ক্রীম ম্যাসাজ করার নামে তুমি তোমার মুখখানাকে অমন করে ডিসটার্ব করো না। মনে রেখো তাহলে সেও প্রতিশোধ নেবে, তোমার চামড়া অসময়ে কুঁচকে দেবে, বয়সের রেখায় কুৎসিত হবে।"

রীতা ভার্মা প্রথম এসে আরও বলত—"টিনা, কথা বলার সময় কখনই বেশী চেঁচিয়ে বলবে না, তাড়াহুড়ো করবে না। মনে রেখ কথা বলা একটা আর্ট। আরেকটা কথা, লক্ষ্য রাখবে তোমার পা ফেলার দিকে, হাত নাড়বার ভঙ্গীতে।"

"আমি সব ভুলে যাব—" টিনা রীতা ভার্মার আসবার আঠার দিন পরেই বলে ফেলেছিল। বলতে গিয়ে ওর কান্না পাচ্ছিল। ছোটবেলার দিনগুলির কথা ভেবে, মা-বাবার কথা ভেবে ওর ভীষণ কান্না পাচ্ছিল। আজকাল মা-বাবার সঙ্গে বিশেষ দেখা হয় না। দেখা হলেও প্রায় সময়েই কথা হয় না। আর এমনটি হয়েছে রীতা ভার্মা আসবার পর থেকে।

রীতা ভার্মা টিনার কথা শুনে খুব মিহি গলায়, টানা ভ্রূ সামান্য কুঁচকে গালে একটু টোল ফেলে হেসে বলেছিল—"দুষ্টু মেয়ে, আমি বলছি না তোমাকে একদিনেই সব ম্যানেজ করতে। তুমি সিস্টেমটাকে মেনে নাও। কিছুদিন পরেই দেখবে এ সব কিছুতে তুমি অ্যাকাসটম্‌ড্ হয়ে গেছ, তুমি এলিট সমাজে চলাফেরার অধিকার পেয়েছ।"

রীতা ভার্মাকে নকল অনেকেই করে। তার মধ্যে একজন হল মা। কি সাংঘাতিক স্পিডে মা পাল্‌টে যাচ্ছে। বিশেষ করে কথার ভঙ্গীতে আর সাজ-পোশাকে। মা বয়স আর না বাড়ানোর কত চেষ্টা করছে। সেরিয়াল ফুড প্রায় বন্ধ। কার্বো হাইড্রেট সম্বন্ধে দারুণ সজাগ। কবে কখন কি খাওয়া উচিত সব কিছুর একটা মেনু করে নিয়েছে মা।

আর বাবা! বাবা হেভী ব্রেকফাস্ট নিয়ে সকাল আটটায়

বেরিয়ে যায়, আসে বেলা দুটোয়। তখন চান করে ভাত খায়। বাবার অবশ্য খাওয়াতে কোন নিষেধ নেই, শুধু চিনি সম্পর্কে একটু দ্বিধা আছে। কোন ডাক্তারের নির্দেশ নেই। বাবা নিজের থেকেই সতর্ক হয়েছে।

টিনা মাঝে মাঝেই ফিরে যায় কয়েক বছর আগেকার জীবনে। সকালবেলা মায় আদরেভরা গলার ডাকে ঘুম ভেঙে যাওয়া, বাবার নিজের হাতে মেয়েকে পেস্টমাখানো ছোট্ট টুথ ব্রাসটি এগিয়ে দেওয়া, ছোট্ট ফ্ল্যাটের দালানের এক কোণে চারখানা চেয়ারের টেবিলে একসঙ্গে বসে মা-বাবার চা, আর টিনার দুধ আর বিস্কুট খাওয়া। এরপর মা কুট্‌নো কুটতে বসত। দু হাতে মাত্র কয়েকগাছা চুড়িতে শব্দ উঠত ঝুনঝুন্ ঠুংঠুং। টিনা কান পেতে এই শব্দ শুনত। কি যে ভালো লাগত বলত, "মা, তুমি অনেক, অনেকগুলি চুড়ি পর, তা হলে আরও জোরে শব্দ হবে।"

বাবা একদিন এই কথা শুনতে পেয়ে টিনাকে আদর করে বলেছিল, "যা শুরু করেছি, তা যদি একবার তুলে ধরতে পারি, তা হলে তোর মাকে আমি সোনা দিয়ে মুড়িয়ে দেব।"

বাবার সেদিনকার ইচ্ছে কি সাংঘাতিক ভয়াবহভাবে ফলে গেছে! বড় জোর ছ বছর লেগেছিল বাবা যেটা শুরু করেছিল সেটা তুলে ধরতে।

"তোরা তো এখন বড়লোক, তোদের এখন অনেক টাকা। তোদের এখন অন্য সমাজ। তোর এতে মন খারাপ করলে চলবে কেন মা!" সন্তুমাসী একদিন টিনাকে খাওয়াতে বসিয়ে চুপি চুপি কথাগুলি বলেছিল।

"মা কেন আর আমাকে খেতে দেয় না, মা কেন কুট্‌নো কোটে না, সন্ধ্যাবেলায় শাঁখ বাজায় না!" টিনার ফুলেওঠা গাল দুটি টিপে দিয়ে সন্তুমাসী উত্তর দিয়েছিল, "আমার টিয়াপাখি, যখনকার যা। দেখছ না মাকে এখন বাইরের কাজে কত ব্যস্ত থাকতে হয়। বাবার

সঙ্গে প্রায় বিকেলে বেরিয়ে সেই কোন্ রাত্রিতে ফিরতে হয়। তাই তো মায়ের অনেকগুলি কাজ এখন আমার হাতে এসে গেছে। তোমাকে দেখাশুনো করা, কুটনো কোটা, শাঁখে ফুঁ দেওয়া। বাড়ির অন্য কাজের ভার নিয়েছে রাজেন, হারু আর মাখনের মা। আর রান্নাঘরের সব দায়িত্ব নিয়েছে বাবুর্চি আবদুল আর ঠাকুর চরণ।"

"কেন ?" টিনা অসহিষ্ণু গলায় প্রশ্ন না করে পারেনি।

সন্তমাসী হেসে বলেছিল—"কেন আবার কি টিয়ারাণী, দেখছ না এখন তোমাদের বড়লোকের পাড়ায় নিজেদের কত বড় বাড়ি। তিনখানা গাড়ি, কত লোকজন, কত আসা যাওয়া। তুমি তো এখন দিন দিন বড় হচ্ছ সোনা, এখন তো তোমাকে সব বুঝতে হবে।"

"আমার ভাল লাগে না।"

ক্ষুব্ধ টিনা একদিন লক্ষ্য করল দোতলার যে অংশটিতে তার বাবা মা থাকে, তার ওপরে তেতলায় যে বিরাট হল-ঘরটি পড়ে ছিল, সেটাকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। চার দেয়ালে চার রকম রং। দক্ষিণের দেয়ালটা অবশ্য একেবারে সাদা রইল, চক্চকে সাদা। তিনদিকের দেয়ালে আর্টিস্টকে দিয়ে কত কি ডেকরেসন হল। ঘরের মেঝেতে গাঢ় রঙের পুরু কার্পেট পাতা হল। এতবড় ঘরের তুলনায় জানলার সংখ্যা যেন টিনার কাছে একটু কম মনে হল, তাও আবার তাকে কী লম্বা পর্দা দিয়ে ঢাকা হল। ঘরের মধ্যে খান ছয়েক চৌকো টেবিল পাতা হল। তার প্রত্যেকটিকে ঘিরে চারখানা করে চেয়ার, তার ওপর মোটা ডানলোপিলোর কুশন পাতা। পর্দা, কুশন, কার্পেট, সব কিছুর রং উজ্জ্বল মেরুন, গায়ে সোনালী ডিজাইন, চোখ ধাঁধিয়ে ওঠে।

টিনা নিজের কানে শুনেছিল বাবা মাকে বলছে, তেতলায় যাবার সিঁড়ির বড় দরজায় যেন অতি অবশ্য তালা দেওয়া থাকে। সব সময় সকলের সামনে সব কিছু খুলে রাখা ঠিক নয়। বাবা এরপর মাকে একটু নীচু গলায় বলেছিল—"দেখ, আমি তোমাকে বলেছিলাম কি না এইসব নিজের বাড়িতে না হওয়াই ভালো। মেয়ে তো

হবেই, তাছাড়া পাড়ার পাঁচজন শুভার্থীরও তো কমতি নেই।"

মা বাধা দিয়ে বলেছিল, "অন্য জায়গায় হলে তোমার লাভের গুড় পিঁপড়েয় খেয়ে যেত। তুমি তো খেয়াল করোনি মিসেস সিন্‌হা কেমন লক্‌লক্ করে জিভ্ ঝুলিয়ে বলেছিলেন এই ব্যবস্থাটি সম্পূর্ণ-ভাবে তার বাড়িতে করবার জন্য।"

এই পর্যন্ত কথাবার্তা বলেই মা-বাবার খেয়াল হয়েছিল টিনা ঘরের মধ্যে রয়েছে আর তখনই তারা দুজনেই টিনাকে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য অস্বাভাবিক তাড়া লাগিয়েছিল। টিনার স্পষ্ট মনে হয়েছিল মা-বাবা যেন একটু ভয় পেয়েছিল।

টিনার সেদিন থেকে ঐ বিরাট অতি সুন্দর ঘরটার ওপর রাগ, প্রচণ্ড রাগ। কারণ তারপরেই অত্যন্ত তাড়াহুড়ো করে টিনার জন্য গার্ডিয়ান-টিউটর খোঁজার ব্যস্ততা দেখা গেল মা-বাবার মধ্যে, খোঁজ পাওয়া গেল রীতা ভার্মার। আর তখন থেকেই টিনা পুরোপুরি রীতা ভার্মার নির্দেশে চলতে ফিরতে বাধ্য হল। টিনার চোখে জল এল যখন দেখল রীতা ভার্মার আসবার কয়েকদিন পর থেকে সন্তমাসীর সঙ্গে যোগাযোগটা প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। সন্তমাসী টিনাকে একদিন আমসত্ত্ব দিয়েছিল বলে রীতা ভার্মার সে কি বকুনি টিনাকে আর সন্তমাসীকে! ভাগিস রীতা ভার্মার ইংরেজী ও কষ্টে উচ্চারিত বাংলা ভাষার প্রায় কিছুই বোঝেনি সন্তমাসী। তাকে যে বলা হয়েছিল গেঁয়ো, নোংরা, অশিক্ষিত আর সেকেলে, সন্তমাসী এর একটাও বুঝতে পারেনি। তবে এইটুকু বুঝেছিল ভবিষ্যতে যখন তখন টিনার সঙ্গে কথা বলা, তার হাতে টুকিটাকি জিনিস দেওয়া এবার থেকে একেবারে বারণ।

তখন থেকে টিনার খাওয়াদাওয়া, বেড়াতে যাওয়া, কি পোশাকে কোন্ জুতো পরবে, কি পারফিউম ব্যবহার করবে, হেয়ার-ডু কেমন হবে সব কিছুই রীতা ভার্মার অনুমোদনসাপেক্ষ। তবে এটা ঠিক যে, রীতা ভার্মার শিক্ষকতায় টিনার লেখাপড়ার দিকটা সত্যিই উন্নতি

হয়েছে। উন্নতি হয়েছে টিনার আউট নলেজ ও দৈনন্দিন জীবনের নিয়মকানুনে। ফাইনাল পরীক্ষায় নিশ্চয়ই টিনা ভালো করবে এবং তার মূলেও এই রীতা ভার্মার নির্দেশ।

রীতা ভার্মা মানুষটিকে এমনিতে খারাপ লাগে না। তবে হাবে ভাবে যেন একটু বেশী আর্টিফিসিয়াল, বেশী ফরমাল। কি দরকার ছিল একটু আমসত্ত্ব নিয়ে সন্তুমাসীকে ওরকম বকবার।

রীতা ভার্মা বড় কড়া টেবিল ম্যানারস্ নিয়ে। প্রথম মাসখানেক টিনার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল রীতা ভার্মার 'ডু' আর 'ডোণ্ট' শুনতে শুনতে।

"চেয়ার টেনে খাবার টেবিলে বসতে গিয়ে টেবিলটাকে নাড়িয়ে দিও না।"

"স্যুপ খাওয়ার চামচে দিয়েই ভাত মাখছ কেন, টেব্‌ল স্পুনটা তো দেওয়াই আছে।"

"ফ্রাই ভাঙতে গিয়ে ডিশের বুকে ছুরির টানের শব্দ করাটা অসভ্যতা।"

"না, না টিনা, খাবার সময় দাঁতে-জিভে অমন শব্দ করবে না। মনে রাখবে মানুষ সভ্য প্রাণী।"

টিনার মাথা দপ্‌দপ্ করত। এখন আর করে না। সয়ে গেছে। শুধু একদিন খাওয়া হয়ে গেলেও বসে ছিল।

"কি হল টিনা, উঠে পড়।" রীতা ভার্মার নির্দেশ সত্ত্বেও টিনা বসে রইল, বলল—"আমি আরেকটা জিনিস খাব, সকাল থেকে সন্তু-মাসীকে বলে রেখেছি।"

"সে আবার কি! কি খাবে!" রীতা ভার্মার বাঁকা ভ্রূ আরও বেঁকে গেল। সন্তুমাসী ঠিক সেই মুহূর্তে ভয়ে ভয়ে খাবার টেবিলের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। হাতে একটা ছোট পাথরের বাটি।

"কি আছে ওতে" রীতা ভার্মার উত্তেজনা দেখে সন্তুমাসী বাটিটা ঠক্ করে টিনার কাছে রেখেই পালিয়ে যাচ্ছিল। পালাতে পারল না। দরজার কাছে মা এসে দাঁড়াল।

"ঐ বাটিতে কী সন্তুদি ?" মা বাটি তুলে দেখেই এক গাল হেসে বলল, "শুধু বুঝি টিনা খাবে ! আমার নেই !"

"আছে, এনে দিচ্ছি"—সন্তুমাসী ছুটে চলে গেল।

রীতা ভার্মা এবার শিউরে উঠল—"'ক বল্লে টিনা, ওটা কাঁচা তেঁতুলের চাটনি ! কেন তোমার সামনেই তো চিলি, টোমাটো, মেয়োনিজ সসের তিনটি শিশি বসানো আছে, ওতে তোমার হলো না !"

বড় বাঁচানো বাঁচিয়ে দিল মা। মা খুশীর হাসি হেসে বললো, "ওহ্, মিস ভার্মা, ঐ সব শিশি বন্ধ সস সন্তুদির হাতে তৈরী কাঁচা তেঁতুলের চাটনির কাছে দাঁড়াতে পারে না—"

টিনা সেদিন মনে মনে হেসে লুটোপুটি খেয়েছিল আর তারিয়ে তারিয়ে চেটে চেটে খেয়ে ছিল কাঁচা তেঁতুলের চাট্নি। টাকরায় জিভ্ ঠেকিয়ে বার কতক শব্দ করেছিল। মা যেন ঈশ্বরের দূত হয়ে এই ঘরে এসেছিল। মায়ের অমন তারিফ করা দেখে রীতা ভার্মার মুখ দিয়ে আর একটাও শব্দ বেরোয়নি। শুধু সন্ধ্যেবেলায় টিনাকে বলেছিল, "টিনা, তোমাকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে গড়ে তোলার দায়িত্ব আমার। তাই তোমার ভয়সের সফট্‌নেস্‌টা যাতে বজায় থাকে, সেইদিকে আমাকেই লক্ষ্য রাখতে হবে।"

তেতলার ঐ ঘরটা টিনার কাছে কেমন রহস্যময় লাগতো। অবশ্য এখন আর নয়। এখন সব দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। এতটা পরিষ্কার না হলেই টিনা খুশি হতো। টিনাকে বলা হলো ঘরখানা নাকি বাবার অফিস ঘর। তারপর শুনলো কনসালটেশন রুম। অর্থাৎ ব্যবসায়ী মহলের বড় বড় লোকদের ওখানে আপ্যায়ন করে তাঁদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলাপ আলোচনা হবে। এসব রীতা ভার্মার কথা। টিনা বলেছিল, ঘরটাকে কিন্তু অফিসরুম বলে মনে হয় না।

"তোমার কি মনে হয় ?" রীতা ভার্মা পালটা প্রশ্ন করেছিল।

"আমার মনে হয় ওটা যেন একটা রেস্টুরেন্ট। কেমন টেবিল চেয়ার পাতা, পেছনে আবার…"

কথা শেষ হতে পারলো না, রীতা ভার্মা থাবা মারলেন। দারুণ গম্ভীর হয়ে বলে উঠলেন, "যা তোমার দরকারে লাগবে না, বা অন্যের ব্যাপার, সে বিষয়ে অকারণ কৌতূহল দেখানোটা কিন্তু গেঁয়োমির পর্যায়ে পড়ে।"

বাপ্‌স, টিনাকে বকবার সময় রীতা ভার্মার ইংরেজী ভাষা যেন টগবগ করে ফোটে।

কিন্তু এই বকুনিতে কি কোন কাজ হয়েছিল! এ ঘরটা সম্বন্ধে টিনার কৌতূহলে এতটুকু ভাটা পড়েছিল! টিনা লক্ষ্য করেছে যেদিন ওপরের ঐ কনসালটেশন রুমে বাবার লোকজনদের আসবার কথা থাকে, সেদিন সকাল থেকেই বাড়িতে ব্যস্ততার ঝড় নেমে আসে, কিন্তু একেবারে নীরব, নিঃস্তব্ধ ঝড়। সকাল থেকেই বাবুর্চি আবদুল তার রান্নাঘরে গ্যাসের উনুনে কত রকমারি রান্না করে, গোটা বাড়িটা গন্ধে ভরে যায়। চরণ ঠাকুর শুধু ডাল ভাত রান্না করে গালে হাত দিয়ে চুপ করে বসে থাকে আর অনবরত বিড়ি টেনে টেনে কাশতে থাকে। ফিকফিক করে হাসে…। "ওপরে আজ দুশো মজা……—" চরণ ঠাকুরকে টিনা একদিন এই কথা বলতে শুনেছিল। আবদুল ধমকে উঠেছিল, বলেছিল টিনাদিদির সামনে কথাবার্তাগুলো একটু সমঝে বলতে।

টিনা জানে বাবুর্চি আবদুল আর ড্রাইভার হরি সিং বাবার একান্ত বিশ্বস্ত জন। অন্য ড্রাইভার নগেনের মনে এইজন্য রীতিমতো ক্ষোভ আছে। প্রায়ই দুঃখ জানায় চরণ ঠাকুরের কাছে, "বুঝলে চরণ, আমাদের কপালে কেবল কালি। তুমি মাখবে রান্নাঘরের ঝুলকালি, আর আমি মাখবো গাড়ির তেলকালি। আর ওদিকে দেখ আবদুল আর হরিবাবুকে, কেমন মজা মারছে, ওপরে কেমন ছবি দেখছে।" নগেন ড্রাইভার চোখ মটকে, জিভের ডগা বার করে কেমন একটা ঘিনঘিনে ভঙ্গী করে। টিনা অন্তত চার পাঁচবার

নগেন ড্রাইভারের এই খেদোক্তি শুনেছে, এই ভঙ্গী দেখেছে। টিনার মনের কৌতূহল উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। কিসের হুশো মজা আর ছবি দেখা!

টিনার কানে এসব কথা কিছুই যেতো না যদি না টিনা ঐ সব দিনেই রীতা ভার্মার হাত থেকে মুক্তি পেতো এবং টিনা তাদের বাড়ির মধ্যে একমাত্র আনন্দ নিকেতন নীচে সন্তমাসীর ঘরে না যেতো। রান্নাঘরের প্রায় লাগোয়া সন্তমাসীর ছোট্ট গুছনো ঘরটিতে গিয়ে তক্তপোশের ওপর বসে শুয়ে ইচ্ছে মতো পা দোলানো, মাথা ঝাঁকানো, স্বাধীনভাবে কথা বলার মতো আনন্দ টিনা আর কিছুতে পায় না। সেই মুহূর্তে এখানে কোন রীতা ভার্মা এসে আঙুল উঁচিয়ে বলে না, না টিনা, অতখানি মাথা ঝাঁকালে, পা দোলালে যেকোন মেয়েকেই বিশ্রী দেখায়···। রীতা ভার্মার এই নিয়মের চাপে যে টিনার সর্ব অঙ্গ, সমস্ত মনপ্রাণ কম্পাউণ্ড ফ্র্যাকচার্ হয়ে গেছে তার খবর কে রাখে! তবে রীতা ভার্মার কাছে টিনা খুব কৃতজ্ঞ। এইতো সেদিনও টিচাররা প্রায় সবাই এক নাগাড়ে টিনার হাতের লেখার প্রশংসা করেছেন, পরীক্ষার খাতায় তার উত্তরের তারিফ করেছেন।

কোলকাতায় টিনার গোটা সপ্তাহটাই তো একেবারে নিয়মের ছকে বেঁধে দিয়েছিল রীতা ভার্মা। সন্ধ্যে থেকে রাত ন'টা পর্যন্তও তাই। তবে ঐ সন্ধ্যাকালীন রুটিনেই মাঝে মাঝে ছন্দ পতন হোত যেদিন রীতা ভার্মা টিনাকে বেশ কিছু টাস্ক দিয়ে বেরিয়ে যেতো, বা একতলায় বাবার নিজস্ব অফিস রুমে বসে টাইপ করতো, তার সঙ্গে বাবার কাজের কথাবার্তা হতো। বাবার আরও দুজন স্টেনো টাইপিস্ট আছে, তা সত্বেও মাঝে মাঝে রীতা ভার্মার ডাক পড়তো।

টিনা পুরোপুরি মুক্তির স্বাদ পেতো যেদিন ওপরের ঐ ঘর খোলা হোত। সকাল থেকেই বাড়িটাকে ঘিরে ধরতো নীরব ব্যস্ততা। বাবুর্চিখানায় আবদুল সকাল থেকে কাজে ডুবে থাকতো। হরিসিং গাড়ি নিয়ে কোথায় যেতো। বাড়ি ফিরে গাড়ির পেছনের ডালা

খুলে নানা আকারের কাঠের বাক্স বার করতো, নিয়ে যেতো সোজা ওপরের ঘরে।

সেদিন কোন বেলাতেই মিস ভার্মার সঙ্গে দেখা হতো না, আর হোলেও ঐ মার মতোই, মিস্ ভার্মাও টিনাকে চিনতে চাইতো না। অবশ্য টিনার ভালই লাগতো, তবে মনের মধ্যে কেমন যেন একটা অস্বস্তিকর কৌতূহল জেগে উঠতো। ওপরের কনসালটেশন রুমে এমন নিত্য নতুন লোক কোত্থেকে আসে! আর এত মেয়ে পুরুষ! এরা সকলেই বাবার পার্টনার! বাবার ব্যবসায়ে পরামর্শ দেয়! সবচাইতে অদ্ভুত লাগতো যেদিন টিনা নিজেকে একটু আড়াল করে ওর ঘরের লাগোয়া ব্যালকনি থেকে দেখতো দামী গাড়ি থেকে কি সব স্বাস্থ্যবতী মাড়োয়ারী মহিলা নামছে তাদের স্বাস্থ্যবান স্বামীর সঙ্গে। মহিলাদের নাকে, কানে, মণিবন্ধে হীরের দ্যুতি। সারামুখে নির্বুদ্ধিতার লাবণ্য। এ সব মহিলাকে, ইলেকট্রিক শক্ দিলেও তো গলা থেকে একটা উঃ শব্দ বেরুবে না। তবে কোন্ গুণে বাবার ব্যবসা সংক্রান্ত আলোচনায় 'অংশ নিতে আসে!

মিস্টার সিন্‌হা নিজে একতলার সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে থেকে এইসব অতিথি অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা জানায়। এক পাশে টেবিলের ওপর রেখে দেওয়া মস্তবড় ট্রে থেকে টক্‌টকে লাল গোলাপের একটি করে বোকে তাদের প্রত্যেকের হাতে তুলে দেয় আর এমন গলে গলে কথা বলে ঐ সব অতিথিদের সঙ্গে, মনে হয় তারাই ঈশ্বর, তাদের ছাড়া মিস্টার সিন্‌হার এক মুহূর্তও চলবে না।

কিন্তু কেন? কিসের এই পার্টি, এত মেয়ে পুরুষ! কেন এই সব দিনে মা বাবাকে মনে হয় অন্য গ্রহের মানুষ! মিস ভার্মা এত সাজে কেন! কেন মা দূরে, অনেক দা^ চলে যাচ্ছে?

"কেন, সন্তমাসী! তুমি জানো না!" টিনা অধৈর্য হয়ে সন্তমাসীকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরেছিল।

"আমি খবর রাখি না টিয়াপাখি, আমি কিছু জানি না।" টিনা লক্ষ্য করেছিল সন্তমাসী রক্তশূন্য মুখে কথাগুলি বলেছিল।

"তুমি জানো না, অথচ আর সবাই জানে! চরণ, নগেন ওরকম ভাবে কথা বলে কেন? ওরা কি জানে?"

"কি জানি টিয়াপাখি! তুমিই বা কেন ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে সবকিছু জানতে চেষ্টা করো। তুমি লেখাপড়া করছো, গান শিখছো, আঁকতে যাচ্ছ, কত বড় ক্লাবে খেলতে যাচ্ছ, তোমার তো অনেক কাজ টিয়া সোনা, তোমার কি এদিকে মন দেওয়া চলে!"

"ঠিক আছে, সন্তমাসী, আমি এবার থেকে তিন বাঁদরের মতো শুনবো না কিছু, দেখবো না কিছু, বলবো না কিছু…" অভিমানে টিনার মুখ থমথমিয়ে উঠলো।

অন্যান্যবারের মতো এবার কিন্তু সন্তমাসী টিনাকে আদর করলো না, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, "নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকো টিয়া, বড়দের কাজে কৌতূহল দেখিও না, আর বাবুর্চি-বেয়ারাদের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্নের জবাব চেও না…।" খানিকক্ষণ পরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সন্তমাসী টিনার মাথায় হাত রেখে বলেছিল, "টিয়াপাখি, আমি তোমাকে সুখী দেখতে চাই, আমি তোমার ভাল চাই…"

"তা হলে আমাকে মসলামাখানো একটা তেঁতুল ছড়া দাও, তুমি দেবে বলেছিলে…" টিনার কথায় সন্তমাসী জোরে হেসে ফেলে গাল টিপে বলেছিল, "আমার লক্ষ্মী মা, আমার সোনামণি…"

অবশেষে টিনার জীবনে সেই দিনটি এল। সপ্তাহ তিনেক বাদ দিয়ে এক শনিবারে। টিনা ঘুমিয়ে পড়েছিল। সকাল থেকেই বাড়িতে সেই ব্যস্ততা ছিল। সন্ধ্যের পর তেতলার সেই ঘরে বেশ কিছু অতিথিদের আগমন হয়েছিল। যথারীতি অভ্যর্থনা, খাওয়া-দাওয়া সবকিছুই হয়েছিল। বাইরের থেকে বাড়ির ভেতরকার এই

আয়োজনের প্রায় কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। শুধু বাড়ির সামনে গাড়ির কিছু ভিড় ছিল, আর কিছু না।

টিনা হঠাৎই জেগে গেল এবং জেগেই বুঝলো ওপরের ঘরে এখনও কারা যেন আছে। টিনা বিছানা ছেড়ে জানলার কাছে এসে রাস্তার দিকে উঁকি মেরে দেখলো রাস্তা-ঘাট প্রায় নির্জন। ঘড়ি দেখলো বারোটা বেজে গেছে।

এখন, এত রাতেও বাবা কনসালটেশন রুমে ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে কথা বলছে! নিশ্চয়ই মা-ও ওখানে আছে। আর আছে রীতা ভার্মা…।

…টিনা যে কখন নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে অদম্য কৌতূহল নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে তেতলার ঘরে দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল স্পষ্ট মনে পড়ে না। দরজার সামনে মোটা মেরুন রঙের পর্দা ঝুলছিল, টিনা সেই পর্দার ফাঁকে দাঁড়িয়ে দেখেছিল ঘরের ভেতরটা। প্রায় অন্ধকার ঘর। অতি সামান্য পাওয়ারের একটা নীলচে আলো শুধু জ্বলছিল। ঘরের মধ্যে জনা বিশেক ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলা বসেছিল। কয়েকজনকে টিনা চেনে। সেদিন বসেছিল মিস্টার শিশিররতন ধর, আই. পি. এস, ডেপুটি কমিশনার অব পুলিশ আর তাঁর স্ত্রী মিসেস নীলা ধর। ওরা দুজন এ বাড়ির নিয়মিত সম্মানিত অতিথি। আরেকজনকে চোখে পড়েছিল। মিস্টার ডি. জেঠমলানি, তার পাশে একটি অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সুন্দরী মেয়ে, জেঠমলানির অত্যন্ত আদরের স্টেনো। ডানদিকে একধারে বসে ছিলেন অধ্যাপক ডক্টর শান্তশীল বোস। খ্যাতিমান চিন্তাশীল, পণ্ডিত লেখক, দারুণ ভাল বক্তৃতা করেন। আর সকলের মাঝখানে বসে আছেন পাড়ার ডাকসাইটে ধনী অথচ অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ, সজ্জন বৃদ্ধ নীলমণি চক্রবর্তী। নিজে বড়লোক, ছেলেরা বড়লোক। দান-ধ্যানে নীলমণি চক্রবর্তীর কত নাম। পুজো-আচ্চা আর সাধুসঙ্গে তাঁর দিন কাটে। দুর্গাপুজোর সময় নীলমণি চক্রবর্তীর চণ্ডীপাঠ সবাইকে মুগ্ধ করে। আরও যে কয়েকজোড়া মেয়ে-পুরুষ বসেছিল, মনে হলো অবাঙালী, টিনা তাদের চেনে না।

টিনা লক্ষ্য করলো সবাই ঘরের দক্ষিণে মাখনের মতো সাদা দেয়ালটার দিকে তাকিয়ে বসে আছে, মনে হচ্ছে ওখানে এক্ষুনি বুঝি কিছু দেখানো হবে।

টিনা দেখলো মা আর রীতা ভার্মা দাঁড়িয়ে আছে ঘরের পেছনের অংশে আধখানা চাঁদের মতো যে বার-কাউন্টারটা আছে সেখানে। বার-কাউন্টারটি আগাগোড়া সোনালি আঁকিকাটা সানমাইকায় ঢাকা। পেছনে কাঁচে ঢাকা বিরাট আলমারি, তাতে খোপ কাটা, টিনা জানে ওতে আছে নানারকমের বিদেশী চেহারার বোতল। আর আছে বিরাট বড় একটা ফ্রিজ।

টিনা এরকম বার-কাউন্টার প্রথম দেখেছিল চিন্টুদের বাড়ি। তার ঘর আলাদা, বড়দের কোন উৎসব-অনুষ্ঠানে খাওয়া-দাওয়ার পর অতিথি অভ্যাগতরা ঐ ঘরে বসে গল্পগুজব করে আর কাউন্টারের সামনে উঁচু গদিমোড়া গোল মাথার চেয়ারে বসে ছোট ওয়াইন গ্লাসে যে যার খুশী মতো তরল পানীয় ঢেলে নিয়ে খায় আর জড়িয়ে-আসা গলায় কথা বলে। টিনার স্পষ্ট মনে আছে প্রথমদিন ঐ বার-কাউন্টার দেখে বাড়ি এসে মা বলেছিল, "যাই বল, টাকা থাকলেই কি সব কিছুকে অগ্রাহ্য করতে হবে···?" বাবা বিস্মিত হয়ে বলেছিল, "কেন বল তো, কাকে বলছো?"

"কি আশ্চর্য, তুমিও তা হলে একটু টাকার মুখ দেখেছো বলে ওদের মতো হয়ে যাচ্ছ···!" মা মুখ ভার করে উত্তর দিয়েছিল। বাবা ব্যাপারটা জানতে চাইলে মা ক্ষুব্ধ গলায় বলেছিল, "কোনো ভদ্র পরিবারে ছেলেমেয়ের সংসারে অমন খোলাখুলি বার-কাউন্টার না রাখলেই নয়!"

"তুমি যতটা মনে করছো, ততটা খারাপ কিন্তু ওদের ছেলে-মেয়েদের পক্ষে নয়। দেখলে না ছেলেমেয়েরা কত সহজভাবে চলছে ফিরছে।"

"তেমনি অতি সহজেই মদ-খাওয়া ধরবে। আমি টিনাকে নিয়ে গিয়ে কী অপ্রস্তুতে পড়লাম বল তো···!"

দরজায় ফাঁকে দাঁড়িয়ে টিনার হঠাৎ মাত্র বছর চারেক আগে শোনা মায়ের সেই মন্তব্যটি মনে পড়ে গেল। মাত্র ক' বছরের মধ্যে এমন কি হলো যে আজ মা বার-কাউন্টারের নিকটতম স্থানে এসে দাঁড়িয়েছে।

টিনা তাকিয়ে দেখলো রীতা ভার্মা আর মার দিকে। কী অদ্ভুত মাদকতায় ভরে আছে রীতা ভার্মার গোটা শরীরটা! এর আগে তো কই এমন সাজে রীতা ভার্মাকে কখনও দেখা যায় নি। একটা টমাটো কালারের সিফন শাড়ি কত পাতলা হ'তে পারে! আর তারই সঙ্গে ম্যাচ করা একফালি ব্লাউজ। পিঠের দিকে শুধু একটা 'বো' বাঁধা। শাড়ির সঙ্গে রং মিলিয়ে মিস ভার্মার ঠোঁট লাল, নখ লাল। টিনার মনে হলো চোখ দুটিও লাল এবং দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলছে। হাতে ছোট একটি গ্লাসে টুকটুকে লাল রঙের পানীয়।

সেদিন মা-ও সেজেছিল। তবে একেবারে অন্যরকম। মা সেদিন পরেছিল চওড়া জরিপাড়ের একখানা টাঙ্গাইল শাড়ি। মার দুই হাতে গোছা ভর্তি চুড়ি, গলায় চওড়া পাটির সোনার হার। কপালে বেশ বড় একটি সিঁদুর টিপ। কি ভাল লাগছিল মাকে দেখতে। সব চাইতে ভাল লাগলো যখন টিনা দেখলো মার হাতে কোন গ্লাস নেই। মা অন্য কারও গ্লাসের সঙ্গে নিজের গ্লাস ঠেকিয়ে কারও স্বাস্থ্য পান করছে না। সত্যি মা মা-ই রয়েছে। এই কথা ভাবতে টিনার কি ভাল লেগেছিল। টিনার মনে হয়েছিল এই সাজে মা নিজেকে সকলের কাছ থেকে একেবারে আলাদা করে ফেলেছে। মাকে সেদিন মহীয়সী মহিলা বলে মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল এই মুহূর্তে যদি মার সামনে একটা মাইক্রোফোন দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায়, মা এক্ষুনি ইন্দিরা গান্ধীর মতো বক্তৃতা দিতে থাকবে।

হঠাৎ ঘরের আলোটা নিভে গেল। আগন্তুক ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলাদের মধ্যে এতক্ষণ ধরে যে মৃদু গুঞ্জন চলছিল তা একেবারে থেমে গেল। আচমকা এরকম কেন হলো, এই ভেবে যখন টিনা এর কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছিলো না, ঠিক তক্ষুনি টিনার চোখ পড়লো

সামনের চকচকে সাদা দেয়ালটির দিকে। তীব্র আলো ফেলা হলো আর তারপরেই ফুটে উঠলো ছবি।

এ কী ছবি! ওরা কি করছে! কেন স্ত্রী-পুরুষে ওরকম কুৎসিত ভাবে নগ্ন শরীরটাকে মেলে ধরেছে। ওদের লজ্জা নেই, নেই এতটুকু ভদ্রতা বোধ!

··· এক বিরাট ঝাঁকুনিতে টিনা চমকে উঠলো। লোহার সাঁড়াশীর মতো টিনার ডান হাতখানা ধরে ঝাঁকাচ্ছে রীতা ভার্মা। বিস্ময় আর ক্রোধে রীতা ভার্মার মুখটা তখন কী হিংস্র, কী সাংঘাতিক দেখাচ্ছিল। মিস ভার্মা এতটা রাগ করছে কেন! টিনা অবাক হলো যখন দেখলো এক মুহূর্ত পরেই রীতা ভার্মা একেবারে নিস্তেজ, জমাট বাঁধা ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞেস করলো, "তুমি এখানে কেন! কার হুকুমে এসেচো? মুখে এতটুকু শব্দ না করে পা টিপে টিপে নিচে চলে যাও। তোমার তো এখন বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ার কথা।"

রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠেছিল টিনার। কে এই রীতা ভার্মা। টিনার শিক্ষয়িত্রী-অভিভাবিকা বই আর কিছু তো নয়! টিনা নিশ্চয়ই তার বাবার টাকায় তৈরী এই বাড়ির যেকোন অংশে ঘুরে বেড়াতে পারে। রীতা ভার্মা কোন্ অধিকারে বাড়ির মালিকের মেয়েকে বলে—কার হুকুমে এসেছো!

তবে মনের মধ্যে যতই রাগ ফেনিয়ে উঠুক, টিনা মুখে বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ করতে পারেনি। রীতা ভার্মার মুখের দিকে তাকাতে পারেনি। নিঃশব্দে নীচে নেমে এসেছিল।

একটা আলোর ঝলক হোটেল ডন-এর গেটে আর টিনার ঘরের সামনের জানলার ধাক্কা মেরে মিলিয়ে গেল। টিনা ডেকচেয়ার থেকে উঠে পর্দা সরানো জানলার গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়ালো।

সামনের রাস্তার উলটোদিকে সোরাবজী হাউস। একটা বড়

বাংলো। এতক্ষণ সামনের বড় দরজা বন্ধ ছিল। তার দু পাশের বন্ধ কাঁচের জানলা ভেদ করে আবছা আলো বাইরে ছায়া ফেলেছিল। রাস্তার বাঁ দিকে খানতিনেক গাড়ি দাঁড়িয়ে। এদের মধ্যে একখানা মস্ত বড় গাড়ি। দেখলেই বোঝা যায় বিদেশের গাড়ি। টিনা দেখেছে গাড়িটা এসেছে পরশুদিন বিকেলবেলায়। গাড়ি থেকে নেমে এসেছিল দীর্ঘকায় দুটি সাহেব।

মিসেস ক্লার্ক তখন একজন বেয়ারাকে নিয়ে টিনার ঘরে এসেছিলেন একটা কেটে-যাওয়া ইলেকট্রিক বাল্‌ব পাল্‌টে নতুন বাল্‌ব লাগিয়ে দেওয়ার জন্য। সাহেব দুটিকে দেখে বলে উঠলেন, "ওহ্, ওদের সিজ্‌ন্ শুরু হলো "

"কিসের সিজ্‌ন্ আন্টি!"

"শ্রীগুরু সিজ্‌ন্..." টিনাকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে মিসেস ক্লার্ক একটু হেসে বললেন, "এ গল্প তুমি শুনবে হিমানী বসুর কাছে। নিশ্চয়ই শুনবে, খুব ইন্টারেস্টিং।"

জানলায় দাঁড়িয়ে টিনা দেখলো সোরাবজী হাউসের বড় দরজাটি খুলে দিয়ে সামনের আলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। এতক্ষণ ওখানে গান, গল্প, আলোচনা, খাওয়া-দাওয়া, খানিকটা হৈ হল্লা হয়েছে। এখন অতিথিরা একে একে বিদায় নিচ্ছেন। ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন হিমানী বসু। রোগা, ছিপছিপে ফর্সা রঙের মহিলা। বয়স চল্লিশের একটু বোধ হয় ওপরে। দিনপাঁচেক হলো হিমানী বসু তাঁর দুই বন্ধুকে নিয়ে এখানে এসেছেন, হোটেল ডন-এ উঠেছেন। প্রায় বছরেই আসেন, আর ঠিক এই সময়টিতেই আসেন।

হিমানী বসু যে টিনার একেবারে অপরিচিত তা নয়। দক্ষিণ কোলকাতায় একটি জনবহুল পাড়ায়, চৌমাথার ওপর হিমানী বসুর 'রুচি' দাঁড়িয়ে আছে তার অত্যন্ত ঝলমলে, অভিজাত চেহারা নিয়ে। হিমানী বসুর শাড়ির দোকান 'রুচি'তে পা পড়েনি এমন অভিজাত ঘর কোলকাতায় কমই আছে। কারণ একেবারে নবতম ডিজাইনের

তাঁতের আর বাতিকের শাড়ি পাওয়া যায় ঐ 'রুচি'তে। মাছির মতো মেয়েদের ভিড়ে মাঝে মাঝে সত্যিই খেই হারিয়ে ফেলেন হিমানী বসু এবং তাঁর সঙ্গী সাহায্যকারিণী মেয়ে কর্মচারীরা। তেমন তেমন বুদ্ধি আর যোগ্যতা থাকলে মেয়েরাও যে ব্যবসার ক্ষেত্রে নেমে বেশ সাবলীলভাবে চলাফেরা করতে পারে, তার মস্তবড় প্রমাণ এই হিমানী বসু। হিমানী বসু আরও পরিচিত তাঁর 'নিপুণিকা'র জন্য। এই দোকানটিও দক্ষিণ কোলকাতায়, 'রুচি'র কাছাকাছি। এখানে নানা স্টাইলে কবরী বন্ধন হয়, আর নানা ফ্যাশানে শাড়ি অলঙ্কারে মেয়েদের সাজিয়ে দেওয়া হয়, কনে সাজানো তো আছেই। বিয়ের এক একটা মরশুমে হিমানী বসুর রাত দিনের বিশ্রাম বলতে কিছু থাকে না। কনেকে হয় গাড়ি করে সরাসরি দোকানে নিয়ে আসা হয়, আবার কখনো বা তেমন অবস্থাপন্ন অভিজাতের ঘরে এখান থেকে সুদক্ষ মহিলাকে পাঠানো হয়। অবশ্যই তার জন্য মোটা ফি আছে। 'নিপুণিকা' যে অনেক রকম জানে। টিপিক্যাল বাঙালী কনে সাজতে চাও, সাজবে। আর যদি হতে চাও রাজস্থানী, মহারাষ্ট্রী বা পুরোপুরি দক্ষিণী তাতেও কোন অসুবিধে নেই। খোঁপার স্টাইলও তেমনি মানানসই হবে। অজন্তা স্টাইল থেকে শুরু করে, বৌদ্ধ যুগ, তুর্কী যুগ, মোগল যুগ মায় উনবিংশ শতাব্দীতে পুরনো কোলকাতার সাহেব-বিবিদের চুল বাঁধার স্টাইল পর্যন্ত এখানে পাবে, আর একেবারে আধুনিক, আজকের দিনের স্টাইলের তো কোন কথাই ওঠে না। সে তো হাতের পাঁচ। সকালে যদি তুমি সৌদামিনী, তো বিকেলে নীতু সিং। আজ যদি মারীয়া আঁতোয়ানেত অথবা নর্মা সিয়ারার, তো কালকে রোমান হলিডের অড্রে হেপবার্ন। কোন ভাবনা নেই। চলে এসো, ইচ্ছে মতো সেজে খুশিমনে চলে যাও।

'নিপুণিকা'র সঙ্গে আরও দুখানা ঘর আছে। একটি হেয়ার ডাই করার, আরেকটি ভ্রু প্লাক করার। হিমানী বসু রোজ ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন, মেয়েদের, মহিলাদের ইচ্ছা পূরণের জন্য আরও

কিছু নতুন নতুন ঢেউ আসুক, তবে না তার দোকান লাভের জোয়ারে ভাসবে। এখন শুধু আরেকটি দোকান করার প্রবল ইচ্ছা, সেটি হল একটি 'ফিগারেট' খোলা। হিমানী বসু আজকাল একটা জিনিস খুব ভাল করেই লক্ষ্য করেছেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন বড়লোকের বাড়ির মহিলাদের যতো বয়স বাড়ে, তাঁরা তত ছোট হতে চান এবং ছোট হতে চান নিজের মেদবহুল শরীরের চর্বি কমিয়ে। ওঁরা কেমন যেন ভেবে নেন শরীর যদি একবার রোগা হয়ে যায়, তাহলেই বিগত-যৌবনা আবার যুবতী হবে, খিল্‌খিল্ করে হাসবে, রঙিন প্রজাপতির মতো উড়ে বেড়িয়ে সকলের দৃষ্টি মুগ্ধ করবে। মেদ কমানোর জন্য প্রায়-না-খেয়ে থাকার প্রেসক্রিপসন চলবে না। মাখন, মিষ্টি, কার্বোহাইড্রেট সব চলবে, না হলে বেঁচে থাকার কি মানে! অতএব 'ফিগারেট' চাই, সেখানে কয়েকটা সিটিং দিলেই তো শোনা যায় একমাসে দু'মন ওজন বাইশ কেজি হয়ে যায়! অন্ততঃ বিজ্ঞাপনের ভাষা তো তাই!

'ফিগারেট' করতে গেলে যে প্রচুর যন্ত্রপাতি চাই এবং সেগুলি কিনে ঘর সাজাতে প্রচুর রেস্ত চাই। অবশ্য হিমানী বসুর এ ইচ্ছে অদূর ভবিষ্যতে পুরণ হবেই। বড়লোক-গিন্নীর মোটা চর্বি দিয়ে তৈরী থলথলে ভুঁড়িতে তিনি রোলার চালাবেনই।

মেয়েদের কাগজে একবার ফলাও করে ছবি দিয়ে হিমানী বসুর জীবনী, তাঁর কাজের বিষয়, তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কার্যসূচী সব রম্য প্রবন্ধাকারে বেরিয়েছিল। রেডিওতে মহিলা মহলে হিমানী বসু একজন নিয়মিত কথিকা। সামনের মাসে প্রোগ্রাম আছে টেলিভিশনে।

"কৃষ্ণপ্রাণ কে হিমানীদি!" টিনার কৌতূহল ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছিল।

প্রথম আলাপের পর টিনা হিমানী মাসী বলে ডেকেছিল। হিমানী বসু হেসে গড়িয়ে বলেছিলেন, "ও সব মাসী পিসী ডাকলে আমার কেমন সুড়সুড়ি লাগে। তুমি বাপু আমাকে হিমানীদিই ডেকো।"

"স্বামী কৃষ্ণপ্রাণ সম্বন্ধে একটু বলুন···।" "বলবো, নিশ্চয়ই বলবো · " হিমানী বসু স্থির হ'য়ে বসলেন, হাতজোড় করে কপালে ঠেকালেন।

"দেবতা কিছুদিনের জন্য মানুষের জন্ম নিয়ে মর্ত্যে নেমে আসেন অসার, অজ্ঞান পাপী পুরুষ নারীকে উদ্ধার করতে, তাদের মুক্তি দিতে। নইলে আমেরিকার ডগলাস স্মিথ স্বামী কৃষ্ণপ্রাণ হয়ে ভারতবর্ষে আসবেন কেন। কত জন্মের সুকৃতির ফলে তবেই না আমি তাঁর দেখা পেয়েছি। তাঁর দেওয়া মন্ত্র বুকের মধ্যে রেখে জপ করছি···।"

"ছোটবেলা থেকে অসাধারণ প্রতিভা নিয়ে ডগলাস স্মিথ বড় হয়ে উঠেছিলেন। স্কুল, কলেজের শিক্ষকরা বিস্মিত হতেন ছাত্রটির গভীর চিন্তাশীল কথাবার্তায়, তার দৃষ্টিভঙ্গীতে। আর ছাত্রাবস্থা থেকেই দেখা গেল ডগলাস তাঁর মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন, পারিপার্শ্বিকতা সম্বন্ধে কী নিদারুণ উদাসীন, কী আত্মসমাহিত, কী নির্জনতাপ্রিয়! যখন কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির দর্শন বিভাগের অধ্যাপক, তখনই তিনি দেশ ছাড়লেন। মনে কেন শান্তি আসে না? এই শান্তির খোঁজে নানা জায়গা ঘুরে অবশেষে এলেন ভারতবর্ষে। হৃষীকেশ, লছমন ঝোলা পার হয়ে দেবপ্রয়াগে অলকানন্দার ধারে একজন সন্ন্যাসীর দেখা পেলেন, তাঁর সঙ্গে চলে গেলেন হিমালয়ের গভীরে, কিন্তু কিছুতেই পেলেন না জীবনের সেই আকাঙ্ক্ষিত স্নিগ্ধতা।

"ডগলাস স্মিথ হিমালয় ছেড়ে এবার নেমে এলেন সমতলভূমিতে। সবশেষে হাজির হলেন নবদ্বীপের মায়াপুরে। সেখানে তিনি দীক্ষা নিলেন পরম ধার্মিক বৈষ্ণব পণ্ডিত বল্লভদাস বাবাজীর কাছে। বল্লভদাস বাবাজী ডগলাস স্মিথকে আশীর্বাদ করলেন নতুন নামে নামান্তরিত করে। ডগলাস স্মিথের নাম হলো কৃষ্ণপ্রাণ। তিনি রাধাভাবে কৃষ্ণসাধনায় জন্য আবার চলে এলেন হিমালয়ের এক নির্জন নিঃসঙ্গ জায়গায়। এখান থেকে বাইশ মাইল দূরে, আ

হাজার দেড়েক ফুট উঁচুতে, পাইন ইউকেলিপটাস গাছে ঘেরা অতি মনোরম জায়গা। হিমালয়ের ওপরে অতটা সমতল জায়গা ঈশ্বরের আশীর্বাদ না থাকলে পাওয়া যায় না। কৃষ্ণপ্রাণ সেখানে ছোট্ট একটু আশ্রম গড়ে রাধাভাবে কৃষ্ণ সাধনা করলেন টানা পাঁচ বছর। তারপরেই মেতে উঠলেন এক অসাধারণ কর্মযজ্ঞে। কয়েক বছরের মধ্যে তিনি পাহাড়ের গায়ে সোনা ফলালেন। সরল পাহাড়ী গ্রাম্য মানুষগুলির মনে আলো জ্বালালেন। বল্লভদাস বাবাজীর কাছ থেকে শেখা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাবিদ্যা কাজে লাগালেন। ঘরে ঘরে রোগ সারালেন, অর্থাৎ প্রমাণ করলেন মানুষ যদি সত্যিই মহৎ কিছু করতে চায়, তা হলে কোন বাধাই তার কাছে বাধা নয়।

"কৃষ্ণপ্রাণের নিজের কোন প্রচার ছিল না, তবু তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়লো। কিছু কিছু লোকের আনাগোনা শুরু হল। বেশীরভাগ সাহেব আর মেম। বলাই বাহুল্য তাদের অধিকাংশই আমেরিকাবাসী। জানোই তো, যেখানে বিন্দুমাত্র নতুনত্বের কিছুমাত্র আভাস, সেখানেই আমেরিকার মেয়ে পুরুষ ছুটে যায়। বিরাট গাড়ি, কিছু শুখ্‌নো খাবার, প্রয়োজনীয় পোশাক, শয্যাদ্রব্য আর অতি আধুনিক তাঁবু। ব্যস, আর কিছু ভাবনা নেই। পর্বতের চূড়োয় অথবা মরুভূমির বালিয়াড়ি কিংবা ঘন জঙ্গলের বন্ধুর পথ, কোনটাই তাদের কাছে আর অগম্য মনে হয় না। সব কিছুই তাদের কাছে প্লেজ্যান্ট আউটিং। তার ফলে কৃষ্ণপ্রাণ আর নীরবে কাজ করতে পারলেন না। কেবলমাত্র ঐ সরল নিষ্পাপ পাহাড়ীদের সঙ্গেই দিন কাটানো চললো না, বাইরে থেকে লোক আসতে লাগলো। এলো প্রচুর দান। এই অযাচিত দানের সাহায্যে গুরুদেব স্কুলবাড়ি তৈরী করলেন, খামার বাড়ি, ডেয়ারী ফার্ম প্রতিষ্ঠা করলেন। ক্রমে হাসপাতাল হল, হল চ্যারিটেব্‌ল ডিসপেনসারী। পাহাড়ীদের একান্ত নিজস্ব, হাতেবোনা গায়ের চাদর, আরও অনেক কিছু বোনবার জন্য কৃষ্ণপ্রাণ আধুনিক তাঁত বসালেন। বিশেষ সৌন্দর্যবাহী চাদর প্রচুর বিক্রি হতে লাগলো, দেশে এবং বিদেশে। শুধু গায়ের

চাদর নয়, তার সঙ্গে বিছানার চাদর, দরজা-জানলার পর্দা, চেয়ার-ঢাকা ইত্যাদি আরও সব জিনিস তৈরীতে মাতোয়ারা হল গোটা গ্রাম, যার নাম আগে ছিল লাহিলা, এবার হল বাসুদেবপুর। এই নামকরণ করেছিলেন একজন খ্যাতনামা বাঙালী সাহিত্যিক।

এই বাসুদেবপুরে আট-কামরার গেস্ট হাউস তৈরী হতে দর্শনার্থীর ভিড় আরও বাড়লো, কাগজের রিপোর্টাররা এসে এখানে কয়েক ঘণ্টা থেকে খুঁটিনাটি সব খবর নিল, সব দেখলো, তারপর কাগজে লম্বা করে রিপোর্ট বার করলো। সঙ্গে ছবি বেরুলো কৃষ্ণপ্রাণের। সবাই বললো—সত্যিই কর্মবীর, দেখছো না চেহারাখানা! ঠিক কি যীশুখ্রীষ্ট! তেমনি সৌম্য শান্ত, আবার তাঁরই মতো একটু বিষণ্ণ!

"এখনও উনি আছেন!" টিনার কৌতূহল বেড়ে যাচ্ছিল।

"না, দু'বছর আগে ঠিক এমনি সময় উনি দেহ রেখেছেন। ওঁর জন্ম তারিখই ওর মৃত্যুদিন। এই উপলক্ষে বাসুদেবপুরে সাতদিন ধরে পুজো অনুষ্ঠান হয় এবং প্রত্যেক অনুষ্ঠানে আশ্রমকর্মীদের আশ্রমের বাড়বৃদ্ধির জন্য নতুন কী কাজ করেছে তার তালিকা পেশ করতে হয়। আর এসব কিছুর বিচারকর্তা ভক্ত শিষ্যবৃন্দ।"

"এখন কৃষ্ণপ্রাণের আসনে কে আছেন?"

"এখন আছেন দেবকীনন্দন। এঁরও আসল বাড়ি আমেরিকায়। কৃষ্ণপ্রাণকে দেখতে এসে এখানেই রয়ে গেলেন। অন্য জীবনে দীক্ষা নিলেন, কৃষ্ণপ্রাণের কর্মসূচীকে মাথা পেতে নিলেন..."

টিনা লক্ষ্য করেছিল হিমানী বসু সবকিছু বলতে গিয়ে আবেগে কিরকম কেঁপে কেঁপে উঠছিলেন। তাঁর দুচোখের কোনায় জল জমে গিয়েছিল।

গতকাল হিমানী বসু টিনাকে সোরাবজী হাউসে নিয়ে গিয়েছিলেন। "একবার দেখবে চলো সদ্‌গুরুর আশীর্বাদে দেশী বিদেশী কোন ভেদ নেই। ভাষায় বৈষম্যও কোন বাধা নয়। তুমি শুধু মানুষগুলিকে দেখবে, আর আলাপ করবে ঐ সোরাবজী ফ্ল্যাটে যে দুটি স্বামী স্ত্রী

আছে, তাদের সঙ্গে। তুমি দেখবে পৃথিবীতে ভাল লোক আছে, ভাল পরিবেশ আছে। এদের মধ্যে কিছুক্ষণ থাকলে মন প্রফুল্ল হবে, ভাল লাগবে।"

টিনা গিয়েছিল, মিস্ রীতা ভার্মার কোন আপত্তি হয়নি। হবার কথা নয়। টিনা জানে ঠিক সেই সময় মেজর কাপাডিয়ার বাড়িতে পার্টি আছে এবং সেই পার্টিতে মিস্ ভার্মা মেজর কাপাডিয়ার বিশেষ নিমন্ত্রিত অতিথি। কি আকর্ষণ ঐ মহিলার চেহারা আর ব্যবহারে! যে দেখে, সেই একেবারে কাছ ঘেঁষে বসতে চায়। এখন টিনা জানে সেক্স-এ্যাপিলিং চেহারা কাকে বলে, কেন বলে। আশ্চর্য, আজকাল রীতা ভার্মা সম্বন্ধে টিনার আর সমীহ জাগে না। বরঞ্চ কেমন যেন মজা লাগে। বিশেষ করে উনি যখন একা ঘরে বসে হঠাৎ হঠাৎ গেয়ে ওঠেন—'হোয়েন আই লস্ট্ মাই হার্ট অ্যাট সানফ্রানসিস্কো···

কয়েক দিন আগে আগে মা বাবা দুজনেই চিঠি দিয়েছিল। টিনাকে লিখেছিল বাবা, রীতা ভার্মাকে মা। টিনার পরীক্ষার রেজাল্ট বেশ ভাল হবে বলেই মার দৃঢ় বিশ্বাস, সুতরাং মা-বাবা দুজনেরই ইচ্ছে এরপর টিনার হায়ার এডুকেশনটা হবে বিদেশে, লণ্ডন কিংবা স্টেট্‌স্-এর কোথাও। এই বিষয়ে বাবা ইতিমধ্যেই খোঁজখবর নিচ্ছে। যে-ঘরের মেয়ে, তার ভবিষ্যৎ যাতে উজ্জ্বল হয়, আরও অভিজাত হয়, স চেষ্টা তো মা-বাবাকেই করতে হবে।

মিস্ ভার্মা টিনাকে জিজ্ঞেস করেছিল বাবা কি লিখেছে। টিনার উত্তর শুনে বললো, "দেন মাই অকুপেশন ইজ গন।"

"কেন।"

"আমি তো তোমার জন্যই ছিলাম। তুমিই যদি চলে যাও, তা লে আমার চাকরি কি করে থাকবে!"

"কেন, বাবার কনসলেটেশন রুমের চাকরীটা থাকবে না!"

টিনা মনে মনে নিজের প্রশ্নটাকে বেশ তারিফ করলো।

"তোমার বাবার বিজনেসের ব্যাপারে আমার তো এমন কিছু জ্ঞান নেই টিনা···"

"কিন্তু ঐ ঘরের যা কিছু তার সঙ্গেই তো আপনি আছেন।"

"তোমাকে কে এই সব বলেছে।"

"বলতে হয় না, পাড়ার লোকে যা জানে, আমিও তাই জানি। আপনিও তো কম ব্যস্ত হন না ঐ ঘরে যখন মিটিং হয়!"

মিস ভার্মা খানিকক্ষণ চুপ করে রইলো, তারপর একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, "কিন্তু এখন সে সব চলে গেছে হংকং-এ। তোমার মা বাবা ঐ জন্তই ওখানে কদিন থেকে তারপর স্টেট্‌স-এ গেছেন। তোমরা আরও বড়লোক হবে টিনা। তোমার বাবা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এম্পায়ার গড়ার স্বপ্ন দেখছেন, দেখছেন তোমার মা-ও—"

"কোলকাতায় থেকে বুঝি ও সব কিছু হয় না?"

"হয়, তবে হোতে নেই, রিস্ক আছে। কোন রিস্ক নেই হংকং-এ। তোমার বাবার বিজনেসের তো এখন ইণ্টারন্যাশনাল মারকেট। তোমার বাবার জুপিটার এখন এশিয়া, ইউরোপ, আমারিকা এই তিন কন্টিনেণ্টে জাম্বো প্লেনে ঝড়ের গতিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

টিনা যখন সোরাবজী হাউসে গেল তখন বিকেল প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। সোরাবজী হাউস দুটো অংশে ভাগ করা। তার একটা অংশ ভাড়া নিয়ে থাকেন মিস্টার সৌরিন দে আর তাঁর স্ত্রী রমা দে। সৌরিন দে টিনাকে সহাস্তে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। দু হাত বাড়িয়ে টিনাকে একেবারে কাছে টেনে নিয়েছিলেন শ্রীমতী রমা দে। বসবার ঘরখানা বেশ বড়। চেয়ারে বসে টিনা চারদিকে তাকিয়ে দেখেছিল, সব কিছুতে রুচির ছাপ। আসবাবপত্র দামী নয়, কিন্তু একটা নিটোল পরিচ্ছন্নতা মনকে স্নিগ্ধ করে দেয়। এককোণে ফায়ার প্লেস। ম্যাণ্টেলপীসের ওপরে মাঝখানটিতে দাঁড় করানো রয়েছে মস্তবড় একটা রঙীন ফটো। সাধু কৃষ্ণপ্রাণ। সত্যিই যীশুখ্রীষ্ট। করুণাঘন দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছেন সামনের দিকে।

ঘরের মধ্যে স্ত্রী পুরুষে মিলে জনাবারো। অর্ধেকের বেশী বিদেশী। সেই দুজন দীর্ঘাকৃতি সাহেব রয়েছেন। টিনার সঙ্গে

আলাপ করে সবাই খুশী। খুশী টিনাও। অনেকদিন পরে বেশ ভাললাগা, মনস্নিগ্ধকরা পরিবেশ। ঘর সাজানোর মতই সবকিছু অনাড়ম্বর অথচ আন্তরিকতায় ভরা।

"এই সব আমার গুরুভাই, গুরুবোন। বাসুদেবপুরে যাবার পথে ওঁরা আমাদের বাড়ি আসেন। আমরা একসঙ্গে গুরুপ্রণাম করি, একসঙ্গে গান করি, খাই, বসি · "

টিনা দেখছিল রমা দে ও সৌরীন দের সমস্ত শরীরে খুশীর হিল্লোল।

টিনা সেদিন ওদের একসঙ্গে গান শুনেছিল, শুকসারির গান। এমন গান টিনা কখনো শোনেনি ··

শুক বলে, আমার কৃষ্ণ মদনমোহন,
সারি বলে, আমার রাধা বামে যতক্ষণ,
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ গিরি ধরেছিল,
সারি বলে, আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল
নইলে পারবে কেন···

এ কেমন গান!

হিমানী বসু বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, (রাধারূপিণী শক্তি শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ, রাধা নইলে কৃষ্ণ নেই। জগৎ, ব্রহ্মাণ্ড পর্যন্ত চলছে এই শক্তিতে। নইলে কেউ-ই কিছু পারবে না। রাধা শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি, শ্রীকৃষ্ণের সব। রাধাভাবে সাধনা করো, কৃষ্ণপ্রেমের অমৃতের সন্ধান পাবে।)

আরও কত কি সেদিন হিমানী বসু টিনাকে বলেছিলেন, টিনা সব বুঝতে পারেনি। কিন্তু ভালো লাগছিল শুনতে। ভালো লাগছিল ঐ বিদেশী স্ত্রীপুরুষেরা চোখ বুজে হাতে তাল দিয়ে দিয়ে যখন গাইছিল 'আমার রাডা শকৃতি সচারিল, নইলে পারবে কেনো···।'

সবাইকে রাত্রিবেলা খেতে দেওয়া হয়েছিল মাখন মাখানো পাঁউরুটি, আলুর দম, আপেল, কলা, আর মিল্ক কেক। খাওয়ার শেষে আগুনগরম কফি। টিনাও খেয়েছিল। আর সকলের মতো তৃপ্তির সঙ্গে খেয়েছিল।

বাসুদেবপুরে উৎসব শুরু হতে আর মাত্র পাঁচ দিন বাকি। আগামী পরশুদিন রাত তিনটের সময় উঠে সবাই গাড়ি করে চলে যাবেন তাঁদের গুরুধামে। সেখানে সাতদিন ধরে উৎসব আলোচনা চলবে···।

টিনা যখন বেরিয়ে এলো, তখন প্রায় আটটা বাজে। রাস্তা ঘাটে নিশুতি নেমে এলেও এদিকটা হোটেল ডন আর সোরাবজী হাউসে অতিথি সমাগমের জন্য বেশ জেগে আছে। টিনা দুচোখ ভরে দেখলো হোটেল ডন-এর সামনে মার্কারী ল্যাম্পের জোরালো আলোর ছটা, তার লনে, আর পথের দু'পাশে রাশি রাশি ফুল। দূরে নিরেট সাদা বরফে ঢাকা হিমালয়ের কয়েকটি শৃঙ্গ। মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে অসংখ্য ঘনসন্নিবিষ্ট ইউক্যালিপটাস, পাইন, দেওদার, আর বাজ গাছ। ইউক্যালিপটাসের পাতায় পাতায় রহস্যময় গন্ধের ঝলকে ঝলকে ভেসে আসা--সব মিলিয়ে টিনার খুব ভালো লাগলো, আর সেই ভালো লাগাটুকু সারা গায়ে মনে লাগিয়ে যখন টিনা সিঁড়ি দিয়ে নেমে ফুলে-ভরেথাকা মাটি পেরিয়ে রাস্তায় নামতে যাবে ঠিক সেই সময় সামনের মাটি ফুঁড়ে উঠলেন মিসেস কমলা খাস্তগীর, সোরাবজী হাউসের আরেকটি অংশের বাসিন্দা। এতক্ষণ হোটেল ডনে ছিলেন। সেখানে এক ঘর থেকে আরেক ঘরে গিয়ে বসে দাঁড়িয়ে নানা গল্প করে, নানা কাহিনী আঁচলে বেঁধে, মিসেস ক্লার্কের অফিসঘরে বসে আরও কিছু তথ্য যোগাড় করে, অবশেষে এক কাপ কফি খেয়ে সেদিনকার ডিনারের মেনুকার্ডে একবার চোখ বুলিয়ে নিজের বাড়ি ফিরছিলেন।

টিনা একটু দাঁড়িয়ে পড়লো। দাঁড়াতেই হবে। এখন বেশ কিছু জিজ্ঞাসাবাদ, তারপর মুক্তি। ঠাণ্ডা পড়েছে। টিনার মাথায় জড়ানো গরম কাপড়ের হেডস্কার্ফ ভেদ করে ঘাড়ের কাছে ঠাণ্ডা তার অস্তিত্ব জানান দিচ্ছিল।

"চলো, আমার ঘরে আগুনের ধারে একটু বসবে চল···" মিসেস খাস্তগীর টিনার হাত ধরে টানলেন।

উপায় নেই। তবু টিনা একবার বলবার চেষ্টা করলো··
"মিস্ ভার্মা দেরি দেখলে রাগ করবেন···।"

মিসেস খাস্তগীর হুঃ হুঃ শব্দে একটু হাসলেন।

"তোমার মিস্ ভার্মার তো আজ নেমন্তন্ন, ফিরতে রাত এগারোটা কি তারও বেশী। মেজর কাপাডিয়া কোন মেয়েমানুষকে সহজে ছেড়ে দেয় না।"

টিনা ততক্ষণে মিসেস খাস্তগীরের হ্যাঁচকা টানে চলে এসেছে তাঁর বসবার ঘরে আগুনের ধারে। ওদের আসতে দেখেই মিসেস খাস্তগীরের পাহাড়ী আয়া নিভন্ত আগুনটাকে উসকে দিল।

মিসেস খাস্তগীর কোন ভণিতা না করে সোজাসুজি টিনাকে প্রশ্ন করলেন, "ঐ মোদো মাতালের র‍্যালায় কি করতে গিয়েছিলে! ওদের জড়াজড়ি দেখতে··!"

টিনার মুখ দিয়ে কোন উত্তর বেরুলো না। মিসেস খাস্তগীরের এই স্বভাব সকলে জানে। সকলে জানে মিসেস খাস্তগীর এই জগতের কোথাও কিছু ভালো দেখেন না। কোনও কিছুতে নির্মল আনন্দ পান না। মিসেস ক্লার্কের অদ্ভুত একটা সমবেদনা আছে এই মহিলাটির জন্য—"তোমরা কেন একটু তলিয়ে বুঝতে চাও না এই নিঃসঙ্গ, আত্মীয়-স্বজন পরিত্যক্তা এই মহিলাটিকে·?"

টিনা মিসেস ক্লার্কের কাছে মিসেস খাস্তগীরের কথা শুনেছিল—"ভাবতে পারো টিনা, একটা মেয়ে কোন্ চোদ্দ বছর বয়সে বিয়ে হওয়ার মাত্র সাতমাস পরে বিধবা হয়ে শ্বশুরবাড়িতে বিরাট সংসারে একাধারে রাঁধুনী আর ঝি-এর কাজ করে করে হাড়সার হয়ে গেল। এমনি করে যখন ন'টি বছর কেটে গেল, তখনই তার জীবনে প্রথম পরিবর্তন এলো, এবং সে পরিবর্তন চমকপ্রদ, আবার অস্বাভাবিক···।"

"তার পর"—টিনা প্রশ্ন করে সব জানতে পেরেছিল।

যখন মিসেস খাস্তগীরের বয়স হলো পুরো তেইশ তখনই বিলেত থেকে সাতাশ বছর পরে চিরকালের জন্য দেশে ফিরে এলেন মেজো ভাশুর ঠাকুর সুধীর খাস্তগীর। তাঁর মেমসাহেব বউ

বিলেতে গতায়ু হয়েছেন। একটি মাত্র ছেলে আমেরিকায় সেট্‌ল্‌ করেছে। বাপের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে সে আদৌ আগ্রহী নয়, ভারতবর্ষে আসতে তো নয়-ই। সেই ভাশুর ঠাকুর কৃপা করলেন ভাদ্র বউকে। তাঁর মেদবর্জিত টানটান স্বাস্থ্য ছোট ভাইদের ঈর্ষার উদ্রেক করতো।

বাস্তব প্রয়োজনেই সুধীর খাস্তগীরের দরকার পড়লো এই ভ্রাতৃবধূটিকে। যে মানুষটি সাতাশ বছর বিদেশী আবহাওয়ায় থেকে দেশে ফিরে এলেন, অবশ্যই এই দিশী হাওয়া, দিশী পরিবেশকে তিনি মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারলেন না। তিনি চাইলেন এই ভারতবর্ষে 'হোম'-এর পরিবেশ এবং সেই পরিবেশ মিললো এই সাজানো-গোছানো বরফ-শহরটিতে। সোরাবজী হাউসের ডানদিকের অংশটুকু ভাড়া নিলেন। এখানে নতুন করে সংসার পাতলেন এবং সেখানে অধিষ্ঠিত করলেন এই ভাদ্র বউটিকে,—কমলা খাস্তগীরকে।

একদিন বাড়ির সবাই অবাক হয়ে দেখলো দরজায় গাড়ি দাঁড়িয়ে। প্রচুর অর্থের মালিক, গুরুগম্ভীর সুধীর খাস্তগীর অন্যত্র চলে যাচ্ছেন, সঙ্গে যাচ্ছে ঐ মুখবুজেথাকা, দিবারাত্রি খেটে খেটে প্রায়ক্ষয়েযাওয়া বিধবা বউটি। ভাইরা প্রশ্ন তুলেছিল এই বিষয়ে। কিন্তু বিত্তবান মেজোকর্তার একটিমাত্র কঠিন মন্তব্যে সকলের ঠোঁট আঠায় জুড়ে গেল—"এতদিন তোমাদের সেবা করেছে, আমি তাতে ভাগ নিইনি। এবার থেকে ও আমার সেবা করবে। তোমরা রুখে দাঁড়িয়ো না, পারবে না…।" সত্যিই পারা যাবে না বলেই পারা যায় নি। কারণ মেজদার সঞ্চিত অঢেল টাকার ওপর ভাইদের আন্তরিক আকর্ষণ। উপরন্তু চৌরঙ্গীতে ভাইদের যে ড্রাগ হাউসটি আছে, তার পেছনে মেজদা আরও টাকা ঢেলে, আরও বুদ্ধি দিয়ে যখন তাকে আরও চালু করে দিলেন, তখন সত্যিই তাঁর মুখের ওপর আর কারো কিছু বলবার রইলো না—দাদা শুধু বলে দিয়ে গেলেন মাসে মাসে তাঁকে কত টাকা পাঠাতে হবে এবং আরও বললেন বাকী সমস্ত লভ্যাংশটাই ভাইদের পকেটে যাবে, উনি কোন কথা বলবেন

না, তবে প্রতি বছর তাঁকে ব্যবসার পরিষ্কার হিসেবটি যেন দেখিয়ে যাওয়া হয়।

ভাইরা খুশি হল। খুশির প্রথম কারণ দিনরাত আর ঐ রাশভারি বড়ভাইয়ের উপস্থিতি সহ্য করতে হবে না, দ্বিতীয় কারণ দাদার দেওয়া বেশ একটা মোটা অঙ্কের টাকার সাহায্যে ড্রাগ হাউসটির সর্ববিধ উন্নতি হয়ে সংসারে টাকা আসবার পথটি একেবারে মসৃণ হয়ে যাবে। তবে কাজের মেয়েমানুষটি চলে গেল এই যা।

কমলা খাস্তগীর সাত বছর ভাশুর ঠাকুরের সেবাযত্ন করেছিলেন এবং সাত বছর পূরণ হবার পর পাঁচদিনের দিনই উনি দুচোখ বুজলেন। এই মৃত্যুর কোন প্রস্তুতি ছিল না। আগের থেকে কোন ইঙ্গিতও ছিল না।

কমলা খাস্তগীর স্বামীর মৃত্যুর পর যেমন সজোরে দেয়ালে মাথা ঠুকেছিলেন, এবারেও আবার তাই-ই করলেন এবং বারবারই করতে যাচ্ছিলেন। এমন সময় তাঁর সামনে একখানা দলিল মেলে ধরলেন সুধীর খাস্তগীরের স্থানীয় বন্ধু এককালের নামী ব্যারিস্টার মিস্টার রমেন গুহঠাকুরতা। দলিলটি ছিল সুধীর খাস্তগীরের উইল। ভাদ্রবউয়ের সেবার পুরস্কার উনি দিয়ে গেছেন। ফিক্সড ডিপোজিটের চল্লিশ হাজার টাকা আর সোরাবজী হাউসের যে অংশটিতে বাস করতেন তা লিজ নিয়ে রাখার অধিকার। এছাড়া কোলকাতার ড্রাগ হাউসের যে লভ্যাংশ এখানে সুধীর খাস্তগীরের নামে আসতো, এখনও সেই টাকা নিয়মিত আসবে কমলা খাস্তগীরের নামে। রমেন গুহ-ঠাকুরতা বললেন, এ নির্দেশ কদিন আগেই কোলকাতার বাড়িতে চলে গেছে। তার মানে সুধীর খাস্তগীর শেষ মুহূর্তটির জন্য ভালোভাবেই তৈরি হচ্ছিলেন। অতএব কমলা খাস্তগীরের মাথা ঠুকবার আর কোন কারণ রইলো না। ভাইদেরও মনোবেদনা বলতে কিছু ছিল না। কারণ দাদার বাকী অর্থ ও ড্রাগ হাউসের মোটামুটি মালিক তারাই হল। শ্রাদ্ধ, শান্তি চুকে যাবার পর তারা পরম আনন্দেই দিন কাটাতে লাগলো। উপরন্তু বছরে একবার করে, বিশেষ করে পুজোর

সময় সপরিবারে বৌদির খবরাখবর নেবার জন্য ঐ সুন্দর ছবির মতো শহরটিতে দিন পনেরো কাটিয়ে যাওয়ার সুযোগ ভাইদের প্রাণে উৎসাহের বন্যা বইয়ে দিল। কিন্তু ঐ ভ্রাতৃবধূ যখন একবার ভীষণ জ্বরে শয্যাশায়ী হয়ে কোলকাতার বাড়িতে আপনজনের কাছে খবর পাঠালেন, তখন সবকটি ভাইয়েরই এমন কাজ বেড়ে গেল যে, কেউ একবার রোগিণীকে দেখতে আসতে পারলো না, তবে চিঠিতে তত্ত্ব-তল্লাস হল।

এরপর থেকেই কমলা খাস্তগীর অনেক সতর্ক, অনেক কঠোর হয়ে গেলেন। ভাশুর, দেবর জায়েদের, বেড়াতে আসার নামে স্পষ্ট লিখে দিলেন, "আপনারা এখানে এলে অসুবিধে হবে, কারণ আমি বাড়ির বেশীর ভাগটাই ভাড়া দিয়ে দিয়েছি · ।"

সত্যিই কমলা খাস্তগীর তাঁর বাড়ির খানিকটা অংশ ভাড়া দিয়েছিলেন এক দক্ষিণী নায়ার দম্পতীকে। স্বামীটি স্থানীয় মিলিটারী অফিসে কাজ করে। সাতে থাকে না, পাঁচে থাকে না। নির্ঝঞ্ঝাট, নির্বিবাদী মানুষ। নিয়মিত ভাড়া দেয়, বাড়ি ঘর দোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে। তথাকথিত ভাড়াটিয়াদের মতো বাড়িওয়ালার ক্ষতি করবার বা তাদের বিরক্ত করবার মতো ন্যূনতম মানসিকতা তার নেই।

মুশকিলটা তো এখানেই! কমলা খাস্তগীর কিছুতেই কোন ব্যাপার নিয়ে এদের সঙ্গে মনের মতো অনর্গল কথা বলতে পারছেন না। সময় কাটতে চায় না! আর এই ভাড়াটিয়া গিন্নীটিও হয়েছে তেমনি। কতই বা বয়স হবে! বড়জোর সাতাশ-আটাশ! পত্র-পুষ্পে সাজিয়ে গল্প করার, আড্ডা দেওয়ার এই-তো বয়স। তা নয়, যখনই ঐ মিসেস নায়ারের কাছে যাও, দেখবে সে কাজ করছে। কিপ্টের যাসু। ঘরদোরের কাজ করবার জন্য একটা ঠিকে লোক পর্যন্ত রাখবে না। সব কিছু যদি নিজের হাতে করতে হয়, তবে আর পাড়া-প্রতিবেশীর সঙ্গে আলাপ করবে কখন! কমলা খাস্তগীর যখনই কলিং বেল টিপে ওদের ঘরে যান, তখনই দেখেন

মিসেস নায়ার হয় সাবান জলের বালতিতে বিছানার চাদর, কাপড়, জামা ডুবিয়ে দু-হাত দিয়ে চেপে চেপে নোংরা জল বার করছে, না হয় ড্রইংরুমের কার্পেট ঝাড়ছে, কিংবা রান্না ঘরে ইড্‌লী বা ধোসা তৈরি করছে। আবার শখ কতো, পেছনের এক ফালি উঠোনের একপাশে গাছ লাগিয়েছে। ভারি তো গাছ, দুটো না তিনটে কি ছাই ফুল গাছ, আর সব্জী বলতে ভিণ্ডি আর বেগুন। এক কোণে আবার একটা কারিপাতার গাছ। এরই মধ্যে কেমন ঝাপসে উঠেছে দেখ না। এই কটা গাছের পরিচর্যা করেই নাকি ভদ্রমহিলা আর সময় পান না, আহা রে ··।

কমলা খাস্তগীরের মাঝে মাঝে পা থেকে মাথা অবধি জ্বালা করে মিসেস নায়ারের এই ধরনের নিজের ঘরের কোণটুকুতে ঘাড় গুঁজে কাজ করার ন্যাকামি দেখে। ওরা এখানে আসবার দিন দশেক পরে কমলা খাস্তগীর সবে একটু গুছিয়ে বসে মিসেস নায়ারকে বলতে শুরু করেছিলেন মিসেস দয়ালের কথা···"ঐ যে মহিলা, সুন্দরী বলে গুমোরের তো শেষ নেই, এখন তো কেবল ওষুধ খেয়ে ঘুমের ঘোরে দিন কাটাচ্ছে, কিন্তু টাকা পয়সার হিসেবটির বেলায়! একটা নয়া পয়সার এদিক-ওদিক হ'লে মিসেস ক্লার্ককে বকে ঝাঁঝিয়ে, বুকের হাড় পাঁজড়া নড়বড়িয়ে দেয় না!"

মিসেস নায়ার কিছুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থেকে হিন্দীতে বলেছিল, "তবে যে শুনতে পাই মিসেস ক্লার্কই আসলে সব কিছু। মিসেস দয়াল হিসেবপত্তর, টাকাপয়সা কিছু দেখেন না, দেখতে চান না ।"

"ঐ তো চালাকি মিসেস দয়ালের। চারবেলা আপসে খানা জুটছে, ঘরে বসে ওষুধ খেয়ে আরাম হচ্ছে, যখন খুশি ঘুমোচ্ছে, যখন খুশি জাগছে, আর বলে কিনা স্বামী বিনে অন্ধকার। আহা রে, আমার স্বামী সোহাগী রে···।"

কমলা খাস্তগীর কথার তুবড়ির মধ্যে লক্ষ্য করেননি কখন মিসেস নায়ারের উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ কপালে কয়েকটা গভীর কুঞ্চন রেখা পড়ে গেছে। মিসেস নায়ারের কেবল মনে পড়ছিল ঠিক তার আগের দিন

হোটেল ডনের লনে বসে মিসেস দয়ালের সেই সকৃতজ্ঞ মৃদু ডাক,
"মিসেস ক্লার্ক আমার প্রাণধারণের একমাত্র ভরসা। আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ, চিরকৃতজ্ঞ ।"

মিসেস নায়ারের হাতের দিকে নজর পড়তে কমলা খাস্তগীরের আপাদমস্তক জ্বালা করে উঠলো। আরে মোলো! কথা নেই বার্তা নেই, দুখানা কাঁটা আর উল নিয়ে বুনতে শুরু করে দিলে! সংসারে তো মাত্র দুটি প্রাণী, ছেলে বলতে স্বামী, আর মেয়ে বলতে নিজে, তবে! গুচ্ছের না বুনে স্থির হয়ে বসে একটু গল্প করতে দোষ কি! পাঁচরকম গালগল্প করার জন্যই তো নিজের বাড়ির বুকে ভাড়াটে বসানো। কারিপাতার ফোড়নের বিদ্‌ঘুটে গন্ধ শোঁকার জন্য তো নয়!

কমলা খাস্তগীরের মাথার ঠিক ছিল না সেদিন মিসেস ক্লার্কের কাছে বসে। মিসেস ক্লার্কের সঙ্গে দিব্যি হিন্দিতে আর ভাঙা ভাঙা বাংলায় কথা চলে। চলছিলোও, কিন্তু সেদিন একটু অসুবিধে হয়ে গেল। সবে একটু বলা হয়েছিল, মিসেস দয়ালের মতো একটা আধপাগলা, আধা জ্যান্ত মহিলাকে অত তোয়াজে রাখার কি দরকার! মিসেস ক্লার্ক কি তার কেনা গোলাম নাকি! মিসেস ক্লার্কের দিবারাত্রির পরিশ্রম কি ঐ আধ ঘুমন্ত মেয়েমানুষটাকে তুলে ধরবার জন্য! মিসেস ক্লার্কের জন্য আর কেউ দুঃখ না পাক কমলা খাস্তগীরের মনে কিন্তু খুব লাগে।

এতটা বলে, কত কি আশা করে মিসেস ক্লার্কের মুখের দিকে তাকিয়ে কমলা খাস্তগীর দেখেন কি না সে মুখ গম্ভীর, এবং তাই নয় শুধু, এর পর মিসেস ক্লার্ক দুহাত দিয়ে নিজের দুকান চাপা দিয়ে বললেন, --"নো মোর সাচ্ টক প্লীজ. মিসেস দয়ালের বিরুদ্ধে কিছু শোনাও আমার পক্ষে পাপ, মহাপাপ।"

"আপনি এখানে আসবেন, গল্প করবেন, কিন্তু মিসেস দয়ালের নাম আপনার ও মুখে আর কখনোও উচ্চারণ করবেন না, প্লীজ, আমার অনুরোধ।"

মিসেস খাস্তগীর মাঝেই মাঝেই নিজের মনে জিভ ভেংচিয়ে বলেন, "আমার অনুরোধ, কি আমার রে!"

এত রাগ কেন কমলা খাস্তগীরের মনে, তিনি নিজেও বুঝতে পারেন না। সারা দুনিয়ার ওপর রাগ, প্রচণ্ড রাগ।

সৌরিন দে রমা দের বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই ওরা মুখ ফিরিয়ে নেয়। দরজা বন্ধ করে দেয়—অসভ্য, জানোয়ার। তেমনি হয়েছে র‍্যালা, আড্ডা মারার হুল্লোড়। নিন্দেয় কান পাতা যায় না।

কমলা খাস্তগীর মুহূর্তের জন্য আনমনা হয়ে যান। এই শহরে কোন্ ঘরে কি হল, কি কি গল্প হল, তাই নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। ঘামানোর দরকার নেই। কিন্তু দু চোখের পাতা বুজতে পারেন না কমলা খাস্তগীর।

প্রথম দিকে রমা দে, সৌরিন দে আদর করে তাঁকেও ওদের ঐ গল্পগুজবে ডেকে নিত। একবার কাকভোরে উঠে জিপে করে বাসুদেবপুরেও নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখন, এই বছরখানেক হল ওদের সঙ্গে কথাবার্তা দূরে থাক, মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত বন্ধ।

সেদিনকার অন্ধকার ঘনিয়ে আসা সন্ধ্যার আলোয় মিসেস রমা দে মুখখানা কি সাংঘাতিক থমথমে করে কমলা খাস্তগীরের কলিং বেল টিপেছিল! কমলা খাস্তগীর দরজা খুলে দিয়ে একগাল হেসে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন, "আসুন মিসেস দে, ভেতরে এসে বসুন। আজকেই সিংজীর দোকান থেকে নতুন ব্র্যাণ্ডের চা এসেছে, ভালই হয়েছে, একসঙ্গে, চা খেতে খেতে গল্প করা যাবে।"

"না, আপনার সঙ্গে গল্প করার মানসিকতা আর আমার নেই"...

"কেন?" একটুও বিচলিত না হয়ে কমলা খাস্তগীর তাকালেন।

"আশ্চর্য, আপনার এতটুকু লজ্জা করছে না "কেন" বলতে! আপনি আমাদের নামে না হয় যা খুশি তাই বলতে পারেন, কিন্তু একটুও থমকালেন না বাসুদেবপুরের দেবকীনন্দন সম্বন্ধে যা নয় তাই বলতে! দেবকীনন্দনকে দেখে, তাঁর সঙ্গে কথা বলে অত্যন্ত ভালো লেগেছে বলেছিলেন না? এই বুঝি তার নমুনা!"

কমলা খাস্তগীর কি যেন একটু প্রতিবাদ করে বলতে যাচ্ছিলেন। রমা দে মাথা ঝাঁকিয়ে ধমকে বলে উঠলেন, "আপনি অত্যন্ত নীচ, অতি নোংরা। নইলে ললিতা মালহোত্রার সঙ্গে দেবকীনন্দনের নাম জড়িয়ে অত কুৎসিত কথা বলতে পারেন! তাও কিনা বলেছেন মেজর দেশাই-এর আয়া লছমীর কাছে! আপনি জানেন না, লছমী আর আমার আয়া সরস্বতিয়া আপন বোন! মিসেস নায়ারের কানের কাছেও তো কম কুটকুট করেন নি। নেহাত তিনি শুনতে চাননি তাই।"

উত্তেজনায়, রাগে রমা দের গোটা শরীরটা কাঁপছিলো।

কমলা খাস্তগীর হঠাৎ দপ্ করে জ্বলে উঠলেন, "বেশ করেছি, বলেছি, আমি একাই বলি কিনা! রাত দুপুর পর্যন্ত হ্যা হ্যা র‍্যালা চললে সবাই বলবে। আমিও বলবো, বেশ করবো···" কমলা খাস্তগীর রমা দের মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। রমা দে ভদ্রসমাজে অভদ্রতার এমন নগ্ন নমুনা দেখে বিস্ময়ে বাক্‌রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। আশ্চর্য, এরপর উনিও একটি পা তুলে জোরে লাথি মেরেছিলেন কমলা খাস্তগীরের বন্ধ দরজায়। তারপর ফিরে এসেছিলেন। উত্তেজনায় সেদিন আরও কি করতেন কে জানে। তবে মনটা শান্ত হল যখন লেটার বক্স খুলে গুরুভাই আর্থার লুকাসের একখানা চিঠি পাওয়া গেল। বম্বে থেকে সে আর তার স্ত্রী এমা আসছে। আগামী সপ্তাহে শনিবার বিকেল থেকে তারা দিন দশেকের জন্য দে দম্পতির আতিথেয়তায় ধন্য হবে।

রমা দের চোখের সামনে ভেসে উঠলো আর্থার লুকাসের অপরূপ পৌরুষে ভরা দীর্ঘ চেহারা। তার স্মিত ধীর ব্যবহার, তার গম্ভীর একটু নীচু কণ্ঠস্বরে কথা বলা। রমা দের প্রতিটি কাজকে, তার সংসারকে আর্থার তার সপ্রশংস দৃষ্টি দিয়ে বার বার অভিনন্দন জানায় এবং এই ব্যবহারটুকু রমা দের মনে এক সুন্দর অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। রমা দে জানেন, এমা অতিমাত্রায় ছটফটে, সব কাজে চঞ্চল, কথাবার্তায় হাল্কা, কোন গভীরতার ধারে কাছে যায় না,

যেতে চায় না। সুতরাং এমন স্বামীর সঙ্গ ঠিক পছন্দ করছে না। প্রায়ই মাথা ঝাঁকিয়ে এমা স্বামীকে বলে, 'তোমার কোন মিশনারী কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক হওয়া উচিত ছিল—'

আর্থার লুকাস একদিন এক নির্জন মুহূর্তে রমা দের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, "জানো মিসেস দে, আমি যদি তোমাদের মতো একটি ভারতীয় বাঙালী মেয়ে বিয়ে করতাম, আমি সুখী হতাম। রেসের ঘোড়ার মতো আমার ছুটতে ভালো লাগে না। ভালো লাগে না সারাদিন অফিস করার পর সেখান থেকে সোজা ক্লাবে বা পার্টিতে যেতে, নাচতে আর বিলিয়ার্ড অথবা টেনিস খেলতে—"

"তুমি যদি সত্যিই একজন বাঙালী মেয়ে বিয়ে করতে চাইতে, ব্যর্থ হতে না··" রমা দে জোরে নিশ্বাস টেনে বললেন।

"ব্যর্থই হতাম। প্রথমত, তোমরা, বাঙালী মেয়েরা যতই স্মার্ট হও, স্বাধীন স্বাধীন ভাব দেখাও, বিদেশীর গলায় মালা দিতে তোমাদের হাত কাঁপে। আর তাছাড়া, আমি চাইলেই কি আমার মনের মতন মেয়ে পেতাম!"

"কি রকম মেয়ে তোমার পছন্দ ছিল আর্থার?"

"ঠিক তোমার মতো। তোমার মতো স্নিগ্ধ, শান্ত।" রমা দে আর্থার লুকাসের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, সে বাইরে ইউক্যালিপটাসের সারির দিকে চেয়ে কেমন ঘোর লাগার মতো কথাগুলো বলে যাচ্ছে।

রমা দে সেদিন সারারাত না ঘুমিয়ে কাটিয়েছিলেন। কেবল ভোর রাতে আধো ঘুমে একটা স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি যেন একটা পাহাড়ের গা দিয়ে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছেন। যাচ্ছেন তো যাচ্ছেনই। ভয়ে চীৎকার করে উঠেছিলেন, আর ঠিক সেই সময় সৌমেন দে ঝাঁকুনি দিয়ে স্ত্রীর ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছিলেন। ঘুম ভেঙেই মনে পড়ে গেল কমলা খাস্তগীরের মন্তব্য— ধর্মের নামে অত র‍্যালা, আড্ডা মেরে, হৈচৈ করে পাড়া-প্রতিবেশীর কান ঝালাপালা করতে লজ্জা করে না!

রমা দে দু'হাতে নিজের দু'কান চেপে ধরলেন। কমলা খাস্তগীরের কথাটা মনে পড়ামাত্র কান দুটো আগুন গরম হয়ে উঠেছে।

"ওসব বাড়ি কি করতে যাও! তোমাকে মিসেস ক্লার্ক কিছু বলে দেয়নি?" কমলা খাস্তগীর টিনার হাত ধরে টেনে কায়ার প্লেসের সামনে একটা মোটা কোচের ওপর বসিয়ে দিলেন। আয়াকে বললেন খুব গরম এক কাপ চকোলেট দিতে।

"আমি এখন আর কিছু খাবো না। আমি এখন চলে যাবো মিসেস ক্লার্ক বোধহয় ভাবছেন।" মিনতি করে টিনা বললো।

"কি বললে! মিসেস ক্লার্কের খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, সে কিনা তোমার জন্য ভাবছে!" কমলা খাস্তগীর হিঃ হিঃ করে হেসে উঠলেন, "দেখগে সে এখন অফিসঘরে বসে সারাদিনের খরচা খরচের হিসেব করছে। হিসেবের খাতায় কোন্ খাতে কতটা দাম লিখলে নিজের থলে বেশ পুরে উঠবে, সেই প্ল্যান ছকে চলেছে..."

"উনি তো খুব ভালো · " টিনার একদম বসতে ইচ্ছে করছিলে না। ভালো লাগছিলো না কমলা খাস্তগীরের দু চোখ ছোট করে নীচু গলায় মিসেস ক্লার্কের নামে ঐ কুৎসিত অপবাদ দেওয়ায়।

"তুমি এখানে এতদিন আছ, আর এ খবরটা জানো না ড্রাইভার রামবাহাদুরের সঙ্গে তো ক্লার্ক বুড়ির একেবারে যাকে বলে ঘটাঘটি। দয়াল বুড়ি যতক্ষণ ঝিমিয়ে থাকে, ওরা ততক্ষণে ওকে সাফ করতে থাকে। গুণ ওদের অনেক···"

টিনা আরেকবার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলো। কমলা খাস্তগীর টিনার দু'কাঁধে চাপ দিয়ে আবার তাকে বসিয়ে দিলেন। তারপরেই প্রশ্ন করলেন—"তা টিনা, তোমার মা বাবা তোমাকে একা ফেলে হঠাৎ হংকং চলে গেল কেন বলতো!"

টিনার মুখ এবার সত্যিই শুকিয়ে গেল। আস্তে বললো, "মা বাবা তো বেড়াতে গেছে। এখন তো আমেরিকায় আছে।"

"তোমার মতো সোমত্থ মেয়েকে একা ফেলে রেখে ওরা বেড়াতে চলে গেল, এ কেমন মা বাবা!"

"কেন! আমি তো একা নই, আমার সঙ্গে তো আন্টি ভার্মা আছেন..." টিনার সত্যি রাগ হয়ে গেল। সে এবার যাবেই।

"বেড়াতে গেছে, না যা করছিল, তাতে একটু বাড়াবাড়ি করে ফলায় মুখ লুকোতে গেছে!" টিনার মনে হল ঘাড়ের পেছনে কে াড়াশীর মতো টিপে ধরেছে, ও এক্ষুনি মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে।

"আপনি এসব কী বলছেন! আপনি তো আমার মাকে বাবাকে ানেন না, কখনও দেখেননি!"

"ওসব লোকদের দেখে চিনতে হয় না, কানে শুনেই দিব্যি িরচয় পাওয়া যায়।"

"আপনাকে কে কি বলেছে"—টিনার কান্না পাচ্ছিল।

"এ দুনিয়ায় বলার লোকের অভাব নেই টিনা"·· কমলা খাস্তগীর াবার গলা নীচু করে বলল—"তুমি নীপা বলে শুঁটকি মেয়েটাকে তা চেন!"

"নীপা! মানে নীপাদি!" কৌতূহলী টিনা অস্ফুট চীৎকার করে ঠলো।

"হ্যাগো, তোমার নীপাদি। সে এখন আমার ঐ ছোট ঘরে াড়া আছে। সে আছে আর তার বর আছে। কেমন যেন চোরের মতো আছে। কি জানি কি ব্যাপার!" টিনার বিস্মিত মুখের দকে তাকিয়ে কমলা খাস্তগীর মুখ ঝুঁকিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, আমার তো মনে হয় না ওদের ঠিক ঠিক বিয়ে হয়েছে। একসঙ্গে এসেছে, একসঙ্গে খাচ্ছে শুচ্ছে, এই যা·· "

টিনা জানে মিসেস খাস্তগীর তার বসবার ঘরের পাশেই যে একখানা ঘুপ্‌চি মতো ঘর আছে, মরশুমের সময় সেটাও কাজে াগান, ভাড়া দিয়ে দেন।

"ওরা এসেছে পরশুদিন, দিন সাতেক নাকি থাকবে। সাতদিনের ভাড়া বলেছি একশ টাকা। আর আমার গ্যাস ব্যবহার করলে ণ্টায় নেবো দু'টাকা। তবে যেদিন ব্যবহার করবে সেদিনই। এর াইতে সস্তা আর কোথায় পাবে! প্রথম দিন এসেই খেয়েছিল ক্লার্ক বুড়ির হোটেলে। বিল চুকিয়ে যখন ফিরে এলো, তখন দুজনকার মুখই শুকিয়ে আমসী। সঙ্গে সঙ্গে আমি ফাঁদ পাতলাম।

বললাম আমার গ্যাস ভাড়া নিয়ে মুরগির ঝোলভাত বা ভাতে ভাত খাও, অনেক ভাল থাকবে। হাঁড়ি কড়ার জন্য ভাবতে হবে না।"

"আশ্চর্য, নীপাদি এখানে এসেছে পরশু দিন, অথচ আমি জানি না!"

"নীপা আজকে সকালেই তোমাকে প্রথম দেখতে পেয়েছে। তুমি তখন দয়াল বুড়ির সঙ্গে ওর কুকুরটা নিয়ে লনে বেড়াচ্ছিলে—"

টিনার বয়স তখন সবে দশ। তখনও ওদের নিউ আলিপুরে বাড়ি হয়নি। ওরা তখন থাকে বালিগঞ্জের ভাড়া বাড়িতে।

সন্তুমাসীর কাছে একদিন একটি মেয়ে এলো, সম্পর্কে সন্তুমাসী ভাশুর-ঝি। বয়স বছর বাইশ তেইশ। টানা ছিপ্‌ছিপে শরীর বরং রোগাই। গায়ের রং বেশ কালো। মুখের মধ্যে সব চাইতে আগে চোখে পড়ে তীক্ষ্ণ নাক। চোখদুটি ছোট, তবে ঝকঝকে, মনে হয় চোখে যেন সব সময় কোন প্রশ্ন ফুটে আছে। সর্বদাই কি যেন জানতে চায়। ঠোঁট পাতলা চাপা। ক্রমশ সরু হয়ে যাওয়া চিবুক। টিনা সবচাইতে বেশি আশ্চর্য হয়েছিল সেই মেয়েটির পিঠ ছাপানো, প্রায় কপাল ঢেকে যাওয়া চুলের রাশ দেখে। আঁট করে একটা অস্বাভাবিক মোটা বিনুনি বেঁধে পিঠের ওপর ঝুলিয়ে দেওয়া চুলের ডগায় একটা বড়ো গিঁঠ বেঁধে বিনুনির দৈর্ঘ হ্রাস করা হয়েছিল। টানটান করে বাঁধলেও চুলের রাশি ফেঁপে উঠে কপালের আধখানা ঢেকে ফেলেছিল।

মেয়েটি সন্তুমাসীকে 'কাকীমা' বলে প্রণাম করলো। তারপর জানালো এ বাড়ির মেয়েটিকে গান শেখানোর জন্য যে মহিলা-টিচার খোঁজ করা হচ্ছে, সে কাজটি পাওয়া যাবে কিনা। গীতবিতান থেকে সে সম্প্রতি সর্বোচ্চ উপাধিটি লাভ করেছে। উপরন্তু ক্ল্যাসিকাল গানেও সে বেঙ্গল স্কুল অব মিউজিক থেকে সঙ্গীত প্রভাকর হবার জন্য ফাইনাল ইয়ারে তালিম নিচ্ছে।

"আমার বড় দরকার কাকীমা। আপনি একটু বলুন না আপনার বোনকে। শুনেছি উনি বললেই এ বাড়ির সব কিছু হয়।"

সন্তুমাসী একবার বাঁকা চোখে তাকিয়ে দেখলো তার হঠাৎ-উদয়-হওয়া ভাশুর-ঝিটিকে, তারপর মাথা নাড়িয়ে বললো—"তা তোমার দরকার তুমি নিজেই বল না। আবার তুমি যখন ভালো করে জেনেই এসেছো কার কাছে বললে কি কাজ হবে।"

"তাই যাচ্ছি তবে। আমার নিজের সেটুকু এলেম আছে। আছে বলেই এসেছি।"

সন্তুমাসী সেদিন বলেছিল, "হুঁ, তাই যাও, এলেম দেখাও গিয়ে। কেমন চাকরি হয় দেখবো। তোমার মা বাবাকে চিনতাম, এখন তোমাকে চিনলাম। সবকটা কি এক চাকের বোল্‌তা! হুল ছাড়া কথা বলে না!"

কিন্তু আশ্চর্য, নীপা নামে সেই মেয়েটির চাকরি হল। সন্তুমাসীর গম্ভীর, থমথমে মুখ দেখেও মা উচ্ছ্বসিত হয়ে বললো, "যাই বলো সন্তুদি, নীপা গান গায় কিন্তু চমৎকার। সুরেলা গলায় কি সুন্দর কাজ। টিনার গানের হাতেখড়ি এই মেয়ের হাতেই হোক।"

তাই হোল, টিনা গান শিখতে লাগলো এবং ভালোই এগিয়ে গেল। নীপা আরও এগোলো আরেকটা গুণের সাহায্যে। সেই গুণ উল বোনায়। মা বার বার বলতে লাগলো, মেয়েটার উলবোনা যেন মেশিনের মতো! সত্যিই মেশিনের মতো বোনা হল টিনার গায়ের ফ্রক, কোট। মায়ের গোটা দুয়েক কার্ডিগান, স্টোল। বাবার দুখানা শ্লিপ ওভার, একটা দুধসাদা উলের জহরকোট।

"সত্যিই এলেম আছে মেয়েটার"—সন্তুমাসীও স্বীকার করলো।

এমনি করে চার বছর কেটে গেল। নিউ আলিপুরে বাড়ি হল। গাড়ি হল। মা-বাবা একেবারে পাল্‌টে গেল, টিনা বড় হল, আর সেই সময়েই টিনাকে নিয়ে নীপা একদিন গানের স্কুলে গেল। টিনা এবার স্কুলে ভর্তি হয়ে গানের উপাধি নেবে।

টিনা স্কুলে ভর্তি হল। গাড়িতে উঠল। সঙ্গে নীপাদি। গাড়িতে

স্টার্ট দিতেই নীপাদি ড্রাইভারকে বাগবাজারের একটা ঠিকানা দিয়ে সেখানে যেতে বললো। টিনা বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাতেই নীপাদি বললো —"মনে আছে, দিন দশেক আগে আমি তোমাকে একটা লাল বই দিয়েছিলাম। তুমি মাত্র দুদিন পরেই বইটা ফেরত দিয়ে বলেছিলে এর একটা লাইনও নাকি তোমার মাথায় ঢুকছে না। আজকে তোমাকে প্রথম একটা জায়গায় নিয়ে যাবো, যেখানে গেলে তুমি অনেক কিছু বুঝতে পারবে। তোমাদের মতো লোকদের বুঝতেই হবে···।"

নীপাদির নির্দেশ মতো বড় রাস্তা দিয়ে খানিকটা যাওয়ার পর একটা গলির মুখে গাড়িটা থামলো।

"নেমে এসো, গাড়ি থেকে"—নীপাদি আদেশের সুরে টিনাকে বললো। অচেনা জায়গায় টিনা নামতে ইতস্তত করছিল। একটু আপত্তি জানিয়ে বললো—"গলিতে তো অন্য গাড়িগুলো যাচ্ছে···।"

"যাচ্ছে, কিন্তু তোমার গাড়িকে যেতে দেবো না, কারণ এর পরে আরও একটা সরু গলিতে আমরা যাবো···।"

টিনা সেদিন সরু প্রায়-অন্ধকার গলি দিয়ে নীপাদির নির্দিষ্ট বাড়িটার সামনে এসে যখন দাঁড়ালো, তখন সে ঘেমে উঠেছে।

"এই সামান্য রাস্তাটুকু হেঁটেই ঘেমে নেয়ে উঠেছো বড়লোকের মেয়ে·!" নীপাদি পাতলা ঠোঁটদুটিকে টিপে কাঠ কাঠ হয়ে কথাটা বলে মুখ বেঁকিয়ে হেসেছিল।

সামনের বন্ধ দরজাটার কড়াদুটো ঠুকঠুক করে নাড়তে রাস্তার ধারের জানলার একটা পাল্লা খুলে আবার বন্ধ হয়ে গেল, আর পর-মুহূর্তেই দরজা খোলার শব্দ হল। প্রথমে যে ঘর, তাতে কোন লোক ছিল না। তার পেছনের ঘর থেকে স্ত্রী-পুরুষের গলা পাওয়া যাচ্ছিল। যে লোকটি দরজা খুলে দিয়েছিল, সে টিনার আপাদ-মস্তক দেখলো, তারপর একটু হেসে বললো, "এই বুঝি!" নীপাদি আস্তে করে হেসে উত্তর দিল—"হ্যাঁ।"

টিনা ভেতরের ঘরে সেদিন ঢুকেই চমকে উঠলো। শোভন বসে

আছে। ক'বছরে কত বড় হয়ে গেছে শোভন! শোভন এত লম্বা, এত সুন্দর হয়ে গেছে! কয়েক বছর আগেকার সেই মেয়েলি, লাজুক লাজুক মুখখানা এখন পুরন্ত ভারি হয়ে কেমন পুরুষালি হ'য়ে উঠেছে। দুগাল ভর্তি ছাঁটা চাপদাড়ি, উঁচু খাঁড়ার মতো নাকের নিচে গোঁফ, মাথার ওপর একরাশ অবিন্যস্ত চুল ঘাড় পর্যন্ত নামানো।

"এসো টিয়া, প্রথম দিন একটু আন-ইজি ফিল করবে, পরে ভালো লাগবে ..." শোভন হেসে ফেললো টিনার মুখের দিকে তাকিয়ে। "খুব অবাক হয়ে গেছ আমাকে দেখে, তাই না? তুমি আসবার ঘণ্টা দেড়েক আগে থেকে এখানে এসে অপেক্ষা করছি তুমি আসবে বলে ..."

"তুমি জানতে আমি আসবো ...!" টিনার কানের পর্দায় এখনও সেদিনকার বসে-থাকা পনেরো-ষোলটি ছেলেমেয়ের হাসির তোড় খান্‌খান্‌ হয়ে ভেঙে পড়ে। শোভন জোরে হাসেনি, তবে মুখখানা হাসিতে ভরে উঠছিল—"নইলে আমিও তো তোমাকে দেখে তোমার মতোই চমকে উঠতাম টিয়া ...।"

টিনা দু'কান ভরে শুনছিল শোভনের মুখে টিয়া ডাকটি। ভবানীপুরের বাড়িতে তাকে সবাই টিয়া বলে ডাকতো। মা বাবাও।

সেদিন ঘণ্টা দুয়েকের মতো টিনা ওখানে ছিল। চারদিকের দেয়ালে কালো আলকাতরায় মোটা মোটা অক্ষরে লেখা কথাগুলো প'ড়ে তার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। লেখার মধ্যে আগুন আর বন্দুক, খতম আর ধ্বংস—শুধু এই ছিল। এই ঘরের ছেলে-মেয়েগুলির কি গোটা দুনিয়ায় কোথাও কোনো বন্ধু নেই! আপনজন নেই! এরা নিজেদের নিয়ে একটা আলাদা শ্রেণী তৈরী করেছে, তাই এরা ছাড়া আর সবাই শ্রেণীশত্রু! তাই তাদের গুঁড়িয়ে দিতে হবে! পুড়িয়ে দিতে হবে!

টিনা আসবার মিনিট দশেক পরে একজন মাঝবয়সী ভদ্রলোক এলেন। টিনা দেখলো সবাই একসঙ্গে দাঁড়িয়ে তাঁকে সশ্রদ্ধ অভ্যর্থনা জানালো এবং বসতে বললো।

নীপাদি টিনার কানের কাছে মুখ এনে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললো—"অসীম মিত্র। আমাদের এই সংগ্রামের অন্যতম প্রধান কর্মীনেতা···।"

অসীম মিত্র বসেই বলতে শুরু করেছিলেন, আর সময় নষ্ট নয়, কাজ আরম্ভ কর। অপারেশন শুরু হয়ে গেছে। শ্রীকাকুলাম, ডেবরা, গোপীবল্লভপুর এবং আরও অনেক জায়গায়। হাজারিবাগের জঙ্গলে দুর্গ তৈরি করেছে আমাদেরই কমরেডরা। আমাদের সংগ্রামের পথেই এগোতে হবে। এই পথই শোষিত সমাজের মুক্তির পথ। আর দেরি নয় ···।

আরও যেন কি সব অচেনা, অজানা, অনভ্যস্ত কথা সেদিন টিনা শুনেছিল। কানে শুনেছিল, কান দিয়েই বেরিয়ে গিয়েছিল। মনে ঢোকেনি। বুঝতে পারেনি বলেই ঢোকেনি।

চলে আসবার সময় শোভন একবার কেবল গলা নীচু করে বলেছিল, "এই, তুমি অনেক বড় হয়ে গেছ, আমি এতটা ভাবিনি ···।"

টিনা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছিল, "তুমিও তাই, আমিও এতটা ভাবিনি। দাড়ি, গোঁফ রেখে নিজেকে বয়সের চাইতেও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছো এবং তোমার সে চেষ্টা সার্থক···।"

শোভন এর উত্তরে শুধু একটু হাসলো আর টিনার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলো।

মাস দুয়েক পরে খবরের কাগজে সংবাদ হয়ে বেরিয়েছিল—মেদিনীপুরে পুলিশের সঙ্গে সশস্ত্র যুবকদলের সংঘর্ষে দুজন পুলিশ নিহত, অপরপক্ষে একটি ছেলে আহত অবস্থায় ধরা পড়েছে। নাম শোভন ভট্টাচার্য। বি.ই. কলেজে সিভিল এঞ্জিনীয়ারিং-এর একটি ব্রিলিয়েন্ট ছাত্র। খবরটা পড়ে টিনা সারাদিন কারও সঙ্গে কথা বলেনি। শুধু একবার অঙ্কের মাস্টারমশাই মন্তব্য করেছিলেন—"সোনা দিয়ে তৈরি ছেলেগুলো পড়াশুনা করলো না, আন্দোলনে নেমে পড়লো। ওদের বদ্ধমূল বিশ্বাস এই ধরনের পড়াশুনো মূর্খেরাই করে এবং

র্তমানে ভারতবর্ষ মূর্খের স্বর্গ, শয়তান ও শোষণকারী বুর্জোয়ার াসস্থান। এর মুক্তি নাকি আসবে মহান দেশ চীন থেকে।" একটু থেমে মাস্টারমশাই বলেছিলেন—'হায় চীন, মাঝখান থেকে তুখোড় ছেলেগুলি অন্ধকারে ঝাঁপ দিয়ে কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে···।"

"কিছু বুঝতে পারছো, মাথায় কিছু ঢুকছে?" হাতে লাল বইটা নিয়ে প্রায়ই নীপাদি বলতো। প্রত্যেকটি কথার সঙ্গে মৃদু খোঁচা। সর্ব-শরীর জ্বলে উঠতো টিনার। কিন্তু মুখের ওপর কিছু বলতে সাহস হতো না। সন্তুদিকে সব কিছু বললে সন্তুদি মুখ বাঁকাতো—"হিংসে, ওরা নিজেদের মনের আগুনে জ্বলে পুড়ে মরছে। মুখে কেবল বড় বড় কথা। ওদের গুষ্টি-গোত্তরকে আমি চিনি। ও, ওর ভাই-বোন, -বাবা এই পৃথিবীর কাউকে ভালবাসে না, কারও ভালো চায় না। রও মুখে হাসি দেখলে ওরা জ্বলে মরে···।"

"শোভনকে ছেড়ে দেবে না?" টিনা একদিন একটু ভয়ে ভয়ে পাদিকে জিজ্ঞেস করেছিল।

"শোভনের বাবার টাকা থাকলে, শোভনের আত্মীয়স্বজন ড়লোক, এম. এল. এ, এম. পি. হলে ছেড়ে দিত···।"

"তাহলে তো পুলিশে ছুঁতোই না···।" টিনা কেমন যেন সাহস লো নীপাদির ঈষৎ ব্যঙ্গমাখানো মুখের দিকে তাকিয়ে কথাটা লতে।

"তোমার বাবাকে একবার বলে দেখবে নাকি? ডেপুটি আই. জি. তো তোমাদের ছবিঘরের নিত্য অতিথি···।"

"আপনিও তো বলতে পারেন। আপনি তো এই দুনিয়ায় উকে ভয় পান না···।" সাহস দেখিয়ে নিজের ওপর টিনার বেশ কটা শ্রদ্ধার ভাব জেগে উঠলো।

"ও সব লোকের সঙ্গে আমাদের কথা বলতে ঘেন্না করে।

আমরা বরঞ্চ সময় হ'লে বন্দুকের নল দিয়ে ওদের মুখ বন্ধ করে দেবো। ভীমরুলের চাকে আমরা একটিকেও বাঁচিয়ে রাখবো না•••।"

"এ পর্যন্ত কিন্তু একটিও ভীমরুল মারতে পারেন নি। আপনারা শ্রেণীশত্রু মনে করে যাদের নিধন করেছেন, তারা সাধারণ পুলিশ। সাব-ইন্‌স্পেক্টর, বড় জোর ইন্‌স্পেক্টর। অন্য দিকে স্কুল, কলেজের কিছু মাস্টারমশাই, যাদের হাতে ডট পেন ছাড়া আর কোন অস্ত্র থাকে না।"—টিনা হাঁপিয়ে উঠেছিল।

"আর কাউকে খুঁজে পাচ্ছো না!" নীপাদি মুখ টিপে পাল্টা প্রশ্ন করেছিল।

"পাচ্ছি, কয়েকজন খ্যাতনামাকেও মেরেছেন বই কি, আর তা ছাড়া প্রতিদিন খবরের কাগজে—আজ আটজন, কাল দশজন খুন হচ্ছে, এর মধ্যে সুদখোর আছে, আড়তদার আছে, মাঝারি গোছের ব্যবসায়ী আছে। কিন্তু•••" টিনার মুখের দিকে তাকিয়ে নীপাদি বললো—"বলো, কি বলবে বলে যাও।"

"কিন্তু পেরেছেন আপনারা বড়বাজারের কোন লক্ষপতির গায়ে হাত দিতে! পেরেছেন তাদের দু নম্বর খাতা পুড়িয়ে তাদের টাকার পাহাড় গুঁড়িয়ে দিতে! তাদের গায়ে ছুরির ডগাটুকু পর্যন্ত ছোঁয়াতে সাহস আছে আপনাদের! পেরেছেন পুলিশের কোন কর্তাব্যক্তির মাথা কাটতে! আপনারা এসব কিছুই পারেননি, পারবেনও না। আপনারা শুধু নিরীহ, সাধারণ মধ্যবিত্তদের ভয় দেখিয়ে চলেছেন, তাদের মারছেন, তাদের মূর্খ বলছেন। তাদের ছেলেমেয়েদের যাতে লেখাপড়া বন্ধ হয়, সেজন্য তাদের স্কুল কলেজ ধ্বংস করছেন। তার ফল চমৎকার। বড়লোকের ছেলেরা আরও বড় জায়গায় গিয়ে দিব্বি পড়াশুনো চালিয়ে যাচ্ছে, মাঝখান থেকে বড়লোক গরীবে আরও ফারাক হচ্ছে•••"

"তুমি থামবে কিনা" —নীপাদির চোখ দুটো জ্বলে জ্বলে উঠছিল টিনার এখনও মনে আছে।

"থেমে যাবেন আপনারা। মাঝখান থেকে শোভনের মতো

ছেলেদের মগজ ধুইয়ে দিয়ে তাদের বোকা বানিয়ে ছাড়লেন। তারা নিজেদের একেবারে ভুলে গেল।"

"তুমি থামো টিনা, যা বোঝ না, যে দর্শনের ধারে কাছে পর্যন্ত ঘেঁষবার অধিকার নেই, সে বিষয়ে কোন বিচার বিশ্লেষণ তোমার কাছ থেকে শুনবো না।"

"অন্যের কথা শোনার মতো মানসিকতা থাকলে তো আপনারা শুনবেন নীপাদি ..." শোভনের খবরে টিনার মাথাটা সেদিন কেমন যেন হয়ে গিয়েছিল।

শোভনের বাবা ছুটে এসেছিল টিনার বাবার কাছে। "একবার বলুন আপনি এস. রয়কে। ছেলেটাকে মেরে মেরে আধমরা করে ফেলেছে" —শোভনের বাবার শীর্ণ মুখে ক্লান্ত কোটরাগত চোখদুটি জলে ভরে উঠেছিল—"ওর মাও যে শয্যা নিয়েছে।"

টিনার মনে আছে বাবা অত্যন্ত মহৎপ্রাণ হয়ে মিষ্টি করে বলেছিল, "সে কি! শোভনের মতো হীরের টুকরো ছেলে পুলিশের হাতে মার খাচ্ছে! ঠিক আছে, আমার যতদূর সম্ভব যা করার করবো। আপনি বাড়ি যান, আর"—বাবা একটু নীচু গলায় বলেছিল, "এসব কথা যেন পাঁচকান না হয়। আপনিও আর আমার এখানে আসবেন না। দেখছেন তো কি দিনকাল। পাড়ার ছেলে ছোকরাগুলো এর অন্য মানে করবে।"

শোভনের বাবা গর্তেঢোকা চোখদুটিকে আশার আলো ভরে চলে গিয়েছিল।

টিনা সেদিনই বুঝতে পেরেছিল বাবা কিছুই করবে না। বাবা এস. রয়কে কিছুই বলেনি, বলবে না। বাবা বলতে পারে না। বাবা এখন নিজের কাজ নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত। বাবা এখন কোলকাতার অন্যতম ব্যস্ত ব্যবসায়ী।

"নীপাদির বরের নাম কি? কাকে বিয়ে করেছে···!" টিনার কৌতূহল দেখে কমলা খাস্তগীর উল্লসিত হলেন—"তবে নাকি তুমি বাড়ি যাওয়ার জন্যে ছটফট করছিলে! বাবা, সব মেয়েমানুষেরই এক রা"—কমলা খাস্তগীর নিজের মনে একটু কথা বলে নিলেন।

"বরের নাম তো বললো অরুণ না বরুণ কি যেন একটা, ঘরটা ভাড়া নিয়েছে নিজের নামে। বললাম তো ওরা মন্ত্রপড়া স্বামী-স্ত্রী কিনা আমার সন্দ আছে····"

"নীপাদির সঙ্গে একটু দেখা করে যাই না কেন, অনেক দিন দেখা হয় নি ·।"

কমলা খাস্তগীর গালে হাত দিয়ে একটু হেসে বললেন, "সে গুড়ে বালি। ওরা দু'জন কি সহজে ঘরের দরজা খোলে! বাইরে কখন যাবে, না যখন রাস্তায় লোকজন থাকবে না, এমনি বে টাইমে; নইলে ঠাণ্ডা তো বেশ পড়েছে বাপু, আর ওরা কিনা বেড়াতে গেল সন্ধের মুখে! ঐ জন্যেই তো আমার সন্দ ওরা বিয়ে করেনি···।"

ঠিক এই সময়েই বন্ধ কাঁচের দরজার সামনে জুতোর শব্দ হল, দরজার গায়ে মৃদু আঘাতে কমলা খাস্তগীর ছুটে গেলেন, চোখ মটকে ইশারা করে টিনাকে জানিয়ে দিলেন 'ওরা' এসে গেছে।

দরজা খুলতেই টিনা তাকিয়ে দেখলো নীপা আর তার বরকে। টিনা তাকে চিনতে পারলো। সরু গলি দিয়ে একদিন নীপা টিনাকে নিয়ে যে বাড়িটাতে গিয়েছিল, সেই বাড়িতে যে লোকটি দরজা খুলে দিয়েছিল—সে।

টিনা লক্ষ্য করেছিল সেদিনকার সভাতে এই লোকটিই সবচাইতে সোচ্চার ছিল। তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত বিপ্লবের আগুন জ্বলছিল। ঘুষি পাকিয়ে মাটিতে ঠুকে ঠুকে ঝাঁঝালো গলায় বলেছিল—"খতম অভিযান চালিয়ে যেতে হবে; শ্রেণীশত্রু শেষ করে তবে অন্য কাজ!"

দলের অধিপতি সেই মাঝবয়সী ভদ্রলোক অসীম মিত্র একবার বলেছিলেন—"শুধু খতম করলেই তো হবে না অরুণ, একটা স্থির প্রোগ্রাম চাই, আগে সেইটে ঠিক কর···।"

অরুণ মাথা ঝাঁকিয়ে বলেছিল, "যা অবস্থা, আর ধৈর্য ধরা যাচ্ছে না অসীমদা···যা হোক, একটা কিছু বলে দাও কি করবো···উঃ, আমার তো সব সময় হাত নিস্‌পিস্‌ করছে···।"

টিনা লক্ষ্য করেছিলো অরুণের প্রত্যেকটি জ্বলন্ত কথায় নীপাদি মিষ্টি করে সায় দিয়ে যাচ্ছিল। এমনকি দুজনের ঘন ঘন দৃষ্টি বিনিময়টুকু পর্যন্ত টিনার চোখ এড়ায়নি। সেদিন টিনার খুব মজা লেগেছিল। আজকেও মজা লাগলো।

"তাহলে নীপাদি, শেষ পর্যন্ত অরুণদাই আপনার শ্রেণীশত্রু, তাকে খতম করলেন ।"

অরুণ জোরে হেসে উঠলো। মুখ কালো হয়ে গেল নীপাদির— "কেন, আমাদের মতো গরীব সমাজে বিয়ে করাটা বুঝি অপরাধ···।"

"ছিঃ, নীপাদি, আমি তো ঠাট্টা করছি। ঠাট্টা করবার মতো আমার বয়স হয়েছে তো, হয়নি···?"

"তোমাদের মতো রাজনন্দিনীদের আবার বয়স বাড়ে নাকি! তোমাদের যেটা বাড়ে সেটা হল টাকা আর সোনা। তোমরা তো চিরখুকী। তোমাদের সমাজে মা, মেয়ে, ঠাকুমা, পিসীমা—সব তো একবয়সী ··।"

টিনা খিল্‌খিলিয়ে হেসে উঠলো—"ও সব কথা থাক নীপাদি, কেমন আছেন বলুন। কবে বিয়ে করলেন! খুব ফাঁকি দিলেন যা হোক·· !"

"ভালো আছি, খুব ভালো আছি। তুমি অত বড়লোক হয়ে যেখানে বেড়াতে এসেছো, বরফ দেখছো, প্রকৃতির শোভায় মুগ্ধ হচ্ছো, আমরা গরীব হোলেও ঠিক সেই দেশে এসে একই সৌন্দর্য ভোগ করছি, শান্তির সঙ্গে আনন্দ করছি···।'

"সত্যি, আপনাদের দেখে খুব সুখী সুখী লাগছে···"

"কেন, সুখটা কি কেবল বড়লোকদের দোর ধরা, আমাদের কাছে আসতে ভয় পায়···?"

"শোভনের খবর কি নীপাদি · !"

"এখনও জেল থেকে ছাড়া পায়নি। খুব সম্ভব বহরমপুর জেলে আছে ···।"

"খুব সম্ভব! কেন, ঠিক ঠিক খবর বুঝি আর রাখেন না···!"

"অকারণ কথার ঝাঁজ দেখিও না টিনা। শুধু একা শোভন নয়, ওর মতো আরও অনেক ছেলে এখন জেলে আছে, মার খাচ্ছে, তবু ওদের সম্বন্ধে এখন আর আমাদের কিছু করবার নেই···"

"কেন নীপাদি, আপনাদের কিছু করবার নেই কেন···?"

"সুযোগ নেই···।"

"সুন্দর, নীপাদি, খুব সুন্দর।···শোভনের মা মারা গেছেন। শোভনের বাবা সব কিছু ছেড়েছুড়ে এখন অকালে বৃদ্ধ। আর শোভনের মতো ছেলেরা, যারা নিজেদের সবকিছু ভবিষ্যৎ বিসর্জন দিয়ে আদর্শকে আঁকড়ে ধরলো, তারা এখন জেলে আছে, মার খাচ্ছে, শুখিয়ে যাচ্ছে। তাদের সম্বন্ধে আপনাদের এখন কিছু করবার সুযোগ নেই। আপনারা এখন সুখী স্বামী-স্ত্রী হয়ে বরফ-দেশের সৌন্দর্য ভোগ করছেন···!"

"বলিহারি টিনা, খুব তেজালো বক্তৃতা রপ্ত করেছো। মনে হচ্ছে সুখী স্বামী-স্ত্রীকে দেখে তুমি যেন কেমন নিজেকে অসুখী বোধ করছো···!"

"ঐ কথা ভেবেই তো আবার আপনার সুখ নীপাদি, তবে নিশ্চিন্তে থাকুন আপনাদের সুখ নিয়ে আমার মনে কোন জ্বালা নেই। আমি এতক্ষণ অপেক্ষা করেছি শুধু শোভনের খবরটুকু পাওয়ার জন্য···।"

"তা তোমার বড়লোক বাবা ইচ্ছে করলেই তো শোভনকে জেলখানা থেকে মুক্ত হাওয়ায় নিয়ে আসতে পারে ···।"

"পারলেই তো সব সময় সুযোগ হয় না নীপাদি··" টিনা বুঝতে পারছিল ওর গলা ধরে আসছে। চোখ দুটি ডব্‌ডবিয়ে উঠ্‌ছে ·।

"যাকগে, হেঁটে ক্লান্ত লাগছে। তার ওপর আবার তোমার কথার ঝাঁজ। অরুণ তো ঘরেই ঢুকে পড়েছে···।"

"ঘর ছাড়া অরুণদা আর কোথায়ই বা ঢুক্‌বে!"

"বাব্‌বা, তুমি যে দেখছি কথার তোড়ে আমাদের তাড়িয়ে ছাড়বে ···।'

এতক্ষণ কমলা খাস্তগীর মনপ্রাণ উজ্জ্বল করে দু পক্ষের কথা কাটাকাটি শুনছিলেন। সকালে কার মুখ দেখে আজ ঘুম ভেঙেছিল কে জানে। সন্ধ্যাবেলাতেও ভাবা যায়নি রাত্রিবেলা এমন সুন্দর ঘটনা ঘটবে।

"চুপ কর, দু'জনেই চুপ কর। কি সব ছেলেমানুষী! চল তোমাকে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে আসি, চল" ··

কমলা খাস্তগীর চোখ টিপে টিনাকে বসতে বলে দীপার হাত ধরে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। পাশের ঘরের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে ফিসফিস করে বললেন—"বেশ করেছো বড়লোক বাপের মানী কন্যার পেটে লাথি মেরে। ওরা ভাবে ওদের টাকার গুমোরে পৃথিবী টলছে। ওরে আমার ধনী কন্যারে···! আমার বাড়ির চেয়ারে যেন বসতেই পারছে না। এসে তক্‌ কেবল উঠি উঠি করছে ··।"

নিজের ঘরে ফিরে এসে দেখেন টিনা খাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছে। আগুনের আঁচে ফর্সা মুখটা লাল দেখাচ্ছে। একগাল হেসে কমলা খাস্তগীর টিনার হাত ধরে আবার চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে নীচু গলায় বললেন, "দিয়েছি ওদের আচ্ছা করে কথা শুনিয়ে। ওরা সমাজের কোন্‌ তলায় বাস করে আর তুমি কোথায়। আমি তাই বল্‌লাম "জায়গা বুঝে, লোক বুঝে তবে খড়্‌খড়্‌ কোরো। ঘুপ্‌চি ঘরের মেয়ে হয়ে অত ঘাড় উঁচু করতে যেও না···।"

টিনার চোখদুটি ততক্ষণে জলে ভরে উঠেছে। শোভন এখনও জেলে। ওদের দলের লোকেদের আর কিছু করবার সুযোগ নেই। শোভন যে একেবারে মিলিয়ে গেল, একথা তো কই একবারও কেউ চিন্তা করলো না। মানুষের মনের বুঝি এই নিয়ম···!

"তুমি অনেক বড়ো হয়ে গেছ টিয়া, আমি এতটা ভাবিনি···।"

সেদিন শোভনের মুখে এই কথা শুনে কত রাত পর্যন্ত টিনা ছটফট করেছিল। শোভনের চোখদুটো আরও কত কি বলছিল।

টিনার সেদিন বাড়ি ফিরে মন কেমন করছিল। শোভনকে তো আর ইচ্ছে করলেই দেখা যাবে না। আর আশ্চর্য, তার পরের দিন সকাল আটটা নাগাদ একটা ফোন এসেছিল টিনার কাছে। টিনা হাল্কা সুরে 'হ্যালো' বলতে ওপাশ থেকে গলা ভেসে এসেছিল—"টিয়া, আমি শোভন।"

"শোভন! আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। তুমি আমাকে কোন্ দরকারে ফোন করছো শোভন···!"

"টিয়া, কাল সমস্ত রাত শুধু তোমাকে ভেবেছি। কতদিন পরে আমাদের দেখা হল টিয়া। জানো টিয়া, তোমাকে আমার আরও অনেক বার দেখতে ইচ্ছে করছে। টিয়া, তুমি অনেক বড় হয়ে গেছ আর···"

"আর কি শোভন—!" টিনার নিশ্বাস আটকে এলো—।

"আর অনেক সুন্দর হয়েছো—"

টিনা কোন উত্তর দিল না।

"এই—চুপ করে আছ কেন!" শোভন অস্থির গলায় বলে উঠেছিল।

"কি বলবো, শোভন—।" টিনা তখন মনে মনে বলছে, আমারও যে তোমাকে অনেকবার দেখতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু বড় ভয় করছে শোভন—

"আমি কিছু বলতে পারছি না শোভন--।"

"তবে থাক টিয়া, জোর করে কিছু না বলাই ভালো—" ওধারে রিসিভার রেখে দেওয়ার শব্দ হল। শোভন টেলিফোন ছেড়ে দিল।

টিনা জানালার কাছে এসে দাঁড়ালো। নীচের দিকে তাকিয়ে দেখলো বাবার দুখানা গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। গাড়ির ভেতর থেকে অনেক কিছু জিনিসপত্র নামিয়ে নিচ্ছে বেয়ারা রাজেন আর বাবুর্চি

আবছুল। সামনে দাঁড়িয়ে আছে মিস্টার সিন্‌হা। টিনা বুঝতে পারলো আজ রাত্রিবেলা ওপরের ছবিঘরে মহোৎসব। বাবা-মা ব্যস্ত থাকবে। ব্যস্ত থাকবেন মিস্ ভার্মা। শহরের গণ্যমান্যরা বিরাট ঝক্‌ঝকে গাড়ি থেকে নিঃশব্দে নেমে আসবে, অতি নীরবে ওপরে উঠে যাবে, তারপর যে যার চেয়ারে বসে সামনের পর্দায় ফুটেওঠা ছবির দিকে তাকিয়ে সারা শরীর দোলাবে—।

—টিনার হঠাৎ কেমন রাগ হয়ে গেল। ইচ্ছে হল একরাশ দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে ছুঁড়ে দেয় মিসেস খাস্তগীরের পাশের ছোট ঘরে হুই বিপ্লবী স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য-আলাপ-মুখরিত বিছানায়।

কমলা খাস্তগীরের বাড়ি থেকে যখন টিনা বেরিয়ে এলো তখন অনেক বেজে গেছে। টিনার এত দেরি কখনও হয়নি। শীতের দেশ, সন্ধ্যের পরেই মনে হয় নিশুতি রাত।—

কমলা খাস্তগীর গেট খুলে দিয়ে টিনার একখানা হাত টেনে নিয়ে ফিসফিসিয়ে বললেন— "কালকে আশা করছি অনেক মজার খবর দিতে পারবো! বিকেল হবার আগেই চলে এসো—।"

"আজকে বড় রাত হয়ে গেল—" টিনার কথা থামিয়ে দিয়ে কমলা খাস্তগীর গালে হাত দিয়ে অবাক হয়ে বললেন, "ও মা, দেরি আবার কি! বেড়াতে এসে আবার এটুকু দেরিকে কি কেউ দেরি বলে! এখানে তো আর স্কুলের রুটিন নেই, যেমন খুশি গল্প করবে, হাসবে, আড্ডা মারবে—"

"মিস ভার্মা কি ভাববেন—।"

"আরে রেখে দাও, কেবল মিস ভার্মা, আর মিস ভার্মা। পরের পয়সায় এমন জায়গায় এসে তিনি তো এখন প্রজাপতির মতো পাখা-মেলে উড়ে বেড়াচ্ছেন। আজকে ফিরতে কত রাত হয় দেখ—"

টিনা কমলা খাস্তগীরের কথা শেষ হবার আগেই রাস্তা পার হয়ে হোটেল ডন-এর গেট ঠেলে ঢুকে পড়েছিল। নাকে ইউক্যালিপটাসের

গন্ধ ভেসে এলো। শীতটা যেন ক্রমেই কনকনিয়ে উঠছে। চোখ পড়লো হোটেল ডন-এর সুসজ্জিত লাউঞ্জের দিকে। পর্চের নীচে দাঁড়িয়ে মিসেস ক্লার্ক একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছেন। টিনাকে দেখে একটু হাসলেন, ভেতরে আসতে বললেন। টিনা ভেতরে দেখলো জনাকয়েক ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা ফায়ার প্লেসের সামনে বসে আছে। চারজন তাস খেলছে। বাকিরা দেখছে। দুজন দুখানা ইংরেজী ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাচ্ছে। আফটার ডিনার রিল্যাকজেসন।

হোটেল ডন-এর লাউঞ্জটি একেবারে মিড-ভিক্টোরিয়ান স্টাইলে সাজানো। মোটা মোটা ভারী ভারী কোচ, সেটি। সব কটা ফার্নিচার কালো কাঠের পালিশ করা। দেয়ালে দুখানা বড় বড় অয়েল কালারের ছবি। দুখানাই নৈসর্গিক দৃশ্য। অবশ্যই বিদেশী। একটি লম্বা প্যানেলে আঁকা 'লাস্ট সাপার'। যীশু খ্রীষ্টের মুখখানা বড় কোমল, বড় করুণ। দুপাশে বারোজন শিষ্যের মুখে বারো রকম অভিব্যক্তি। ঘরের পশ্চিম দিকের দেয়ালে গাছের গুঁড়ির ডিজাইনে তৈরী কালচে বার্নিশ করা টুলের ওপর দাঁড় করিয়ে দেয়ালে আটকে দেওয়া হয়েছে আরেকখানা লম্বা সরু ছবি। একটা মাত্র চেরি গাছের ডাল, ফুল ফুটে আছে। ডালের ওপর বসে আছে দুটি ছোট্ট পাখি, টিনার দৃষ্টিতে ছবিখানা অসাধারণ। ছবিটার দিকে তাকালেই টিনার মনে হয় চারদিক ফুলে, পাতায় সাজানো একখানা সম্পূর্ণ বাগান, একটি জাপানী বাগান। ছবিখানা সত্যিই একজন জাপানী শিল্পীর আঁকা, একবার এখানে বেড়াতে এসেছিলেন। মিসেস ক্লার্কের ব্যবস্থাপনায় খুশি হয়ে ছবিখানা উপহার দিয়ে গেছেন।

আরেকখানা মজার ছবি আছে লাউঞ্জ আর পর্চের মাঝে লম্বা ফালি মতো জায়গায় রিসেপসনিস্টের অফিসের দেয়ালে। মিসেস ক্লার্কের ছবি। হাতে আঁকা। মিসেস ক্লার্ক হাসিমুখে সস্নেহ চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে চেয়ারে বসে আছেন। সামনে দাঁড় করানো ইজেলের গায়ে তুলি বুলনোর ভঙ্গীতে একটি হাস্যমুখ ছেলে। ইজেলের পর্দায় মিসেস ক্লার্কের অর্ধসমাপ্ত ছবি। মুখখানা সম্পূর্ণ

আঁকা, বাকিটা কয়েকটি আঁচড় মাত্র। মিসেস ক্লার্ক খুব খুশী মুখে বলেছিলেন একবার কোলকাতা আর্ট কলেজের কিছু ছাত্র-ছাত্রী এসে উঠেছিল হোটেল ডন-এ। এক সপ্তাহ ছিল। ভোর হতেই যে যার তুলি রং কাগজ ঝোলায় ভরে নিয়ে বেরিয়ে পড়তো প্রকৃতির আনাচে কানাচে বসে ছবি আঁকবার জন্য। দুপুরবেলা রাস্তার ধারে যে-কোন একটা হোটেল বা খাবার দোকানে লাঞ্চ সেরে নিত। বিকেলবেলা ওরা হোটেলে ফিরে আসতো। সন্ধ্যের পর ওরা লাউঞ্জটাকে আনন্দমঞ্চ করে তুলতো। রাত এগারোটা-সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত চলতো ওদের নাচ, গান, বাজনা, আবৃত্তি আর অভিনয়। সমস্ত বোর্ডাররা হতেন দর্শক আর প্রতিদিন মিসেস ক্লার্ককে হোতে হোত চীফ গেস্ট। শত কাজ থাকলেও ছেলেমেয়েগুলো শুনতো না। তাদের অনুমতি মিললে তবেই মিসেস ক্লার্ক তাঁর চেয়ার ছেড়ে যেতে পারতেন।

"ওরা বলে গিয়েছিল আবার আসবে, কই এলো না তো"—মিসেস ক্লার্ক টিনাকে এই দুঃখটা বার বার জানিয়েছেন।

"জান টিনা, ওরা যে কদিন ছিল, হোটেলে আলোর জোর বেড়ে গিয়েছিল। রাত বারোটা পর্যন্ত হোটেলটা যৌবনের জয়গান গাইতো—।"

মিসেস ক্লার্ক অন্যমনস্ক হয়ে যেতেন। ছেলেমেয়ে দুটো কোথায় আছে, কেমন আছে—!

ফায়ার প্লেসের একপাশে ছিলেন কল্যাণ সোম আর তাঁর স্ত্রী। কল্যাণ সোম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক। দামী এবং নামী অধ্যাপক। অধ্যাপনার বাইরে উনি আবার কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগ পরিষদের মাননীয় উপদেষ্টা। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর নতুন নতুন গবেষণা, তথ্য ও চিন্তা সরকারী মহলে নতুন পথের সন্ধান দেয়। মানুষের কর্মপ্রচেষ্টাকে কোন্ নীতির মাধ্যমে, কোন্ পথে চালনা করলে ভারতবর্ষের মতো বিশাল দেশে বেকারী সমস্যা ঘুচে গিয়ে সকলের কর্মসংস্থান হবে, গরীব ভারতবর্ষের সংখ্যাহীন ভারতবাসী

মানুষের ন্যূনতম চাহিদা ভাত কাপড়ের যোগাড় করতে পারবে তা নিয়ে কল্যাণ সোমের চিন্তার সীমা নেই। মানুষকে কাজ করতে হবে। কোনো দেশেরই কাজ ছাড়া গতি নেই। তবে প্রত্যেক কাজে ডিগনিটি থাকবে, যেটা আমাদের এখানে একেবারে নেই। সব রকম কাজকে সম্মান করতে হবে। এই ভারতবর্ষে উঁচু মহল থেকে একেবারে নীচু মহল পর্যন্ত যে বোধটির একান্ত অভাব সেটি হল ডিগনিটি অব লেবার। আর সেজন্যই সমাজে এত শ্রেণীভেদ, এত বৈষম্য, এত দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ। সেইজন্যেই যে ছেলে কোনরকমে স্কুল ফাইনাল পাস করল কি করল না, সে রাইটার্সে বা কোন অফিসে চেয়ারে বসে টেবিলে ফাইল খুলে কাজ করতে চায়। ক্ষমতা নেই জেনেও সে ঐ কাজ করবে, এবং বলাই বাহুল্য কোন কাজই সে পারবে না, অতএব কাজে ফাঁকি, কুঁড়েমি, কাজ না করার সমস্যা। আর এই ভাবেই জাতির চরিত্র নষ্ট হয়ে গেছে। ফল—গোটা সমাজে স্তূপাকৃতি সমস্যা। তাই ভারতবর্ষের জীবন পোকায় খাওয়া, পেঁচোয় পাওয়া।

"আমি বলছি না বাড়ির মালিক তার দাসদাসীকে দেখলে উঠে দাঁড়াবে বা এক টেবিলে বসিয়ে কফি অফার করবে। অত উঁচু স্ট্যাণ্ডার্ডে এখনও আমাদের দেশ ওঠেনি। জীবনের মানের দিক থেকে আমরা অত পারফেকশনে পৌঁছাইনি, তবু তাদের কাজকে সম্মান জানিয়ে, তাদের মানুষ মনে করতে হবে, হেসে কথা বলতে হবে।"

আশ্চর্য উদার, সুন্দর, শিক্ষিত সজ্জন এই কল্যাণ সোম। মিসেস ক্লার্কের বড় পছন্দের ভদ্রলোক। "আ ডিসেন্ট জেণ্টলম্যান উইথ অ্যান আইডিয়াল হার্ট।"

"বুঝলে টিনা, অটামের বাতাস বইতে শুরু করা মাত্র ডক্টর সোমের চিঠি এসে গেল, ওঁদের ঘরটা যেন ঠিক থাকে। রুম নাম্বার ফোর। পূবে পশ্চিমে খোলা, হোটেলের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘর। তার এটাচ্‌ড্‌ ড্রেসিং রুম ও বাথরুমের ব্যবস্থা একেবারে আধুনিক।

সামনে ঝুলন্ত প্রশস্ত ব্যালকনি, পুরু কাঁচের জানলা দিয়ে ঢাকা। প্রায় সিলিং থেকে নীচে কার্পেট পর্যন্ত পুরু পর্দা ঝোলানো। মোটা গদি আঁটা, কুশন দেওয়া একটা সম্পূর্ণ সোফা সেট। দুখানা ডেক চেয়ার। একপাশে একটি রাইটিং টেবল, তার সামনে চেয়ার। সামনের দেয়ালে টেবিলের প্রায় কাছে একটা নীচু আলো। ব্যয়বহুল বিশ্রাম ঘর। বড় আরামের। বড় রমণীয়। অধ্যাপক সোমের বহুদিনের অভ্যেস রাত বারোটা পর্যন্ত জেগে লেখাপড়ার কাজ করেও ভোরে ঠিক সাড়ে পাঁচটায় শয্যা ত্যাগ করা। পর পর দু কাপ কফি, একখানা বিস্কুট খেয়ে আবার কাজে বসা। তবে তার আগে তিনি আকাশের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে কয়েক মিনিট তাকিয়ে থাকেন। চোখ দুটি টানটান করে তাকান। বারকয়েক বুক ভ'রে নিশ্বাস টেনে নেন, আবার বুক খালি করে দেন। বালিগঞ্জে নিজের বাড়িতে দোতলার সামনের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে এইটুকুন অধিকার ভোগ করার ভাগ্য অধ্যাপক সোমের আছে। এই বরফের দেশটাতে এলে সেই ভাগ্যের সীমানা অনেকখানি বেড়ে যায়। ঘনসন্নিবিষ্ট পাইন ইউক্যালিপটাস গাছের ফাঁকে ফাঁকে সাদা বরফের টানা দেয়াল, তার পেছনে নানা রঙের ছোপ মাখানো ভোরের আকাশ অধ্যাপক সোমের প্রাণমন ভরিয়ে দেয়। ঈশ্বরের অস্তিত্ব তিনি কোনদিন স্বীকার করেন নি। কিন্তু আজ কিছুদিন ধরে কেন জানি মনে হচ্ছে অতি-প্রাকৃত একটা কিছু আছে, নইলে আকাশে, পাহাড়ে, গাছে এত বাহার খুলতো না, জগতে এত বিস্ময় থাকতো না, মানুষ বুদ্ধির চরমে উঠেও প্রায়ই থৈ হারিয়ে, দুর্বল হাত বাড়িয়ে অবলম্বন খুঁজে খুঁজে ফিরতো না।

"মিসেস সোম কিন্তু ওঁর স্বামীর চাইতে বয়সে অনেক ছোট, মানে, আমার তো মনে হয়—" টিনার সকৌতূহল প্রশ্নে মিসেস ক্লার্ক হেসে ফেলেছিলেন, "শুধু তোমার কেন, আমার তোমার সকলেরই মনে হয়। মিসেস সোম তো ডক্টর সোমের চাইতে বয়সে অনেকটা ছোটই, অন্তত তিরিশ বছরের ছোট। এখন যদি

ডক্টর সোমের বয়স হয়, ধর ছাপ্পান্ন, মিসেস সোমের বয়স বড় জোর ছাব্বিশ-সাতাশ, মাত্র দেড় বছর হল বিয়ে হয়েছে—"

"দেড় বছর।" টিনা বিস্ময়ে চম্‌কে উঠলো, "পঞ্চাশের ঘরে বছর কয়েক কাটিয়ে তবে ডক্টর সোম বিয়ে করেছেন!"

মিসেস ক্লার্কের মুখখানা বিষণ্ণ থমথমে দেখালো, বিষণ্ণ কণ্ঠেই ধীরে ধীরে বললেন, "ডক্টর সোমের মতো লোককে সবরকম শ্রদ্ধা করেও এইখানটাতে হোঁচট খেয়ে যাই। জানো টিনা, ডক্টর সোম প্রথম যে বছর পুজোর সময় এলেন, আমাদের হোটেল ডন সে বছরেই সামারে প্রথম স্টার্ট করেছিল। সঙ্গে ছিলেন মিসেস অপর্ণা সোম, কাগজের মতো সাদা গায়ের রং, ফিনফিনে শরীর, বড় বড় দুটি চোখে পুরু কাঁচের চশমা, পরে জেনেছিলাম মাইনাস টোয়েন্টি পাওয়ার অর্থাৎ চশমা খুলে ফেললে সব ঝাপসা অন্ধকার। ওদের সঙ্গে ছিল একমাত্র সন্তান আনন্দ, বছর কুড়ি বয়স, বাপের মতো বুদ্ধিদৃপ্ত মুখ, মায়ের মতো ফর্সা, স্বভাবে চঞ্চল লেখাপড়ায় দারুণ ভালো, ইংলিশে অনার্স নিয়ে সেবার বি.এ. পরীক্ষা দিয়েছে, এর পরেও আনন্দ আরেকবার মা-বাবার সঙ্গে এখানে এসেছিল। তখন আনন্দ ছিল এম. এ. ক্লাসের ছাত্র, তারপর আর আসেনি। কোনদিনই আসেনি।"

মিসেস ক্লার্ক একটু চুপ করে থেকে আবার বলতে শুরু করেছিলেন এবং পুরো গল্পটা বলেছিলেন। গল্প নয়, একটি পুরো ঘটনা—।

"জানো টিনা, অপর্ণা গান গাইতো ঝিরঝির ঝর্ণার মতো। ওর চঞ্চল, মিষ্টি, তরতাজা স্বভাবে চারপাশের সবাই মেতে উঠতো। নিত্য নতুন রঙের শাড়ী ব্লাউজ পরে বাগানে, লনে ঘুরে বেড়াতো, গলায় সুরের লহরী খেলে যেতো। ওকে আমি বলতাম নাইটিঙ্গেল, মিসেস দয়াল ডাকতেন স্যুইট পী। পরপর চারবছর স্বামী-স্ত্রী দুজনে এখানে এলেন। প্রায় এক মাস করে থাকলেন। তবে শেষ যেবার এলেন, অপর্ণা সোমকে মনে হয়েছিল যেন আরো সাদা আর

রুগ্ন। সদা হাসমাখানো মুখে একটু কেমন যেন ছাড়া-ছাড়া ভাব। জিজ্ঞেস করলে হেসে বলেছিল—বয়স হচ্ছে, গত বছরের দিনগুলো তো গত বছরেই শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছে। জগতের এই তো নিয়ম—

"কেমন যেন লেগেছিল কথাগুলি। প্রথম বছরে, প্রথম পরিচয়ে ওর সে স্বভাবকে চিনেছিলাম, তার সঙ্গে অপর্ণার এই চেহারাটা একেবারে মিললো না।

"এর পর বছর তিনেক ডক্টর সোম এখানে এলেন না। আমাদের কোন চিঠি দিলেন না। ভেবে নিলাম পুজোয় আর কোথাও যাচ্ছেন, আবার যেদিন ইচ্ছে হবে এখানে আসবেন। তাই-ই হল।"

মিসেস ক্লার্ক হঠাৎ একেবারে চুপ করে গেলেন। টিনার মনে হল উনি ভেতর থেকে ঠেলে আসা কি যেন একটা চাপতে চাইছেন। টিনা জিজ্ঞেস করলো, "আন্টি, আপনার কি শরীর খারাপ লাগছে?"

"না, টিনা, শরীর নয়। কিছুক্ষণের জন্য গলার ভেতরটা কেমন যেন চেপে গিয়েছিল। তারপর গল্প শোন। গত বছর পুজোর মাস দুয়েক বাকী থাকতে একখানা চিঠি এলো। সোম আসছেন সস্ত্রীক। এই হোটেলে উঠবেন। বেস্ট স্যুইটখানাই যেন থাকে।

"খুশি হলাম। খুশি হলেন মিসেস দয়াল। অপর্ণার গান, গল্প, হাসি, আনন্দ মিসেস দয়ালের শূন্য মনে আলো জ্বালাবে। পুজোর ঠিক আগে আবার একখানা চিঠি এলো, ওরা আসছেন। চিঠিতে আসবার দিন এবং সময় জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখানে এসে লাঞ্চ নেবেন। ট্রেন থেকে নেমে আবার ট্যাক্সীতে পাহাড়ে রাস্তা পঞ্চাশ মাইলেরও একটু বেশী, সুতরাং শরীর ক্লান্ত থাকবে, বিশ্রামের দরকার।

"ওঁদের স্যুইট ঠিক রইলো, হোটেলের মধ্যে সেরা স্যুইট, সারাদিন সূর্যের ঝলমলে আলোয় সে গরম হবে। সারা রাত সে উষ্ণতায় আরাম দেবে।

"বেলা দশটা বাজার একটু পরেই গেটের সামনে একটা ট্যাক্সী এসে দাঁড়ালো। ছুটে গেলাম, অপর্ণাকে নিজের হাতে গাড়ি থেকে নামাবো। ডক্টর সোম নামলেন। আমাকে দেখে হাসিমুখে মাথা ঝাঁকিয়ে শুভেচ্ছা জানালেন। হাত দিয়ে গাড়ির দরজা ধরে থাকলেন অপর্ণা নামবে। আর তক্ষুনি, জানো টিনা, সেই মুহূর্তে আমি বিদ্যুতের চাবুক খেলাম। সম্বিৎ ফিরে পেলাম কয়েক সেকেণ্ড পরে। আর বিস্ময় নয়, এবার ভদ্রতার মুখোশ আঁটতে হল এবং হাত বাড়িয়ে দিতে হল যখন ডক্টর সোম পরিচয় করিয়ে দিলেন— আমার স্ত্রী কুমকুম!"

"আমার অভিভূত চেহারা ডক্টর সোমের নজর এড়াতে পারেনি। বললেন, অর্পণা মারা গেছে, গত ডিসেম্বরে। শেষ দেড় বছর শয্যা-শায়ী ছিল, চোখে কোন দৃষ্টি ছিল না।"

"আমি ততক্ষণে হোটেলের ম্যানেজার হিসেবে কাজ শুরু করে দিয়েছি। মিসেস সোমকে সাদর অভ্যর্থনা জানালাম। বেয়ারাদের ডেকে ওদের নির্ধারিত ঘরে মালপত্র তুলে গুছিয়ে দিয়ে আসতে বললাম। মিসেস কুমকুম সোমের দিকে তাকিয়ে হেসে জিজ্ঞেস করলাম, "আসুন, রাস্তায় কোন অসুবিধে হয়নি তো?" যা যা করণীয় সব করলাম, শুধু আমার গলার কাছে কি যেন একটা অনেকক্ষণ আটকে রইলো। অপর্ণার ফুরফুরে সাদা শরীরটা আমার মনের আনাচে কানাচে ঘোরাফেরা করতে থাকলো।"

"অপর্ণা সোম মারা যাবার কত দিনের মধ্যে ডক্টর সোম বিয়ে করলেন!"

টিনার সকৌতূহল প্রশ্নের উত্তরে মিসেস ক্লার্ক একটু হাসলেন। তারপর বললেন, "টিনা, তুমি যত বড় হবে ততই বুঝতে পারবে পৃথিবীতে কত বিচিত্র জীব এই মানুষ। এরা বুদ্ধি দিয়ে যুক্তি তৈরী করে, তারপর সবকিছু কাজ করে, সব ঘটনা ঘটায়। কুমকুম সোমই সেবার কথায় কথায় আমাকে বলেছিল তাদের বিয়ে হয়েছে সাত মাস। তার মানে অপর্ণার মৃত্যুর পর ডক্টর সোম কোনমতে মাস

অনেক বিপত্নীক জীবন কাটিয়েছিলেন, তারপরেই আবার দপত্নীক হয়েছিলেন।"

একটু থেমে মিসেস ক্লার্ক বললেন, "তোমাদের শহর কোলকাতায় এই বিয়ে নিয়ে বুদ্ধিজীবী মহলে প্রচুর কথা উঠেছিল।"

"কেন, স্ত্রী মারা যাবার পর দ্বিতীয়বার বিয়ে তো অস্বাভাবিক নয়। আর আন্টি, এতদূরে থেকে আপনি কি করে কোলকাতার বুদ্ধিজীবীদের কথা শুনতে পেলেন?" টিনা হাসিমুখে চোখ বড় বড় করে তাকালো।

মিসেস ক্লার্কও চোখ বড় করে হাসি মুখে বললেন, "ওরে মেয়ে, আমাকে যে হোটেল চালাতে হয়, কত বিচিত্র সংসারের বহুরূপী মানুষ মাত্র কদিনের জন্যই এখানে আসে, কিন্তু এত গল্প রেখে যায় যে তাদের ক'জনকে, তাদের কিছু গল্পকে কোনদিনই ভুলতে পারবো না। এখানে যখন জাঁকিয়ে শীত পড়ে, চারদিক বরফে ঢেকে যায়, সারা শহর নিঃস্পন্দ হয়ে থাকে, হোটেলে দু-একজন বিদেশী ছাড়া প্রায় কেউই থাকে না, বেয়ারা-বাবুর্চিকেও ছুটি দিয়ে দিই, তখন এত বড় একটা বাড়িতে আমি ঐ সাজানো গল্পগুলি নিয়ে বিভোর হয়ে থাকি। শীতের ঐ ভীষণ নির্জনতায় আমার নিঃসঙ্গ জীবন বেশ কেটে যায়।"

মিসেস ক্লার্ক একটুখানি সময় কি যেন ভাবলেন। তারপর টিনার কৌতূহলী মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ডক্টর সোম দ্বিতীয়বার বিয়ের পর তোমাদের ইন্টালেক্‌চুয়াল মহলে চিরকালের জন্য গল্পের খোরাক হয়ে গেছেন আর এই গল্প গড়ে উঠেছে অপর্ণার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে।"

"গল্পটা বলুন, এক্ষুনি। বলতেই হবে।"

"না, আর বলে না। আমার কাজ আছে টিনা।"

মিসেস ক্লার্ক সেদিন বলেননি, বলেছিলেন পরে। মিসেস ক্লার্ককে ঐ গল্প বলেছিল দেবকুমার রায়। কোলকাতা থেকে বেড়াতে এসেছিল এবং ডক্টর কল্যাণ সোম ও তাঁর স্ত্রী কুমকুম সোমকে দেখেছিল। মিসেস ক্লার্ক একদিন যখন দেবকুমার রায়ের কাছে অনুপস্থিত কল্যাণ

সোমের বিত্তাবুদ্ধি সম্বন্ধে প্রশংসা করেছিলেন, দেবকুমার রায় হাত জোড় করে বলেছিল, "দোহাই মিসেস ক্লার্ক, অতি বৃহৎ ঐ পণ্ডিতটি সম্বন্ধে আমায় কিছু বলতে আসবেন না, আর দয়া করে ওঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেবেন না। আমি আর মাত্র তিনটে দিন আছি, শান্তিতে থাকতে দিন।"

সেদিন দেবকুমার রায়ের কথা শুনে মিসেস ক্লার্ক আকাশ থেকে পড়েছিলেন। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন—"আপনাদের হাই সার্কেলের এতবড় একজন ইনটেল্যেকচুয়াল জায়েন্ট সম্বন্ধে আপনার অবজ্ঞার কারণটা জানতে পারি কি?"

"ওর ছেলে আনন্দ আমার ক্লাস মেট। আমরা একই সাবজেক্টে একই বছরে এম. এ. পাস করেছি।"

আনন্দ সোম বরাবরই লেখাপড়ায় ভাল। এম. এ.তে ও ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছিল। রেজাল্ট বেরোবার পরেই কল্যাণ সোম ছেলেকে বলেছিলেন বাইরে গিয়ে বিদেশের ডিগ্রী নিতে। লেখাপড়ার কাজ টানা করে যাওয়াই ভাল, নইলে বাধা আসে।

বাপের কথা শুনে আনন্দ মুখ গোঁজ করে খানিকটা চুপ করে থেকে চোয়াল শক্ত করে উত্তর দিয়েছিল, "এখন আমার পক্ষে কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়।"

"কেন?" কল্যাণ সোম বিস্মিত হয়েছিলেন।

"অনেক খরচ। আর তা ছাড়া···" ছেলের কথা শেষ হতে পারেনি। কল্যাণ সোম চেঁচিয়ে উঠেছিলেন—"টাকা পয়সার দায়িত্ব আমার। সে সব কথা চিন্তা না করে আমি তোমাকে অকারণ ঐ সাজেসসন দিইনি, আমি বাজে কথা বলি না তুমি জানো না! তুমি আর কি বলতে যাচ্ছিলে বল।"

"মা অসুস্থ, আমি এখন বাইরে যাবো না।"

ঘাড় সোজা করে ছেলেকে উত্তর দিতে দেখে গা জ্বালা করে উঠলো কল্যাণ সোমের। মাস কয়েক ধরে তিনি ছেলের এই আচরণ

লক্ষ্য করছেন। কথাবার্তা নির্লিপ্ত, নির্বিকার। ঐ সুন্দর মুখখানায় কি সাংঘাতিক একগুঁয়েমি জেদী ভাব!

"তোমার মা তো বিধবা নন। সুতরাং ওঁর দায়-দায়িত্বটা আমাকেই নিতে দাও। তুমি পিতৃহারা হলে তোমার জীবনে উন্নতি করবার এই সুযোগ আর পাবে না।"

ঠিক ঐ মুহূর্তে নীচে বাইরের ঘরে কলিং বেল বেজে উঠলো। ভৃত্য এসে খবর দিল কুমকুম দিদিমণি এসেছে।

আনন্দ বাপের মুখের দিকে একবার খর দৃষ্টিতে তাকিয়ে ঝড়ের বেগে চলে গেল নিজের ঘরে। পায়ে লেগে একটা ছোট শান্তি-নিকেতনী মোড়া ছিটকে চলে গেল কল্যাণ সোমের পায়ের কাছে। কল্যাণ সোম ছেলের চলে যাওয়ার দিকে খানিকটা তাকিয়ে থেকে নীচে স্টাডিতে চলে গেলেন। সেখানে অপেক্ষা করছে কুমকুম। সে কল্যাণ সোমের অধীনে গবেষণা চালিয়ে খুব তাড়াতাড়ি থিসিস শেষ করে আনছে। আর কিছুদিনের মধ্যেই টাইপ করে থিসিস জমা দেবে। এখন থেকে কল্যাণ সোম ভাবছেন কোন্ কোন্ ঘনিষ্ঠ অধ্যাপকদের নাম প্যানেলে সাজিয়ে দেবেন, যাতে কুমকুমের থিসিস সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়।

এবং তাই-ই হয়েছিল। অর্থনীতিতে ডক্টর কুমকুমের ছবি ছেপে বেরিয়েছিল বিখ্যাত সব কখানা দৈনিক সংবাদপত্রে। শোনা যায় সহকর্মী ও ছাত্র-ছাত্রীরা মুখ টিপে হেসে মন্তব্য করেছিল—কল্যাণ সোম দ্বিতীয়বার ডক্টরেট করলেন।

কাগজে কুমকুমের ছবি বেরোবার এক মাসের মাথায় অপর্ণা সোম মারা গেল।

সেদিন মৃতদেহের সামনে বাপ-ছেলেতে যে কথা হয়েছিল দেবকুমার রায় মিসেস ক্লার্কের কাছে তার হুবহু বর্ণনা দিয়েছিল। আনন্দ তার মনের কথা ঢেলে বলেছিল বন্ধুর কাছে।

আনন্দ যেদিন মাতৃহীন হল, সেদিন ও এতটুকু চোখের জল ফেলেনি, শুধু বাপের দিকে তাকিয়ে একবার বলেছিল, "আর কয়েকটা

দিন অপেক্ষা করতে পারলে না? মাকে তো আমিই নিয়ে যেতাম।"

"তোর মাকে ঈশ্বর নিয়েছেন, আমার অপেক্ষার কি আছে!" ডক্টর সোম মুখ ভারী করে উত্তর দিয়েছিলেন।

"ঈশ্বরের নামে আর মিথ্যে অভিযোগ দিও না। তিনি তোমাকে কর্তব্য ন্যায়-নীতিকে বিসর্জন দিতে বলেননি। মার মৃত্যুকে জোর করে টেনে নিয়ে আসতে আদেশ দেননি।"

"একেবারে চুপ করে থাক্ খোকা। এরকম মিথ্যে কথা বল্লে আমি তোকে পুলিশের হাতে তুলে দেবো। তুই জানিস না, তোর মা প্রতি রাত্রে দুটো-তিনটে করে ঘুমের বড়ি খেতো!"

কল্যাণ সোম হিস্‌হিস্ করে উঠেছিলেন।

"জানি, মা রোজ রাতে ঘুমের বড়ি খেতো। কিন্তু একসঙ্গে এতগুলো! কেন, বলতে পার? কোন্ দুঃখে, কার অবহেলায়?"

"তুই কি বলতে চাস?" কল্যাণ সোমের দুই চোখ জ্বলে উঠলো।

ব্যাপারটা বেশিদূর গড়ালো না। কল্যাণ সোমের এই ব্যক্তিগত শোকে সমবেদনা জানাতে একে একে পরিচিত জন আসতে শুরু করলো। কুমকুমও এসে মৃতা অপর্ণা সোমের খাটের বাজুটা ধরে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলো।

মায়ের শ্রাদ্ধশান্তি চুকে যাবার পনেরো দিনের মধ্যে আনন্দ বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। যাবার সময় বাপের কাছে এসে বলে গেল, "তোমার মন বিবেকশূন্য নয়। ঐ বিবেকের কাছেই একদিন তোমাকে মাথা কুটে কুটে ক্ষমা চাইতে হবে।"

অপর্ণার মৃত্যুতে যেসব সহকর্মী ও ছাত্র-ছাত্রীরা এসেছিল, তারা সেদিনই মুখ টিপে মন্তব্য করেছিল—এবার আমরা সবাই অপেক্ষা করবো সেই দিনটির জন্য।

সেই দিনটি এলো অপর্ণার মৃত্যুর তিনমাস পরেই। কল্যাণ সোম আর কুমকুম গাড়ি করে ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে গিয়ে স্বামী-

স্ত্রী হয়ে সোজা বাড়ি এলেন। কল্যাণ সোম লজ্জা, সঙ্কোচ মানেন না। সমাজকে তিনি ভয় পান না। বড় জোর কয়েক মাস পরিচিত মহলে একটু চাপা হাসির নীরব হিল্লোল বয়েছিল। কিছু সাহসী প্রতিবেশী মাঝে মাঝে শুনিয়ে শুনিয়ে দু-একটা মন্তব্য ছুঁড়েছিল। আর একটা সিনেমা পত্রিকায় খবরটা একটু সরস ভাষায় ছাপা হয়েছিল। ব্যাস ঐ পর্যন্তই, এরপর আর কেউ কোন কথা বলেনি। শুধু একটা কথাই বলেছে, মনের জোর বটে ডক্টর কল্যাণ সোমের।

কিন্তু আজ এত রাত্রিতে ডক্টর কল্যাণ সোম কি ভাবছেন ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে। কি দেখছেন নিকষ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে-থাকা উঁচুমাথা গাছ আর গাছের ফাঁকে বরফ-শিখর হিমালয়ের দিকে তাকিয়ে।

বেডসাইড টেবিলের ওপর দুখানা খাম পড়ে আছে। আজ বিকেলের ডাকে এসেছে। একখানা বাইরের, বড় নীল রঙের এয়ার লেটার, মায়ের চিঠি। প্রথমটায় টিনা চিঠিটা বিছানার ওপর ছুঁড়ে ফেলেছিল। তারপর তুলে নিয়ে টেবিলের ওপর বই চাপা দিয়ে রেখেছে। যখন ইচ্ছে হবে, মনের সময় হবে, তখন খামখানা খুললে হবে'খন। আজকেই পড়তে হবে এমন কি মানে আছে। কাল, পরশু কিংবা দু-চারদিন পরেও ঐ চিঠিখানা পড়লে চলবে, না পড়লেই বা কি! মা কি লিখেছে সে তো জানাই আছে টিনার। ভালো লাগে না একঘেয়ে দেশ বেড়ানোর বর্ণনা আর উপদেশ। একদম ভালো লাগে না। শুধু চিঠি পড়তে নয়, মা-বাবাকেও এখন আর ভালো লাগে না।

আরেকটা চিঠি লিখেছে নিনা। টিনার বন্ধু নিনা, কোলকাতা থেকে। নিনা, টিনা দশ বছর বয়স থেকে এক স্কুলে একসঙ্গে পড়েছে, একসঙ্গে স্কুলের শেষ পরীক্ষা দিয়েছে। দুই বন্ধুর ডাকনামে এত মিল অন্য বন্ধুদের কাছে খুব মজার ব্যাপার। ওরা নিনা টিনাকে

একসঙ্গে ডাকে নিন্টিনা। ভালো নামে অবশ্য অনেক তফাত। নিনার ভালো নাম যশোধরা। টিনার ভালো নাম রত্নাবলী। নিনার বাচ্চা ছোট বোনের ডাকনাম রিঙ্কি, ভালো নাম সংহিতা। টিনার খুব হাসি পায়। ও লক্ষ্য করে দেখেছে বাঙালী বাবা যদি সাহেব হয়, আর মা হয় মেমসাহেব, তবে ছেলেমেয়েকে ডাকবে ইংরেজী নামে, কিন্তু ভালো নাম রাখবে রামায়ণ মহাভারত ঘেঁটে। নইলে ওর টিয়া নামটা পাল্‌টে গেল, পালটালো না রত্নাবলী নাম!

নীপাদিকে একদিন হেসে কথাটা বলতে নীপাদি ঠোঁট উল্‌টে বলেছিল—"তোমাদের তো ঐটাই স্টাইল, তোমাদের শ্রেণীটার রকমই এই।" নীপাদি উত্তেজিত হয়ে আরও বলেছিল, "মুখে বলবে আমার দেশ, আমার ভাষা। আর কাজে, চলাফেরায় দেখাবে চূড়ান্ত সাহেবীআনা।"

এই অভিযোগ সত্যি জেনেও টিনা ক্ষীণ প্রতিবাদ করেছিল, "সে আবার কোথায় দেখলেন?"

"কোথায় আবার দেখবো, তোমাদের মতো লোকের বাড়িতেই দেখছি। তোমরা কেউ বাংলা স্কুলে, বাংলা মিডিয়মে লেখাপড়া শেখ? কেউ সত্যিকারের বাঙালীদের সঙ্গে মেশ। তোমরা মিশতে লজ্জা পাও না? অথচ ড্রইংরুমে রবীন্দ্রনাথের বিরাট ছবি টাঙিয়ে রাখ। বই-এর আলমারিতে রবীন্দ্ররচনাবলী, বঙ্কিমরচনাবলী সাজিয়ে রাখ, কিন্তু কেউ পড়তে যাক না, তাকে পাতা কেটে পড়তে হবে।"

টিনা হেসে বলেছিল, "আমাদের নিয়ে আপনারা একটা বিশেষ শ্রেণী তৈরী করে নিজেদের ইচ্ছে মতো বকাবকি করতে এতো ভালোবাসেন কেন, নীপাদি?"

"ভালোবেসে বকাবকি করি না টিনা, গা জ্বলে ওঠে, তাই করি।" নীপা কথাটা বলেই অবশ্য সুর নরম করে বলেছিল—"তোমার মা বাবা হয়তো একটু অন্যরকম।"

"কেন, হঠাৎ আমার মা বাবা হয়তো একটু অন্যরকম কেন! আপনি এখানে চাকরি করেন বলে!"

"নিশ্চয়ই, কৃতজ্ঞতা বোধটুকু আছে বলেই তো ঐটুকুন প্রশংসা আমি করি।" একটুও লজ্জা না পেয়ে, এতটুকু না থমকে নীপা উত্তর দিল।

নিনার চিঠিখানা সঙ্গে সঙ্গে টিনা খুলেছিল এবং পড়েছিল। এবং বারবার পড়েছিল। চিঠিখানার মধ্যে যে খবরটুকু ছিল তাতে টিনা বিস্মিত হয়নি। কারণ যে খবরটা নিনা লিখে জানিয়েছে, সেটা তো কিছুদিন আগে থাকতেই খবর হয়ে আছে। তবু কেমন যেন লাগছিল। নিনার কথা মনে পড়ছিল। নিনার চাইতে অনেক ছোট বোন বছর তিনেকের তুলতুলে রিঙ্কিকে মনে পড়ছিল।

নিনার মা ইন্দ্রাণী বাসু বিয়ে করেছে। তার প্রথম স্বামী ডাক্তার বিজন বাসুর সঙ্গে অতঃপর তার চিরকালের মতো ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল।

টিনা নিনার চিঠিটা টেবিল ল্যাম্পের নীচে আবার মেলে ধরলো। "চারদিন আগে মা চলে গেল। প্রতিদিনের মতো সে-দিন ভোর হল প্রতিদিনের মতো এক টেবিলে বসে দুধ, কর্নফ্লেকস্, রুটি, ডিম খেলাম, ফল খেলাম। রিঙ্কিও তাই। শুধু ব্যতিক্রম দেখলাম মা নিজের হাতে আমাদের রুটিতে মাখন মাখিয়ে দিল। রিঙ্কিকে অনেকক্ষণ ধরে আদর করে করে খাইয়ে দিল। মায়ের টকটকে ফর্সা মুখটা সর্বক্ষণ লাল হয়ে থাকলো। একবার শুধু বললো, "রিঙ্কি, আমি একটা কাজে কোলকাতার বাইরে যাচ্ছি, একমাস থাকবো। তুই দিনার কাছে থাকবি। দিদিসোনার সঙ্গে বেড়াতে যাবি, তারপর আমি এসে তোকে বেড়াতে নিয়ে যাবো। এ কদিন কিন্তু আমাকে খুঁজবি না, ডাকবি না, কেমন!"

রিঙ্কি একগাল হেসে মার গালে একটা চুমু খেল। মা এরপরেই চলে গিয়েছিল বাথরুমে। যখন এলো, তখন দেখলাম চোখ দুটো লাল। মুখ নীচু করে এক কাপ চা ঢেলে নিয়ে চোখ না তুলেই আমাকে বললো, "নিনা, তুমি বড় হয়েছো, সব বুঝতে শিখেছো,

তোমাকে বলবার বা বোঝাবার কিছু নেই। আমি যতদিন রিঙ্কিকে না নিয়ে যাই, ওকে দেখো। যে ওষুধটা নিয়ম করে খাওয়াই, দেখো যেন বাদ না যায়। দিনা আজ বিকেলেই এখানে আসবেন। এক মাস থাকবেন, এর পর তুমি বাবা বা দিনা যার কাছে খুশী থাকতে পার!" একটু থেমে বলল, "দরকার পড়লে, খুব কিছু অসুবিধে হলে আমাকে ফোন করো। কিছুদিন পরেই আমি ফোন নম্বরটা জানিয়ে দেবো।" মার কথাগুলো শুনতে গিয়ে টের পাইনি যে আমার দু-চোখ জলে ডবডবিয়ে উঠে গাল বেয়ে নামতে শুরু করেছিল। মা চোখ তুলে দেখলো, তারপর মৃদু কণ্ঠে বললো, "কেঁদো না, দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"এর পরের ঘটনা খুব দ্রুত, খুব সংক্ষিপ্ত। ঘণ্টা চারেক পরে একটা গাড়ি এলো। যে লোকটি স্টিয়ারিং ধরে বসেছিল, বুঝতেই পারছিস সে কে! তোর সঙ্গে একবার আলাপ করিয়ে দিয়েছিলাম। ভুটান মামা, ভালো নাম মাইকেল জয়জিত বিশ্বাস। ধর্মে খ্রীস্টান, মেরিন এঞ্জিনীয়র, খুব লম্বা, খুব সুন্দর চেহারা। তুই বলেছিলি এয়ার লাইন্‌স্-এর পাইলট আর মেরিন এঞ্জিনীয়রদের সুন্দর চেহারা হতেই হবে। এটা বোধহয় ওদের একটা অ্যাডেড কোয়ালিফিকেশন!

"ভুটান মামা মায়ের চাইতে অন্তত পাঁচ বছরের ছোট। মার ছোট ভাই আমাদের সোনামামার বন্ধু. আর সেই হিসেবেই মায়ের সঙ্গে আলাপ আর সেই আলাপ গাঢ় হতে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া, এখানে সেখানে বেড়াতে যাওয়া, আর তারপর! জানিস টিনা, তারপর আমি দেখতে পেলাম মা আর ভুটান মামার মাঝখানে সোনামামা নেই। সোনামামা কখন কোন্ মুহূর্তে যেন মাঝখান থেকে সরে এসেছিল। থমথমে মুখে প্রায়ই সোনামামা মাকে যেন কি বলতো, মা উত্তেজিত হয়ে তার উত্তর দিত। তারপর দুজনকার মধ্যে কথা বন্ধ হয়ে গেল। আমি জানি, আমার মা-ই ইচ্ছে করে কথা বন্ধ করে দিয়েছিল, নইলে সোনামামাকে মাঝখান থেকে সরানো যাচ্ছিল না। ভুটান মামা প্রথমদিকে সোনামামার মতো মাকে

দিদি বলে কথা বলতো। এই ডাকটা যে কবে চলে গেল, কবে কি হল, কেউ জানতে পারেনি, কেউ টের পায়নি। সোনামামা গলা ঝাঁঝিয়ে দিনার প্রশ্নে উত্তর দিয়েছিল; "এমন একটা কুৎসিত, অসম্ভব ঘটনা ঘটবার জন্য মানুষ কখনও তৈরী থাকে যে সন্দেহ হবে, টের পাবে ?"

"অথচ আমার বাবার কি দোষ বল্‌তো! বাবার একমাত্র অপরাধ বাবা কালো, খুব কালো। বাবার চেহারা সত্যিই ভালো না। শুনেছি, মা নাকি বাবার সঙ্গে বিয়ে ঠিক হতে খুব কেঁদেছিল। কালো রঙের মানুষ দেখলে মা আঁতকে উঠতো। এখনও তাই। কালো মানুষের হাত থেকে কোন খাবার তুলে খেতেও মা ঘেন্না পায়। একবার নাকি কোন্‌ বিয়ে বাড়িতে মা শুধু লুচি বেগুনভাজা খেয়ে উঠে এসেছিল। কারণ যে দুটি ছেলে পরিবেশন করছিল তারা ছিল কালো। পৃথিবীতে কত বিচিত্র মানুষই না থাকে!

"দিনা, দাদু তাদের মেয়ের কালো রঙের ওপর এই অস্বাভাবিক বিদ্বেষের কোন পাত্তাই দেয়নি। আর কি করেই বা দেবে! দাদুর তো সামান্য অবস্থা। নেহাত সোনামামা শিপিং কর্পোরেশনে মোটা-মুটি একটা চাকরি পেয়েছে, বিয়ে থা করেনি, তাই একটু খেয়ে পরে থাকা। সোনামামা চাকরি পাওয়ার আগে তো দাদু দিনার অবস্থার কথা ভাবাই যায় না। আর ঠিক সেই অবস্থায় আমার মাকে দেখ্‌তে এসে যখন আমার বাবা, আর তার দূর সম্পর্কের দাদা, আমার জেঠুর খুব পছন্দ হয়ে গেল, তারা সেদিনই পাকা কথা দিয়ে গেল। দাদু-দিনা হাতে স্বর্গ পেলো।

"তুই তো জানিস আমার বাবার ডাক্তার হিসেবে কত নাম, বিশেষ করে গাইনিতে বাবার কত খ্যাতি, কত পসার! ডাক্তারী বিদ্যায় বাবা যে কত ওপরে, সে তো বাবার নেমপ্লেটটা দেখলেই জানা যায়। দেশী-বিদেশী কত ছাপ, কতবার বিদেশ যাওয়া, ডাক্তার মহলে বাবার কী দোর্দণ্ড প্রভাব-প্রতিপত্তি, আর তার সঙ্গে কত, কত টাকা! আমার মায়ের অসাধারণ সুন্দর মুখ, টাট্‌কা গোলাপের মতো

গায়ের রঙের জোরেই না এমন পাত্র একটু কিছু না নিয়ে, অনেক গয়না দিয়ে সাজিয়ে মেয়েকে নিয়ে গেল। দাদু বললেন এমন ভাল পাত্রের গায়ের রং আর চেহারার খুঁত ধরলে তো এই জগতে কোন কাজই চলবে না। ওসব মনখারাপ, কান্নাকাটি মেয়ে সব ভুলে যাবে অতবড় বাড়ি, গাড়ি আর ঐশ্বর্যের মধ্যে হাবুডুবু খেয়ে। কিন্তু মেয়ে কোন কিছুতেই ভুললো না। পাহাড়প্রমাণ অসন্তোষ আর ঘৃণা নিয়ে মা বাবার বাড়িতে এলো আর মেয়ে হয়ে বলতে নেই, তবু বলছি মা এক খাটে বাবার পাশে শুতে বাধ্য হল। ফল আমরা দুটি বোন। শুনেছি, আমি যখন হয়েছিলাম তখন নাকি আমার গায়ের চামড়া ছিল লাল্‌চে। মা ডুকরে কেঁদে বলেছিল যে বাচ্চা লাল্‌চে রং নিয়ে জন্মায়, সে নির্ঘাত কালো হবে। আমার জীবনের প্রথম দিনে মা নাকি আমাকে ছুঁয়ে দেখেনি, আমাকে আদর করেনি। তুই জানিস, তোকেই একমাত্র বলেছি মায়ের সঙ্গে আমার চিরকালই একটু ছাড়া ছাড়া ভাব। এমনকি যখন দেখা গেল আমি লালচে হয়ে জন্মালেও বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে ফর্সাই হয়েছি, অবশ্য মায়ের রঙের ধারে কাছে না তবুও মার সঙ্গে আমার সম্পর্ক একেবারে ঢিলেঢালা, আল্‌গা। আমার মনে পড়ে না মা কোনদিন আমাকে সাজিয়ে দিয়েছে অথবা কাছে টেনে আদর করেছে। আমার মনে হয় মাকে মা বলে না ডেকে মিসেস বাসু বলে ডাকি। খুব হাস্যকর, তাই না! মা-বাবার সম্পর্কটা ছিল আরও হাস্যকর। মাকে দেখে মনে হতো দোর্দণ্ড প্রতাপশালী রাজা, বাবা যেন ভীতু নিরন্ন প্রজা। মাকে বিয়ে করে বাবার যেন সঙ্কোচের সীমা ছিল না। বাবার জীবনে এই ব্যাপারটা যেন একটা ভয়াবহ অপরাধ।

"মা-বাবার সেপারেশনটা এক বছর আগেই হয়ে গিয়েছিল। তবে বাবার অনুরোধে এবং দু বছরের বাচ্চা রিঙ্কির কথা ভেবে মা এখানে আরও এক বছর থাকতে রাজী হয়েছিল। অবশ্য রিঙ্কি মায়ের কাছে থাকবে, আদালত থেকে এই নির্দেশ এসে গেছে।

"বাবা ইদানীং বাড়ির বাইরেই বেশীর ভাগ সময় কাটিয়ে আসে।

মাস কয়েক ধরে বাবা দিনের বেলা বাড়িতে খেতেও আসে না। পার্ক স্ট্রীটের চেম্বারে বাবা লাঞ্চ খেয়ে নেয়। কোলকাতায় বেশ কয়েকটা নামকরা নার্সিংহোম আর হাসপাতালের সঙ্গে বাবা জড়িত। সুতরাং ঐসব কর্তব্য সেরে বাবার বাড়ি ফিরতে রাত এগারোটা তো বাজেই। ওপরের শোবার ঘর বাবা বেশ কিছুদিন আগেই ত্যাগ করেছে। এখন বাবা রাত্রিবেলা ঘুমোয় নীচে আমাদের বসবার ঘরের পাশে যে গেস্টরুমটা আছে, সেখানে। বাবার খাস বেয়ারা রামু বাবার সবকিছু দেখে, শোনে, তদারক করে।

"বুঝলি টিনা, মা যেদিন আমাদের বাড়ি থেকে চলে গেল, সেদিন যে মায়ের চোখ দুটি লাল দেখেছিলাম, সেটা আমার জন্য নয়, বাবার জন্য তো নয়-ই। আমি জানি মায়ের খুব কষ্ট হচ্ছিল রিঙ্কির জন্য। রিঙ্কি তো রূপে হুবহু মায়ের মতো। আমরা সবাই জানি কি অতুলনীয় সৌন্দর্য নিয়ে রিঙ্কি বড় হয়ে উঠছে! মা রিঙ্কিকে আদর করে, আর বলে, আমার মনের মতো মেয়ে রিঙ্কি, আমি তোকে ছেড়ে, তোকে না দেখে থাকতে পারবো না রে। মায়ের সঙ্গে জয়জিত বিশ্বাসের নাকি সেইরকমই কথা হয়েছে। মা রিঙ্কিকে নিয়ে যাবে, বাবার দিক থেকে কোন আপত্তি ওঠেনি। কোনদিন, কোন ব্যাপারেই ওঠেনি।

"আপাতত মা উঠেছে মায়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু আমাদের মিনি মাসীর বাড়ি। শুনেছি, গতকাল রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেছে। মা এখন মিসেস জয়জিত বিশ্বাস, আমার বাবার স্ত্রী নয়। এই সপ্তাহেই নাকি জাহাজে বেড়াতে বেরোবে। ইন্দ্রাণী ও জয়জিত বিশ্বাসের হনিমুন হবে কুয়ালালামপুরে।"

"দিনা এসেই রিঙ্কিকে নিয়ে খুব ব্যস্ত। অন্তত কিছুদিন রিঙ্কিকে মায়ের কথা ভুলিয়ে রাখতে থাকতে হবে।

"গতকাল রাতে বাড়ি ফিরতে বাবার আরও দেরি হয়েছিল। প্রায় বারোটা। আমার ঘরের দরজায় নক করে বাবা আমাকে ডাকলো, জিজ্ঞেস করলো আমরা দু বোন ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া

করেছি কি না। আমি কোন উত্তর না দিয়ে মাথা নেড়ে জবাব দিলাম। বাবা ঘর থেকে চলে গেল। ভাবলেশহীন মুখ বাবাকে দেখে মনে হল না তার জীবনে কোথাও কিছু নাড়া খেয়েছে। বাবা নীচে যাবার সিঁড়ি থেকে আবার ফিরে এলো। আবার আমাকে ডাকলো, বিছানার খুব কাছে এসে দাঁড়ালো। আমার মাথায় হাত দিয়ে আস্তে করে বললো, "কোথাও কদিনের জন্য বেড়াতে যাবি রে ?"

"না"—আমি মাথা নাড়লাম।

"ঘুমিয়ে পড়্, অনেক রাত হয়েছে।" বাবা চলে গেল। নীচে নামার সিঁড়িতে বাবার স্লিপারের শব্দ ক্রমে মিলিয়ে গেল। আমার কেন জানি মনে হল বাবার সোজা টান টান মাথাটা একটু যেন সামনের দিকে ঝুঁকে গেছে।

"না রে টিনা, আমি বাবাকে ছেড়ে কোথাও যাবো না। আমি অন্তত আমার খুব কালো বাবাকে খুউব ভালোবাসি।

উত্তর দিস, ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা,

নিনা

টিনার বুক থেকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এলো। মা-বাবা কতদূর চলে গিয়েছে। এর আগের চিঠিটা এসেছিল বোস্টন থেকে। মা-বাবা স্টেট্স-এ আরও কিছুদিন থেকে আসবে লণ্ডনে। সেখান থেকে টোকিও। সেখানে হপ্তাখানেক থাকতে হবে। কী নাকি দরকারী কাজ আছে সেখানে। তারপর বম্বে। বম্বেতেও দিন দশেক কাজের প্রোগ্রাম রয়েছে। তারপর কোলকাতা।

টিনাও তো কতদিন হল মা-বাবাকে দেখে না। ঠিক কবে মা-বাবা আসবে তার কোন হদিস ছিল না সেই চিঠিতে। আজকের ডাকে আসা যে চিঠিটা সামনের টেবিলে চাপা দেওয়া আছে, যে চিঠিটা একদম খুলতেই ইচ্ছে করছে না, সেখানেও হয়তো বা আগের চিঠির মতোই মা-বাবার ভীষণ ব্যস্ততায় ভরা কর্মসূচীর ফিরিস্তি রয়েছে, ভালো লাগে না একঘেয়ে ভাষায় লেখা ঐ চিঠি পড়তে।

কোলকাতার বাড়িতেও কি টিনা মা বাবার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পায়! মা বাবার তো সেইটুকুন সময়ও নেই। মা বাবা বাইরে যাবার দিন চারেক আগে টিনা মায়ের ঘরে গিয়ে মার গা ঘেঁষে বসেছিল, বলেছিল, "ও মা, আমার পিঠটা একবার চুল্‌কে দাও না।" মা একটু হেসে মেয়ের পিঠে ওপর নিচে একবার মাত্র হাত বুলিয়ে বলেছিল, "টিনা, তোর বয়স কত হল রে। আজ বাদে কাল তোর রেজাল্ট বেরুবে। তুই কলেজে ভর্তি হবি, সে এখানেই হোক আর তোর বাবা তোকে বাইরেই পাঠাক, তুই কিনা এখনও বলিস মা পিঠ চুলকে দাও!"

টিনা মাথা ঝাঁকিয়ে বলেছিল, "বা রে বয়সের সঙ্গে, রেজাল্ট বেরুনোর সঙ্গে পিঠ না চুলকুনোর কি আছে। আরেকটু চুল্‌কে দাও, বেশ ভাল করে সুড়সুড়ি দিয়ে দিয়ে।" এরপরেই টিনা অবাক হয়ে মার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। মা আচম্‌কা অসম্ভব গম্ভীর হয়ে বলেছিল, "ন্যাকামি করো না টিনা, পিঠ চুলকুনোর জন্য তোমার আয়া ফুলকুমারী আছে। আমাকে এক্ষুনি বেরোতে হবে। তোমার বাবা আর রণজিত কাকু আমার জন্য ওদের অফিসে অপেক্ষা করবে। আমরা যাবো মিস্টার সিংহানিয়ার বাড়িতে। যাও।" এবং টিনা মুখ কালো করে নিজের ঘরে চলে এসেছিল।

অথচ টিনার স্পষ্ট মনে আছে ওর যখন ন-দশ বছর বয়স, তখনও মা ওকে বাথরুমে নিয়ে গিয়ে নিজের হাতে মাথায় শ্যাম্পু দিয়ে, গায়ে সাবান মাখিয়ে ধুঁধুলের খোসা দিয়ে গায়ের পায়ের ময়লা তুলে দিত। মুখে সমানে বলতো—"এত বড় হয়েছিস, তবু নিজে নিজে সাবান মেখে স্নান করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হতে শিখলি না!"

"একদিন দেখই না পরীক্ষা করে নিজে নিজে পারি কি না। এরপর কিন্তু তুমি আর আমাকে স্নান করিয়ে দেবে না বলে রাখছি।"

মেয়ের কথায় মা হেসে বলতো, "কেন রে মা, বুড়ি হয়ে গেছিস্!"

"বুড়ি না হই, বড় তো হয়েছি। আমার বুঝি লজ্জা করে না।"

"ওরে আমার সোনা বুড়িরে। মায়ের হাতে স্নান করতে, সাবান মাখতে লজ্জার আর শেষ নেই। এই লজ্জা রাখবি কোথায়।"

টিনার আরও মনে পড়ে। বাবা যখন তরতর করে ওপরে উঠতে লাগলো, ঐশ্বর্যের বান ডাকলো, মা, বাবা সাজে পোশাকে পাল্টে যেতে লাগলো, তখনও মা দিনান্তে একবার অন্ততঃ টিনাকে কাছে ডেকে খুঁটিনাটি জিজ্ঞেস করতো, কি খেয়েছে, সারাদিন কি করেছে, ক্লাসে ঠিকমতো উত্তর দিতে পেরেছে কি না। খোঁজ নিত অঙ্কের ডাকসাইটে মাস্টারমশাই নৃপতিবাবুর হাতে পড়ে এখন অঙ্ক ভাল লাগছে কি না। এই সবকিছু তত্ত্বাবধান করতো মিস ভার্মা, তবুও টিনার সবকিছু ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে মায়ের কতো আগ্রহ ছিল. কৌতূহল ছিল।

আর এখন! অতীতের সবকিছু ঠেলে ফেলে দিয়ে মা এখন কেবল সামনের দিকে সাঁতরে যাচ্ছে। অতীতের অনুভূতি মা অতীতে ঠেলে দিচ্ছে। আর সেজন্যেই তো মামাবাড়ি থেকে বার বার মাসীমার চিঠি আসছে কোলকাতায় মার কাছে এসে কদিন থাকবে বলে, জিরোবে বলে। মা কান পাতছে না, কেবল লিখে পাঠাচ্ছে. এখানে এসে শহরের গোলমালে তোমার মোটেই বিশ্রাম হবে না। বরঞ্চ তুমি দিনরাত পরিশ্রম না করে ওখানে একজন কাজের লোক রেখে দাও। টাকার দায়িত্ব তো আমিই নিয়েছি। মার কাছে এখন সবকিছুর মূল্য টাকার মূল্যে। আর সেই একই পথ ধরে ছুটে চলেছে বাবা।

টিনা উঠে দাঁড়ালো। মার চিঠিখানা একবার হাতে তুলে নিল। আবার রেখে দিল। এমন কিছু চিঠি নয়। পরে পড়লেও চলবে।

জানলা দিয়ে চোখে পড়লো হোটেলের একতলায় একেবারে উত্তর ঘেঁষে ঘরখানা অন্ধকার। কোন লোক নেই। আজকেই খালি হয়েছে। আজ সকাল পর্যন্ত ঐ ঘরটাতে ছিল মিনু পিসী, পরিমল পিসেমশাই আর তাদের দুই ছেলেমেয়ে। মেয়ে বড়। নাম

মালবিকা, ডাকনাম মালা। ছেলে ছোট। নাম অভিজিৎ, ডাকনাম অভি। মেয়ের বয়স নয়, ছেলের সাত। মিনু পিসীর ভালো নাম মণিমালা। বাবার গ্রাম সম্পর্কে বোন।

মিনু পিসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা, তার স্বামী, সংসার, ছেলেমেয়ে সব কিছু মিলে টিনার কাছে খুব কৌতূহলে ভরা একটি নিটোল গল্প। এই গল্প তৈরি করতে, তাকে বাস্তবায়িত করতে মিনু পিসীর কত পরিশ্রম, কত না চেষ্টা। টিনার বাবার কাছে, মায়ের কাছে কত না আসা যাওয়া।

মিনু পিসী মাকে একদিন দুঃখ করে বলেছিল, "দেখ বৌদি, কিছু নেই আমার। আছে কেবল বুক ভরা সাধ, এই করবো, তাই করবো। এই হবে, সেই হবে। ঈশ্বরের এ কী বিধান আমার ওপর বল তো!"

মা একটু হেসে বলেছিল, "কেন মিনু, তুমি তো খুব হিসেব করে, সুন্দরভাবে সংসারকে গড়ে তুলছো। পরিমল তার কলেজে ছাত্রপ্রিয় অধ্যাপক। তোমার মেয়ে অমন ভালো স্কুলে প্রথম পাঁচজনের মধ্যে প্লেস পেয়ে ক্লাসে উঠেছে। আর অভি তো এখন থেকেই বুঝিয়ে দিচ্ছে সে কত ব্রিলিয়্যান্ট। নইলে সেণ্ট জেভিয়ার্সে এডমিশন টেস্টে প্রথম হয়ে ভর্তি হলো! সেখানে কত কম্পিটিশন, কত বড়ো ঘরের ছেলেরা কিভাবে সব জেনে শুনে আসে!"

টিনার মনে আছে, মার এই কথায় মিনু পিসীর চোখে জল এসে গিয়েছিল। চোখ মুছতে মুছতে বলেছিল—"এর মূলে তো বৌদি তোমরা দুজন। তুমি আর দাদা যদি আমাদের না দেখতে, আমার কথা যদি তুমি না বুঝতে, তাহলে কি আমি অভিকে ঐভাবে শিখিয়ে পড়িয়ে অত বড়ো স্কুলে ভর্তি-পরীক্ষায় বসাতে পারতাম? না ও-ই কিছু বলতে লিখতে পারতো!"

টিনা জানে মার নির্দেশে ভর্তি হবার আগে মাস দুয়েক অভি নৃপতিবাবুর কাছে নিয়মিত অঙ্ক শিখেছিল। যেমনটি শিখেছিল দু' বছর আগে মালা। ওরা দু ভাইবোন ইংরেজীতে তালিম নিয়েছিল

মিস্ ভার্মার কাছে। এই ব্যাপারটাও হয়েছিল মার নির্দেশে। তাই প্র ত কথায় কৃতজ্ঞতায় চক্‌চক্ করে মিনু পিসীর দুটি চোখ।

রীতা ভার্মা তার বিলিতী বাংলায় মিনু পিসীকে একবার বলেছিল, কোলকাতায় তো বাংলা স্কুল বড়ো কম নেই, কয়েকটা তো বেশ নামকরা। রেজাল্ট প্রতি বছর ভালো। তবে কেন মিসেস চ্যাটার্জী ছেলেমেয়েকে ঐসব স্কুলে ভর্তি করাচ্ছেন না। উত্তরে মিনু পিসী একটু হেসে বলেছিল, "আমার বড়ো সখ ছেলেমেয়ে বড় স্কুলে পড়বে। বড়ো দৃষ্টি, বড়ো আশা নিয়ে স্কুলের গণ্ডী পার হয়ে আরও বড়ো জীবনে ঢুকবে। বাংলা স্কুলের চৌহদ্দী বড়ো ছোট। সেখানে জীবনের প্রথম বেড়ে ওঠা বছরগুলি কাটলে বড়ো হয়ে ছেলেমেয়েরা চলার পথে কেবল গলি ঘুঁজিতে ঘুরে ঘুরে মাথা ঠুকে মরবে। কোনদিনও বড়ো রাস্তায় পা ফেলার সাহস হবে না।"

টিনার সামনে পরিমল পিসেমশাইও একদিন ঐ একই প্রশ্ন করেছিলেন মিনু পিসীকে।

"সংসারের এই আয়ে মেয়ে ছেলে দুজনকেই অত মাইনের বড়োলোকের স্কুলে কেন পড়াতে চাইছো বুঝতে পারছি না।"

"বুঝতে পারলে ফিলজফি নিয়ে এম. এ. পাস করতে না। পাস করতে ফিজিক্স কিংবা অঙ্কে। যার দাম হতো, ঘরে টাকা আসতো।" খিঁচিয়ে উত্তর দিয়েছিল মিনু পিসী। আর টিনা দেখেছিল অতি ভালোমানুষ পরিমল পিসেমশাই সেদিন লজ্জায় মাটির সঙ্গে প্রায় মিশে গিয়েছিলেন। সত্যি, যে ছেলে আর্টস নিয়ে পাস করে সে শুধু অপদার্থই হয়, মানুষ হয় না।

মিনু পিসী রাগেভরা গলায় বলেছিল, "স্ট্যাণ্ডার্ড একটু উঁচু করে সামান্য ভালোভাবে জীবন কাটানোর জন্য যদি চেষ্টা করেই থাকি, তাতে তোমার আপত্তি করার তো কোন যুক্তি দেখছি না।"

পরিমল পিসেমশাই ক্ষীণ কণ্ঠে বলেছিলেন, "এ তো যুক্তির কথা নয়, ক্ষমতার কথা।"

"তুমি তো সবকিছুই দেখাতে পেরেছো!" মিনু পিসীর কথার ঝাঁঝে পরিমল পিসেমশাইকে সেদিন এইটুকুন দেখাচ্ছিল। টিনার খুব লজ্জা করছিল। পরিমল পিসেমশাই আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।

পরিমল চ্যাটার্জী মাঝে মাঝেই একটা বড় দীর্ঘনিশ্বাস বুকের মাঝখানে চেপে রাখে। ছাত্র হিসেবে খারাপ ছিল না, বি-এ. তে ফিলজফি অনার্সে সেকেণ্ড ক্লাস ফার্স্ট আর এম. এ তে ফার্স্ট ক্লাস থার্ড হয়েছিল। পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডক্টর মহান্তি পরিমল চ্যাটার্জীর পিঠে হাত রেখে বলেছিলেন, "তুমি রিসার্চ কর, আমি গাইড করবো। দর্শনশাস্ত্রে তোমার নিজস্ব চিন্তাধারা আমাকে মুগ্ধ করে। তুমিই পারবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আইডিয়ালিজম্-এর তুলনামূলক বিচার করতে। কাণ্ট আর শঙ্কর দর্শন সম্বন্ধে তোমার ধারণা পরিষ্কার।"

আরও অনেক কথা অনেকবার বলেছেন। শুধু মহান্তি নন। আরও কয়েকজন বিদগ্ধ অধ্যাপক। ডক্টর মহান্তি মন দিয়ে পড়লেন প্রিয় ছাত্র পরিমলের অনেক যত্ন ও সতর্কতার সঙ্গে লেখা ভবিষ্যৎ গবেষণার সিনপ্‌সিস্। মন্তব্য করলেন, "আমি ভবিষ্যৎ-বাণী করছি, এই গবেষণা সম্পূর্ণ হলে তুমি পণ্ডিত বলে গণ্য হবে। তোমাকে আমি আশীর্বাদ করছি।"

পরিমল সেদিন আত্মবিশ্বাসে উজ্জ্বল হয়ে বাড়ি ফিরে এসেছিল এবং তার বারোদিন পরে কোলকাতার একটা বেসরকারী কলেজে চাকরি পেল, একজন ছুটি নিয়েছেন তাঁর জায়গায়। ছ' মাসের জন্য। পরিমল ঐ কলেজের ছাত্র ছিল, সুতরাং এসব ক্ষেত্রে তাদের মতো ছাত্রদের দাবি অগ্রগণ্য। এর পর পরিমল ঐ পদেই পাকাপোক্ত-নিযুক্ত হল। কারণ যিনি ছুটি নিয়েছিলেন, তিনি সরকারী কলেজে সুযোগ পেয়ে গেলেন। তাঁর ফিরে আসবার কোন সম্ভাবনা নেই। সবদিক থেকে এই সুযোগ পরিমল চ্যাটার্জীর জীবনে ভগবানের আশীর্বাদ বলে মনে হল।

চাকরি পাওয়ার এক বছরের মধ্যে পরিমলের বিয়ে হল। কনে মণিমালা। পল্লীগ্রামের মেয়ে হলেও বেশ রুচিশীলা, ছিমছাম, পরিষ্কার কথাবার্তা। কিন্তু ফুলশয্যার রাতেই পরিমল একটু থমকে গিয়েছিল! শ্যামবর্ণা মণিমালার লাবণ্যমাখা মুখখানা বড়ো ভালো লেগেছিল পরিমলের। নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে হচ্ছিল। কলেজে চাকরি, তার সঙ্গে এমন শ্রীময়ী বউ। জীবনের শুরুটা বড়ো সুন্দর।

ফুলশয্যার রাতে পরিমল অনেকক্ষণ ধরে আদর করেছিল নতুন বউ মণিমালাকে। তারপর বলেছিল নিজের জীবনের ভবিষ্যৎ সারস্বত সাধনার কথা। ডক্টর মহান্তির কতবড় ভরসা পরিমলের আশার সঙ্গে এক হয়ে জড়িয়ে আছে। এবার মণিমালা এসেছে তার জীবনের অনুপ্রেরণা হয়ে। এখন থেকে পরিমলের রিসার্চের কাজ নিশ্চয়ই বাধাহীনভাবে এগিয়ে যাবে।

"কিন্তু সকলের আগে তো টাকার কথাটা ভাবতে হবে।" মণিমালা খুব বাস্তববাদী, পরিমল ভাবলো।

"টাকার উপায় তো হয়েছে, চাকরি তো একটা পেয়েছি।" পরিমলের গলার স্বরটা যেন একটু ক্ষীণ মনে হল। পরিমল মণিমালার একখানা পেলব হাত নিজের গালে চেপে ধরে একটু হাসলো।

"ব্যাস! ঐ টাকাতেই তুমি সন্তুষ্ট! তুমি খুশী!" মণিমালা হাতখানা টেনে নিল।

"মানে, এই তো সবে চাকরীটা পেয়েছি···পরে···"

পরিমলের কথা শেষ হল না। মণিমালা জোরে বলে উঠলো, "তুমি কি শুধু তোমার কলেজের মাইনের ওপর নির্ভর করে বিয়ে করেছো নাকি গো! হা ভগবান, ঐ টাকায় তুমি আমাকে সুখে রাখবে, ভবিষ্যতে যখন সংসার বড়ো হবে তাকে পালন করবে!"

পরিমল পরিবেশটাকে একটু হাল্‌কা করতে চাইলো—"তুমি তো আমার লক্ষ্মী, তোমার হাতের গুণে আমার ঐ কটা টাকায় সোনার জৌলুস খেলবে।"

পরিমল নববধূকে কাছে টেনে তার ঠোঁট দুটি স্পর্শ করতে গিয়ে ধাক্কা খেল—"ঐসব গ্যাস বেলুনে চিঁড়ে ভেজে না, ও সব ছেড়ে দাও।"

পরিমল সত্যিই ছেড়ে দিয়েছিল। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে অধ্যাপক পরিমল চ্যাটার্জীর জীবনযাত্রা একেবারে পাল্টে গেল। গড়িয়াহাটে ছিমছাম্ ফ্ল্যাট নিল। অন্য একটা কলেজে পার্টটাইম কাজ যোগাড় করলো। সপ্তাহে তিনদিন করে বাড়িতে ছাত্র-ছাত্রী পড়াতে শুরু করলো।

পরীক্ষার আগের কয়েক মাস দু-তিনটে ব্যাচে ভিড় করে ছাত্র-ছাত্রী পড়তে আসে। অধ্যাপক পরিমল চ্যাটার্জী তার দামি নোট ডিক্টেট করে যায়, ছেলেমেয়েরা হুমড়ি খেয়ে লিখে নেয়। বাজারে অধ্যাপক পি. সি.-র নোটের খুব নাম-ডাক এবং এই নাম হয়েছে পর পর কয়েকটা রেজাল্টের প্রমাণে। সুতরাং প্রতি বছর পরিমল চ্যাটার্জীর কাছে পড়বার জন্য আরও ভিড়, আরও ঠেলাঠেলি বেড়ে চলে। শুধু বি. এ. নয়, এম. এ-র ছাত্র-ছাত্রীরাও মাথা কুটতে থাকে পি. সি.-র নোটের জন্য। ছাত্রীর সংখ্যাই বেশী। তবে তাতে মণিমালার কোন আপত্তি নেই। বরঞ্চ সে আগ্রহ দেখিয়ে ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে। তারা তৃষ্ণার্ত হলে জল দেয়, চা দেয়।

দুখানা ঘরের মধ্যে পুরো একখানা ঘর মণিমালা সাজিয়ে গুছিয়ে দিয়েছে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য। একধারে একটা লম্বা বার্নিস করা টেবিল, তার দুদিকে দুখানা করে চেয়ার। আর মাথার কাছে একখানা গদিমোড়া চেয়ার। যেখানে পরিমল বসে। অন্য চারখানায় বসে যারা পড়তে আসে তারা। ঘরের অন্যদিকে কোনাচে করে সাজানো আছে তিনখানা বেতের চেয়ার। মাঝখানে সেণ্টার টেবিল। দেয়াল ঘেঁষে দুখানা ছোট শান্তিনিকেতনি মোড়া। আর পাশে ছোট্ট সুদৃশ্য একটা বুককেস। জানলায় কুঁচি দেওয়া টান টান পর্দা। সব কিছুতে কি স্নিগ্ধকর রুচির ছাপ, মণিমালার সৌন্দর্যবোধের সত্যিই তারিফ করতে হয়।

ট্যুইশনি ছাড়াও সপ্তাহে দুদিন করে পরিমল যায় একটা নামকরা টিউটোর্যারিয়াল হোমে। সারাদিন কলেজে পড়িয়ে, টিউটোর্যারিয়াল হোমের কর্তব্য সেরে ক্লান্ত শ্রান্ত অধ্যাপক পরিমল চ্যাটার্জী যখন বাড়ি ফিরে আসে, তখন মন খুশীতে ভ'রে ওঠে শ্রীলাবণ্যে ভরা নিজের ফ্ল্যাটখানা দেখে আর মণিমালায় যত্নমাখা হাতের সেবা পেয়ে। দালানের একপাশে ছোট্ট খাবার টেবিলে বসতে না বসতে মুখের সামনে আসে এক গ্লাস ফলের শরবত। কখনও কমলালেবুর, কখনও সরবতির, কখনও বা টমেটোর। শরবতের গ্লাসে সিপ দিয়ে মনে হয় সে সত্যিই সুখী। মণিমালা উদয়াস্ত পরিশ্রম না করলে, সংসার না গুছোলে আজকের দিনে একগ্লাস ভর্তি ফলের রস কার ভাগ্যে মেলে। এর দাম কত! আর ভাত খেতে বসে দুপুর-রাত দুবেলাতেই স্বাদ পাওয়া যায় মণিমালার রান্নার নৈপুণ্যের। মণিমালা নিজের হাতে রান্না করে, সংসারের অন্য সব কাজও করে। একটি বুড়ী এসে শুধু বাসন কটা মেজে দিয়ে যায়। তাই স্বামীর জন্য, ছেলেমেয়ের জন্য মণিমালার চিন্তা পরিশ্রমের সীমা নেই। রাত এগারোটা বেজে যাবার পর পরিমল টলতে টলতে বিছানার দিকে এগিয়ে যায়, সামনে এসে দাঁড়ায় মণিমালা, হাতে ধূমায়িত হরলিক্স, তাতে ক্যাডবেরী মেশানো, পরিমলের অত্যন্ত প্রিয়। কয়েক চুমুকেই পরিমলের ঝিমিয়ে পড়া প্রতিটি রোমকূপ চন্‌মনিয়ে ওঠে। পরিমলের মনে হয় সে এখন একটুও না থেমে পাক্কা তিন মাইল পথ হেঁটে আসতে পারে।

তবু অধ্যাপক পরিমল চ্যাটার্জী একদিন খিঁচিয়ে উঠেছিল স্ত্রীকে। পরিমল কলেজ থেকে বাড়ি ফিরেছিল বিকেলবেলা। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে বেরিয়ে যেতে হবে টিউটোর্যারিয়ল হোমে। ক্লাস আছে। মণিমালা স্বামীর সামনে টেবিলের ওপর বাড়ির তৈরী কড়াইশুঁটির কচুরি আর আলুর দমের ডিশ ধরে দিয়ে বলেছিল, "আজকে বোস এণ্ড বোস পাবলিশিং কোম্পানী এসেছিল একটা ভাল প্রস্তাব নিয়ে। আমি কিন্তু তোমার হয়ে কথা দিয়ে দিয়েছি। ওরা কাগজপত্র নিয়ে সামনের সপ্তাহে তোমার সঙ্গে দেখা করবে।"

"কি ব্যাপারে কথা দিয়েছো, ঐ নোটবই লেখার ব্যাপারে!" পরিমল সত্যিই খিঁচিয়ে উঠল।

"হ্যাঁ, তাই কি?" মণিমালা ঝাঁঝিয়ে উঠলো।

"ও তো আমি পারবো না। বলেই দিয়েছি আমার সময় নেই, আর তা ছাড়া · "

মণিমালা কথা শেষ করতে দিল না। গলায় আগুন ঢেলে চেঁচিয়ে বলেছিল, "আচ্ছা তোমার কি একটু সঙ্কোচও হয় না যখন যে প্রস্তাব আসে, তাতেই আপত্তি করো! বাজারে লজিকের একটাও ভালো বাংলা বই নেই। লিখলেই নাকি গরম পিঠের মতো বিক্রি হয়ে যাবে, তুমি তা থেকে মোটা রয়্যালটি পাবে। পাবলিশার নিজের থেকে এসে সাধাসাধি করছে, আর তুমি কিনা বোকার মতো আপত্তি করছো!"

"বোকা কি আর সাধে হচ্ছি। দেখতেই তো পাচ্ছ আমার এক ফোঁটা সময় নেই! এর ওপর আমি যদি বই লিখিও, সেইরকম তো আরও অনেক বই বাজার ছেয়ে যাবে, সুতরাং রয়্যালটি মারফত কটা টাকা আসবে, তা তো ভাবতে হবে।"

"তোমাকে সংসারের সব ভাবনা-চিন্তা থেকে রেহাই দিয়েছি। তোমার ছেলেমেয়ের পড়াশুনো থেকে শুরু করে সব কিছুর ভার আমি নিয়েছি! তবু তুমি পারবে না একটু পরিশ্রম করে আমাদের স্ট্যাণ্ডার্ডটা একটু উঁচু করতে! এই টানাটানির সংসারের একটু সাশ্রয় করতে!"

পরিমল ভয় পেলো। এর পরেই ঝড় উঠবে। অনেক কুটো উড়বে। 'আর্টস নিয়ে পাস করলে ঐরকম ভিজে ন্যাতাই হয়।' 'দৃষ্টি বড়ো না হলে স্ট্যাণ্ডার্ডের ধারণা আসবে কোত্থেকে!' 'হবে কি করে, যে পরিবারের ছেলে তুমি তার তো আদর্শ দিনগত পাপক্ষয়।' আরও কত কি। অতএব বই লিখতে হল, আর আশ্চর্য বিক্রিও হল, গরম পিঠের মতোই বিক্রি হল। পাবলিশার খুশি, "দেখলেন স্যর, আপনি লিখতে চাইছিলেন না, ভাগ্যিস বুদ্ধি যোগালো। বৌদিকে ধরলুম।"

মণিমালা হাসিভরা মুখে বললো, "কি রাগই না করেছিলে আমার ওপর এই বই লেখা নিয়ে, এখন কেমন লাগছে বলতো! তোমার বই-এর কাছে আর কোন বই-ই দাঁড়াতে পারছে না।"

মণিমালা পরিমলের সামনে এগিয়ে দিতে লাগলো ছানার ডিশ, ডিমের পোচ, মুখরোচক অথচ স্বাস্থ্যসম্মত সব্জী দিয়ে তৈরী নানা-রকম খাবার। পুরু করে মাখন মাখানো মুচ্‌মুচে পাঁউরুটি টোস্ট দিয়ে ঐসব খেয়ে সুগন্ধি গরম চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে পরিমলের মনে হয় সত্যি মণিমালার সাংসারিক নৈপুণ্যের সীমা নেই।

শুধু খাওয়া-দাওয়া! জামা-কাপড়ের ব্যাপারেও কি পরিমল কোনদিন বলতে পারবে সে সামান্যতম ময়লা ট্রাউজার বা বুশশার্ট পরেছে! এবং সে যে কাপড়ের পোশাক পরে, তা দামী এবং আধুনিক। বুশশার্টের কোণা ধরে আঙুল ঘষে সহকর্মীরা জিজ্ঞেস করে কত দাম পড়লো। যেদিন কলেজ থাকে, মণিমালা পরিমলের ব্যাগে সুদৃশ্য টিফিন বক্সে খাবার ভরে দেয়। অবসরমতো স্টাফরুমে বসে ঐ বাক্সটি বার করলেই সহকর্মীরা আড়চোখে তাকায়। দু-তিনজন ঝুঁকে দেখে জানতে চায় আজ কি খাবার পরিমল নিয়ে এসেছে। পরিমলের একটু সঙ্কোচ হয় যখন সে সুন্দর ত্রিভুজ আকারে পাত্‌লা করে কাটা বাড়ির তৈরী সাদা, নরম পাঁউরুটির স্যাণ্ডউইচ বার করে খায়, কয়েকখানা ফলের টুকরো খায়, আর সবশেষে খায় বড় মাপের একটা দামী সন্দেশ। সহকর্মীদের মধ্যে তখন যে কজন থাকে, তাদের কেউ খাচ্ছে কলেজের চিপ্‌ ক্যান্টিনের অখাদ্য ভেজিটেব্‌ল চপ, দুটো শুখ্‌নো পাঁউরুটি। কেউ বা খাচ্ছে পাঁউরুটি টোস্ট আলুর দমের লাল ঝোলে ডুবিয়ে ডুবিয়ে।

"আপনি ভাই অনেক পুণ্য করেছিলেন গতজন্মে, নইলে আমরা এতগুলো ভদ্রলোক এখানে পেটের ধান্দায় জড়ো হয়েছি, কোথায় কার বউ এমন করে স্বামীর খাবারের ভাবনা ভেবেছে, দেখুন দিকি…।"

ঠিক কথা, পরিমলের তখন আর কোন সঙ্কোচ থাকে না। বুক

ভরে ওঠে গর্বে। ভাগ্যিস মণিমালা তার জীবনে এসেছিল। কিন্তু তারপর! কলেজের পড়া তৈরী করে, প্রাইভেট ছাত্র-ছাত্রীদের খাতা দেখে, সারাদিনের ক্লান্তিভার মাথায় নিয়ে ঘুমে জড়িয়ে আসা দুটি চোখে যখন বিছানার দিকে এগিয়ে যেতে বাধা পায় পরিমল, তখন! হাতে ছোট্ট কাপে ধোঁয়া ওঠা কফি নিয়ে মণিমালা এগিয়ে আসে পরিমলের দিকে…"লক্ষ্মীটি, আর একটি ঘণ্টা জেগে থাকো, টেবিলে সব গুছিয়ে রেখেছি, বইটা কারেকসন করে ফেল। পাবলিশার বলে গেছে এই এডিসনে কি সব যেন জুড়ে দিতে। তোমার সঙ্গে নাকি এই নিয়ে কথা হয়েছে…প্লীজ লিখতে বোস গিয়ে। লিখলেই যখন টাকা…।"

পরিমল ঘড়ি দেখে বললো, "এখন কটা বাজে জানো! সাড়ে দশটা বেজে গেছে। কতক্ষণ আর লিখতে পারবো…!"

"অন্তত: এক ঘণ্টা লেখ। তাতেও তো অনেকটা কাজ এগিয়ে থাকবে। আর তা ছাড়া নতুন করে কোন বই লেখা নয় তো, একটু আধটু কারেকসন করে, এদিকে ওদিকে জুড়ে দিয়ে নতুন সংস্করণ করা, এই তো…।"

"তোমার বোধ হয় মনে নেই কালকে আমার সকালের কলেজ আছে। ভোর ছটা চল্লিশে ক্লাসটাই আমার…।"

"আমি ঠিক সময়ে জাগিয়ে দেবো, ভেবো না। তুমি যাও লিখতে বসো গিয়ে।"

আজকাল প্রায়ই রাত্রিবেলা পরিমলের ঘুম হয় না। এক ডাক্তার-বন্ধু বলেছে—অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফল। এ জিনিস ভালো না। ভবিষ্যতে খারাপ কিছু ঘটবে।

নিঃস্তব্ধ বিনিদ্র রাতে বিছানার মধ্যে কতদিন পরিমল উঠে বসে থাকে, তারপর হাতজোড় করে প্রণাম করে দার্শনিক কাণ্ট আর শঙ্করাচার্যকে, প্রণাম জানায় ডক্টর মহাস্তিকে—"আমাকে তোমরা ক্ষমা কোরো, নিজগুণে ক্ষমা কোরো…।"

একদিন একটা বিয়ে বাড়িতে আচম্‌কা দেখা হয়ে যায় মিনু পিসী পরিমল পিসেমশায়ের সঙ্গে টিনার, টিনার মা-বাবার। মিনু পিসী চোখ বড়ো বড়ো করে তাকিয়েছিল গ্রাম সুবাদে সেই কবেকার দেখা নুটুদার দিকে। নুটুদা এত বড়োলোক! অমন সুন্দরী স্ত্রী, ফুলের মতো মেয়ে! কি ঝকমকে সাজগোজ, কি প্রকাণ্ড গাড়ি, বিয়ে বাড়িতে ওদের কি খাতির! অতএব আর দেরি নয়। ওদের সঙ্গে ঘনসন্নিবিষ্ট হতে হবে। সমাজে উঠে যদি দাঁড়াতে হয়, জীবন ধারণের স্ট্যাণ্ডার্ড যদি উঁচু করতে হয়, তা হলে এই রকম সিঁড়ির বড়ো দরকার।

"নুটুদা, তুমি আর সেই তুমি নেই। কি দারুণ ভি. আই. পি., ভি. আই. পি. চেহারা হয়েছে তোমার! আর এই পদ্মিনী বৌদিকে কোত্থেকে খুঁজে পেলে! তোমাদের মেয়েটাও তো একটা মিষ্টি প্রজাপতি …।"

আরও কত কথা সেদিন তড়বড়িয়ে বলে গিয়েছিল মিনুপিসী। কেবল টাকার লেনদেনের ব্যস্ত জীবনের ইতিহাসে মা-বাবার দেওয়া কোন্ ছোটবেলার ডাকনাম 'নুটু' উচ্চারণে সমীরণ ব্যানার্জীর মনের কোন্ তারে ঘা লেগে কেমন যেন রিন্‌রিন্ করে উঠলো। মিনু পিসীর কথায় মা, বাবা দুজনেই মুগ্ধ হল, মিনুপিসীর ব্যবহারের আন্তরিকতায় দুজনে খুশী হল। আর এই সাক্ষাতের মাত্র চারদিন পরে মিনুপিসী পরিমল পিসেমশাই আর ছেলেমেয়েকে নিয়ে টিনাদের বাড়িতে বেড়াতে এলো। গল্প করে, হেসে, সংসার করার সমস্যা আলোচনা করে কয়েকঘণ্টা বাড়িটাকে মাতিয়ে রেখে নিজের বাড়ি ফিরে গেল। যাবার সময়, দিন আর সময় নির্দিষ্ট করে গেল যেদিন দুপুরবেলা নুটুদা, বৌদি আর তাদের টিনা মিনুর বাড়ি গিয়ে তার হাতের রান্না দুটি ডাল-ভাত খাবে।

"কোন ওজর আপত্তি নয় নুটুদা, তোমাকে কথা দিতে হবে, বউ মেয়েকে নিয়ে যাবে। ছেলেবেলায় গ্রামের বাড়িতে কাড়াকাড়ি করে কুল খেয়েছি, আমতেল মাখা মুড়ি খেয়েছি। এবার তোমাকে একটু ধীরে সুস্থে লক্ষ্মী বোনের মতো খেতে দেবো …।"

টিনার বাবা অবশ্য কিছুতেই মনে করতে পারলো না গ্রামে থাকতে কোনদিন মিনুর সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে কোন কিছু খেয়েছে কিনা। মণিমালা বা মিনু, দূর সম্পর্কে খুড়তুতো বোন, মাঝে মধ্যে তাদের বাড়ি আসতো, হৈচৈ করে কথা বলতো, দুদ্দাড় করে চলতো। নুটুদাকে একবার কোঁচোড় ভর্তি কুল দেখিয়ে বলেছিল, "একসঙ্গে ছ'টা বড় বড় কুল দেবো, যদি তুমি তোমার ঐ সাপলুডুটা একবার খেলতে দাও।" আশ্চর্য কতদিন পরে ধনী ব্যবসায়ী সমীরণ ব্যানার্জী তার চারপাশে ভিজে মাটির একটা সোঁদা গন্ধ টের পেল। গ্রাম সুবাদে বোনের মুখে বার বার 'নুটুদা' ডাকটি শুনতে ইচ্ছে করলো, সমীরণ ব্যানার্জীর আরও ভালো লাগলো মিনুর ছোট বেলাকার সেই চঞ্চল চেহারাটুকু এখনও বজায় আছে দেখে। এই বয়সে বাঙালী মেয়েরা তো সাধারণত এলোমেলো ঝুলের মতো সংসার করে। ছেলেমেয়ে ঠ্যাঙায়। স্বামীকে সাতকাহন কথা শোনায়। কালিমাখা মুখে সংসারের যাঁতা ঘোরায়।

মিনুপিসীকে মা পছন্দ করেছিল সেই প্রথম দিন থেকে, আবার উচ্ছ্বসিত হোল যেদিন নির্দিষ্ট সময়ে মিনু পিসীর বাড়িতে গিয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করে বাড়ি ফিরে এলো। মা-বাবার সঙ্গে টিনাও গিয়েছিল। মায়ের উচ্ছ্বাসের সত্যিই যুক্তি ছিল। ঐ ছোট্ট ফ্ল্যাটটাকে মিনুপিসী কি গুছিয়ে, কি সুন্দর করে রেখেছে। কি যত্নে কত রুচিকর রান্না রেঁধে মিনুপিসী কি নিপুণ ভাবে খাবার টেবিলে পরিবেশন করেছিল। টেবিল ম্যানার্সে কোন ত্রুটি নেই, ত্রুটি নেই আদর যত্নে। মিনু পিসীর কী আগ্রহ ছেলে-মেয়েদুটিকে মানুষ করে গড়ে তোলার জন্য! তাদের জন্য কী চিন্তা!

"ওরা লেখা পড়া কেমন করছে! কোন্ স্কুলে পড়ে!" মা ছেলেমেয়ে দুটিকে কাছে টেনে নিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল। ওদের নখ-চুল থেকে জামা-কাপড় পর্যন্ত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। অথচ সাধারণ কাপড়ের হালকা জামা।

মিনু পিসী সেদিন সখেদে উত্তর দিয়েছিল, "ভালো স্কুলে দিতে

ইচ্ছে করে বৌদি, মেয়েটাকে অবশ্য খুব খারাপ স্কুলে দিইওনি। তবে এখানে মেয়ে আমার এত সহজে ফার্স্ট হচ্ছে যে মনে হয় সাউথ পয়েন্টের মতো কোন স্কুলে দিতে পারলে কম্পিটিশন থাকতো, মেয়ে আরও ভালো হোত—।"

পরিমল পিসেমশাই সামান্য হেসে বলেছিলেন, "টাকায় কুলোতে পারলে তাই দিতাম—" কথা শেষ হবার আগেই মিনুপিসী চেঁচিয়ে বলে উঠেছিল, "শোনো বৌদি, মুটুদা, তুমিও শোন। এমন লেখাপড়ায় ভালো মেয়েটাকে একটা বড়ো স্কুলে দিতে তার বাপ কেমন চুপ্‌সে যাচ্ছে। তোমরা জানে না মেয়ে আমার কি গান করে। গলা কি মিষ্টি। ওর হাতের আঁকা দেখে ড্রইংএর টিচার আমাকে একবার বলেছিলেন ওকে আঁকার লাইনে দিলে ও নাকি অদ্ভূত নাম কোরবে। তা হলে, সব দিকে ভালো এই মেয়েকে আমি অযত্নে ফেলে রাখবো···!"

"তোর ছেলে কি বলে?" বাবা হেসে জিজ্ঞেস করতে মিনু পিসী গলায় ক্ষোভ ঢেলে বলেছিল, "বিশ্বাস কর, আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না, অভি একবার যেটা শোনে, যে শব্দটা শেখে, তা সে ইংরেজীই হোক আর বাংলাই হোক, ভোলে না। এই তো সবে চার বছর বয়স। জিজ্ঞেস করে দেখ, ইংরেজী শব্দ কত জানে। কি পরিষ্কার মাথা। বড় বড় যোগ করে। মুখে মুখে এক সংখ্যা, দু-সংখ্যার বিয়োগ করে। ও যে কিছুই ভোলে না। রাজ্যের বই পড়তে ওর আগ্রহ দেখলে তোমরা ওকে পাগল বলবে··।"

"একেবারে বাপের ব্রেন পেয়েছে"—মায়ের কথার উত্তরে মিনু পিসী হাত জোড় করে বললো, "রক্ষে কর, বাপের ব্রেন পেয়ে আবার যেন বাপের মতো কপালে মাস্টারী না জোটায়—।" "কেন, মাস্টারী করে কি পরিমল কম পায়! তুই এমন করে সংসার চালিয়ে বুঝতে পারছিস না!"

বাবার কথার উত্তরে মিনু পিসী বলেছিল, "পাঁচগাছের ফল মুটুদা, সাজিতে কখন কটা উঠবে বোঝা যায় না। কখনও একেবারে

দশ-বারোটি ছেলেমেয়ে পড়লো, কখনও বা দু-তিনটির বেশি থাকলো না। তাই আমার সংসার গুছনো ঠিকই, কিন্তু বাজেট বড় অনিশ্চিত—" একটু থেমে মিনু পিসী বলেছিল, "তা ছাড়া নুটুদা, তোমার ভগ্নীপতির সাবজেক্টটাও তো স্যাতনেতে। হোত ইংরেজী কিংবা কোন সায়েন্স সাবজেক্ট, সারা বছর ধরে ছেলেমেয়ের ভিড় লেগে থাকতো, তা হলে আমি এতো ভাবতাম না—।"

এর পর মিনু পিসী কয়েকবার টিনাদের বাড়ি এলো। টিনারাও গেল। বাবা গেল না। সময় হয়ে ওঠেনি। টিনাকে নিয়ে মা গেল। পরে কয়েকবার মা একা গেল। মিনু পিসীর সঙ্গে মায়ের ঘনিষ্ঠতা প্রথম প্রথম টিনাকে বিস্মিত করতো। মার কত বড়, কত উঁচু ঐশ্বর্যে ভরা পরিচিতের সারকেল, আর কোথায় পড়ে আছে মিনু পিসী পরিমল পিসেমশাই। পরে টিনার মনে হয়েছিল মা তো সমানে ঝক্‌মকে মেয়ে-পুরুষদের সঙ্গে মেশে, কথা বলে। তার মাঝে মিনুপিসীর সংসার, ওদের কথাবার্তা নিশ্চয়ই গঙ্গা মাটির প্রলেপের মতো স্নিগ্ধ লাগে। তা ছাড়া মিনু পিসীকে মায়ের ভালো লাগার আরও কারণ আছে। মা সেবার দুরন্ত জ্বরে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল, জ্বর আর নামে না। কোলকাতার সেরা সেরা ডাক্তার চিকিৎসা করতে লাগলো। রক্ত পরীক্ষা করে জানা গেল টাইফয়েড। দিনে রাতে দুটি নার্স আর ডাক্তারে মিলে হৈচৈ হল। মার ভোগান্তি গেল দিন পনেরো। পুরো সেরে উঠতে গায়ে বল পেতে আরও দশ দিন। তখন কতবার এসেছে মিনু পিসী। কোথায় গড়িয়াহাটা আর কোথায় নিউ আলিপুর! মা ঐ জ্বর অবস্থাতেই ক্ষীণকণ্ঠে বলেছিল, "তুই কেন প্রতিদিন পয়সা খরচ করে ছুটে আসিস বল্ তো! তোদের পাশের ফ্ল্যাটে তো ফোন আছে, ফোনেই তো আমার খোঁজ নিতে পারিস—।"

"ফোনে তো তোমাকে দেখা যাবে না বৌদি—" মিনু পিসীর আন্তরিকতায় মার মন ভরে উঠতো। মিনু পিসী কি সুন্দর করে মার চুলে, ঘাড়ে, পিঠে হাত বুলিয়ে দিত। টিনা স্পষ্ট বুঝতে

পারতো মায়ের খুব আরাম হচ্ছে, ভালো লাগছে। মায়ের নির্দেশেই বাবা মিনু পিসীকে বললো, "এবার থেকে গাড়িতে আসবি, গাড়িতে যাবি। তোর বৌদির গাড়িটা তো গ্যারাজে বসেই আছে। টিনাকে শুধু স্কুলে নিয়ে যায় নিয়ে আসে—।"

কি অন্তরঙ্গতাই না গড়ে উঠলো মিনু পিসীর সঙ্গে এই পরিবারের। মা বাবা মুগ্ধ টিনা মুগ্ধ। মিনু পিসীকে পছন্দ করলো সন্তুদি, বাড়ির ঠাকুর বাবুর্চি, দরোয়ান, বেয়ারা, ড্রাইভার সবাই, এমন কি রীতা ভার্মা পর্যন্ত।

মিনু পিসী কেমন সুন্দর করে রীতা ভার্মার কাছে আব্দার করলো— "আমাকে একটু চলনসই ইংরেজী কথাবার্তা বলতে শিখিয়ে দিন না রীতা দি—।"

রীতা ভার্মা হেসে ফেলেছিল, বলেছিল, "আমাকে কী দেবেন আগে বলুন—!"

মিনু পিসী সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছিল. "একটা কার্ডিগান বুনে দেবো, একেবারে আপনার চেহারার সঙ্গে মানিয়ে—."

রীতা ভার্মা বিস্মিত হয়ে বলেছিল, "চেহারার সঙ্গে আবার কি করে মানাবেন—!"

মিনু পিসী একটুও না থমকে বললো, "কেন, উলের রং হবে সোবার, ডিজাইনটা হবে গর্জিয়াস—."

রীতা ভার্মা হেসেছিল এবং খুশি হল যখন সত্যিই মিনু পিসী অফ হোয়াইট রং-এর উল দিয়ে অতি সুন্দর ডিজাইনের আধুনিক ফ্যাশানের কার্ডিগান বুনে রীতা ভার্মাকে একেবারে পরিয়ে দিল।

"সত্যিই আপনি করিতকর্মা," রীতা ভার্মা মুগ্ধ কণ্ঠে বলেছিল, "আমি আপনার এই অমূল্য উপহারের কথা চিরকাল মনে রাখবো—."

"আমিও মনে রাখবো আপনি আমার ছেলেমেয়ের জন্য যা করেছেন—" মিনু পিসীর গলা বুজে এলো। ছেলেকে সেণ্ট জেভিয়ার্সে দেবার আগে, মেয়েকে আগের স্কুল ছাড়িয়ে সাউথ

পয়েন্টে ভর্তির যোগ্যতা লাভের জন্য সত্যিই রীতা ভার্মা ওদের মন প্রাণ দিয়ে ইংরাজী পড়িয়েছে, শিখিয়েছে। মিনু পিসীর জীবনে আর কিসের চাহিদা। একটি অভাবহীন ছিমছাম সংসার! উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিয়ে ছেলেমেয়ে মানুষ হবে। স্বামী-স্ত্রী প্রাণপাত পরিশ্রম করে তাদের বড় হতে সাহায্য করবে, এইটুকুই তো!

মিনু পিসী হঠাৎ ব্যস্ত হ'য়ে উঠলো। বাড়ি ফিরে এক্ষুনি পরিমলকে বলতে হবে, পাবলিশার ফোন করেছিল, পরিমল প্রশ্নোত্তরের ছাঁচে সহজ ইংরেজীতে একখানা বই লিখতে পারবে কিনা। কারণ অবাঙালী ছেলেমেয়েদের দর্শনশাস্ত্র পড়বার মতো ভালো অথচ সহজবোধ্য একখানা নোট বই-এর একান্ত অভাব।

মিনুপিসী চলে যেতে সেদিন মা মন্তব্য করেছিল, "মিনুর সব ভালো, কেবল খারাপ লাগে ও যখন পরিমলকে একটুকু বিশ্রাম করতে দেয় না। বেচারী কলেজের পরিশ্রম সেরে এতগুলি টিউশনী করে টিউটোরিয়াল হোম সামলে আবার কি করে যে এত কাজের পরেও বই লেখে, নোট লেখে জানি না।"

সন্তমাসী বলেছিল—"স্ত্রীর যত্নে পারে। মিনুর মতো কোন্ মেয়ে স্বামীকে সবদিক থেকে অত টিপ্‌টপ্ রাখে বল দেখি! স্বামীর খাটুনির সঙ্গে তাল রেখে খাওয়ার দিকে কেমন খর দৃষ্টি!"

কথা শেষ না হোতেই মা উত্তেজিত হয়ে বলেছিল, "কেবল ছানা, মাংস, ফল খেতে দিলেই হয় সন্তুদি? একটা মানুষ বিশ্রাম জানবে না, গল্প করবে না, একটু হাত-পা ছড়িয়ে নিশ্চিন্তে শোবে না! পরিশ্রম করারও তো একটা সীমা আছে!"

কিছুদিন পরে মায়ের আগ্রহ আর ইচ্ছাতে বাবা তার ব্যবসা-সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন বিভাগে পরিমল পিসেমশাইকে একটা কাজের ভার দিল। বিজ্ঞাপন সাজানো, কায়দা করে ইংরেজী ও বাংলা দু ভাষাতেই নানান ধরনের বিজ্ঞাপন লেখার দায়িত্বভার পড়লো পরিমল পিসেমশাইয়ের ওপর। আর্টিস্টের সঙ্গে বোঝাপড়া করে পরিমল পিসেমশাইকে কাজ করতে হবে।

"তুমি যেমনভাবে বিজ্ঞাপন লিখবে, আর্টিস্ট ঠিক সেইভাবেই স্কেচ করবে! আসলে তুমি তোমার ইচ্ছেমতো কি ধরনের ছবি আঁকতে হবে বুঝিয়ে দেবে। শুধু মনে রাখবে যুগটা বিজ্ঞাপনের যুগ।" পিসেমশাই অভিভূত হয়ে বাবার কথাগুলি শুনেছিলেন।

পরিমল পিসেমশাইর মাইনে হল তিনশ। তার ওপর কনভেইয়েন্‌স্ এলাওয়েন্‌স্। শেষের অতিরিক্তটুকু মার বিশেষ অনুরোধের ফল। এরপর মায়ের নির্দেশে পরিমল পিসেমশাই মাত্র একটা ট্যুইশনি রেখে আর সব ছেড়ে দিয়েছিলেন। তবে নোটবই লেখা ছাড়তে পারেন নি। মিনু পিসীর যুক্তি অকাট্য। স্পষ্ট গলায় বলেছিল, "নোট বই-এর রয়্যালটির ওপর আমার ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ দাঁড়িয়ে আছে। আর তাছাড়া নুটুদা তো তোমার পরিশ্রম অনেক হাল্‌কা করে দিয়েছে। মাথার খাটুনি তো কমে গেছে!"

পরিমল পিসেমশাই বোঝানোর চেষ্টা করলেন না যে এক একটা বিজ্ঞাপন তৈরী করার পেছনে মাথার কতো পরিশ্রম, কত চিন্তা, কল্পনা আর ভাষার কারিকুরি এবং এই কাজে সাফল্যের জন্য পৃথিবীর কতো জিনিসই না জানতে হয়।

পরিমল চ্যাটার্জী একটা ট্যাবলেট খেলেন। রোজ দুবেলা দুটো। মাথার ব্যথাটা মাঝে মাঝেই টন্‌টনিয়ে উঠছে, ডাক্তার বন্ধুটি বলেছে, "এ ভালো নয়, মাথার পরিশ্রম একটু কম কর, নইলে পরে একেবারে শুয়ে পড়বে।" মণিমালাকে এ-সব বললে এমন চেঁচামেচি করবে, ডাক্তার ডাকবে, যে সে আরেক অসোয়াস্তি হবে।

টিনা কাঁচের জানলা দিয়ে আরেকবার তাকিয়ে দেখলো মিনু-পিসীর ঘরের দিকে। অন্ধকার ঘর, আজ লাঞ্চের পর বাসে করে ওরা চলে গেছে রেল স্টেশনে। এতক্ষণে রেলগাড়িতে ঝিকঝিকিয়ে চলেছে কোলকাতার দিকে। সেখানে গিয়েই তো মিনু পিসীর মেয়ের পরীক্ষা, ছেলের পরীক্ষা। মিনু পিসী সমানে ছেলেমেয়ের কানের কাছে গুনগুন করে যাচ্ছে পরীক্ষায় দুজনকেই ফার্স্ট হতে হবে, ফার্স্ট

হতে হবে। ওরা চলে যাওয়ার পর বড় মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল টিনার। টিনারা সব একসঙ্গে এখানে এসেছিল। মা-বাবা সব ব্যবস্থা করে গিয়েছিল। টিনা জানে সব খরচাখরচি ছিল মা-বাবার। বিদেশে গেলে তাদের একমাত্র সন্তানের মন ভাল থাকবে না এটা মা-বাবা দুজনে বুঝতে পেরে টিনা-রীতা ভামার সঙ্গে মিনু পিসীদেরও আসবার ব্যবস্থা করে দেয়। মনে আছে এখানে আসবার সবকিছু ঠিক হয়ে যাবার পর বাবা মাকে হেসে বলেছিল, "যাক, পরিমল একটু ঘুমিয়ে বাঁচবে, এই ব্যবস্থায় তুমি অনেক পুণ্যসঞ্চয় করবে কিন্তু।" মা-ও হেসে উত্তর দিয়েছিল, "যা বলেছো, ছেলেটার জন্য আমার মায়া হয়।"

মিনু পিসীরা যে ঘরে ছিল, তার পাশের ঘরে আলো জ্বলে উঠলো। চন্দ্রকান্ত দাদু নিশ্চয়ই। উনি রাত্রিবেলা যে কতবার ওঠেন তার ঠিক নেই। শুধু যে বাথরুমে যান বা জল খান তা নয়। টিনাকে বলেছেন অনেক সময় নাকি তিনি উঠে এমনি এমনিই বসে থাকেন।

"রাত্রিবেলা শুধু শুধু বসে থাকেন?" টিনা অন্তত পাঁচ-ছবার এই প্রশ্ন করেছে।

"কি করবো টিনাদিদি, ঘুম আসে না যে। অন্ধকার ঘরে বুকের ভেতরটা যেন কেমন করে ওঠে। তখন মনে হয় এইবার বুঝি সেই মুহূর্তটা এসে গেছে, যার বর্ণনা আজ পর্যন্ত কেউ দিতে পারেনি—" চন্দ্রকান্ত দাদুর গলাটা কেমন যেন নিস্তেজ হয়ে আসে।

"একা একা তো, ঐ জন্য মনের মধ্যে কেমন করে, আসলে বুকের মধ্যে কিছু হয় না –।"

টিনার কথার উত্তরে চন্দ্রকান্ত দাদু হেসে বলেন, "টিনা দিদি, তোমার এই কথাটা ঠিক তোমার মতো করে যদি কেউ ঐ সময়ে আমাকে বলে, তা হলে তো আমি নিশ্চিন্তে শুয়ে তক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়ি—।"

"আপনি তো এখানে অনেক দিন আছেন ? আমাদের আসবার অন্তত দিন দশেক আগে তো বটেই—।"

"দিন দশেক নয় দিদি। ঠিক সতেরো দিন আগে। তোমরা এসেছো তেরোই সেপ্টেম্বর, আর আমি এসেছি ছাব্বিশে অগাস্ট। তারপরেও তো কত দিন কেটে গেল। বল তো দিদি, বুড়ো বয়সে এতদিন বাড়ি ছেড়ে ভালো লাগে ?"

"আপনার নাতনী চন্দ্রিমা, যাকে আপনি চাঁদ বলে ডাকেন, নিশ্চয়ই আপনাকে চিঠি লিখে লিখে তাগাদা দিচ্ছে ফিরে যাবার জন্য—।"

চন্দ্রকান্ত দাদু হেসেছিলেন, একটু শব্দ না করে হেসে বলেছিলেন— "চিঠি লিখে লিখে আর কোথায় দিদি, আমি এখানে এলাম, তার দিন কুড়ি পরে একখানা চিঠি দিয়েছিল, তাও আমার বড় বৌমা, ওর মায়ের লেখা চিঠির এক অংশে···"

"কি লিখেছিল···!"

"লিখেছিল, আমার নিশ্চয়ই বরফে ঘেরা এই সুন্দর শহরটাকে ভালো লাগছে, শরীরও নিশ্চয়ই ভালো আছে। সুতরাং কোলকাতায় ঐ দমআটকানো আবহাওয়ায় যতদিন না গিয়ে থাকা যায়, ততদিনই ভালো। বিশেষ করে মিসেস ক্লার্কের খ্যাতিই আছে উনি বোর্ডারদের খুব যত্ন করেন। এর ওপর আবার বিপিন আছে।—ঠিক ওর মা যা যা লিখেছিল, ও-ও তাই লিখেছিল···।"

চন্দ্রকান্ত দাদু এবার একটু শব্দ করে হেসে বললেন, "জানো, এই চাঁদ যখন ছোট ছিল, তখন প্রায় রাতেই বালিশখানা নিয়ে আমার কাছে ছুটে চলে আসতো। একবার আমি দিন সাতেকের জন্য দেওঘরে গিয়েছিলাম, এসে দেখি আমার চাঁদের মন খারাপ হয়ে জ্বর এসে গেছে। আমাকে দেখে দু-হাত দিয়ে গলা জড়িয়ে সে কী ঠোঁট ফুলিয়ে ফুলিয়ে কান্না। বড়বৌমা বললেন, বাবা, আপনি এবার থেকে ওকে রেখে কোথাও যাবেন না। আমাকে এই সাতদিন চোখ বুজতে দেয়নি, বিরক্ত করে খেয়েছে ··।"

"তখন চাঁদের কত বয়স ছিল!"

"কত আর বছর ছয়েক—"

"এখন কত বড় হয়েছে—?"

"তা হল বই কি, পনেরো পার হয়ে ষোলয় পা দিয়েছে—।"

"চাঁদ কেমন দেখতে চন্দ্রকান্ত দাদু—"

"ঠিক তোমার মতো। তবে তুমি দিদি যা সুন্দরী, ও ততটা নয়। তবে মন্দও নয়। গায়ের রং অবশ্য ওরও বেশ ফর্সা—"

"আপনার আর নাতি-নাতনীরা কোথায়?"

"আর নাতি-নাতনী বলতে তো মেজবৌমার দুটি ছেলে। বড় ছেলেটিকে দশ বছর বয়স থেকেই রেখেছে দার্জিলিং-এ। আর ছোটটি তো সবে দু-বছর পার হচ্ছে—।"

"ওর জন্য মন কেমন করে না—?"

"করে না আবার টিনাদিদি! ওযে আমার মহারাজ ভাই। বাড়ির সকলে ডাকে তাতুন বলে। আমার কাছে ও মস্তবড় এক মহারাজ। এই নামে ডাকলেই একগাল হেসে সাড়া দেয়, ছুটে আসে। আমার হাতে বল দেয়, নিজের হাতে বল রেখে খেলতে বলে—"

"ওর জন্যে মন খারাপ হয়ে আপনার বুকের মধ্যে কেমন করে ওঠে, ঠিক বলেছি না—!"

"একেবারে সেন্ট পারসেন্ট ঠিক টিনাদিদি। কিন্তু উপায় কি? বাড়ির সবাই বলছে আরও মাসখানেক এখানে থাকতে। ক্রমেই তো শীত বাড়ছে। আমি কি আর পারি এই বাড়ন্ত ঠাণ্ডা সহ্য করতে—!"

"চিঠিতে লিখে দিন—"

"লিখেছিলাম তো দিদি, কিন্তু মেজবৌমা উত্তর দিলেন, দরকার হলে রুম হিটার ব্যবহার করতে। টাকা খরচে তো কোন অসুবিধে নেই—।"

টাকা খরচে সত্যিই বাধা নেই। চন্দ্রকান্ত মৈত্র নিজে সরকারী

বড় চাকরি করতেন। এখন পেন্সন পান। তিন ছেলে এক মেয়ে। প্রথমে ছেলে, তারপর মেয়ে। মেয়ের পর আর দুই ছেলে। মেয়ের অনেকদিন বিয়ে হয়ে গেছে। জামায়ের বড় ব্যবসা। তিন ছেলে অজিত, অমিত, সুমিত জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। তিন জনেরই মাসিক বেতন চার অঙ্কের। এর মধ্যে ছোট ছেলে তো মিড্‌ল ইস্টে দুবাই-এ একটা ফার্মের চিফ্‌ এঞ্জিনীয়র। তার মাইনের সঙ্গে প্রথম দুই ছেলে কোনদিনই সমান দূরের কথা, ধারেকাছেও যেতে পারবে না। সুমিত, সুমিতের বউ দুজনেই আছে দুবাই-এ। বছরে একবার করে আসে। বাপের জন্য মোটা অঙ্কের টাকা পাঠায়। বাপেরও ছোট ছেলে-অন্ত প্রাণ। স্ত্রী নির্মলা যখন মারা যায়, তখন ঐ ছেলে শিবপুর বি. ই. কলেজ থেকে ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছিল। রেজাল্ট বেরোয়নি। নির্মলা মৃত্যুর ঘণ্টা দুয়েক আগেও ছটফট করেছিল ছেলের রেজাল্টের জন্য। নির্মলার ধ্রুব বিশ্বাস ছিল তাঁর ছেলে ফার্স্ট হবেই। হলও তাই। মায়ের শ্রাদ্ধ শান্তি হয়ে যাবার তিনদিন পরে সুমিত বন্ধুর একটা টেলিফোন পেয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। মায়ের কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে। শুধু ফার্স্ট ক্লাস নয়। সিভিল এঞ্জিনীয়ারিং-এ এবার ফার্স্ট হয়েছে সুমিত মৈত্র। বড়দা, মেজদা খুশির উচ্ছ্বাসে যখন চেঁচিয়ে বাড়ি মাত করছিল, সুমিত তখন মায়ের বড় বাঁধানো ছবির সামনে দাঁড়িয়ে অঝোরে চোখের জল ফেলছিল। "আর তো মাত্র কয়েকটা দিন মাগো, তুমি বেঁচে থাকতে পারলে না—"

পিঠে হাতের স্পর্শ পেয়ে সুমিত ফিরে বাপের মুখের দিকে তাকিয়েছিল। চন্দ্রনাথেরও দু-চোখে জল। "কাঁদিস্ না বাবা, তোর মা দুঃখ পাবে। তোর এতটুকু কান্না, এতটুকু ব্যথা তোর মা সহ্য করতে পারতো না।"

সুমিত বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হল। বাবার মুখখানা এত শীর্ণ হয়ে গেছে! মুখের চামড়ায় এত কোঁচ পড়েছে! সেই মুহূর্তে বাবার জন্য, বাবার একেবারে নিঃসঙ্গ জীবনের জন্য

সুমিতের মন এক বিচিত্র বেদনায় ভরে উঠলো। এখন সুদূর দুবাইতে গিয়ে, অত কাজের ফাঁকে সুমিত তার বাপের কথা ভাবে। স্ত্রী সোমাকে প্রায়ই বলে, "বাবা বড় একা, বড় অসহায়। জানো, ওখানে একদিন দেখি বাবা একটা পোস্টকার্ডের জন্য একবার বড়বৌদি, একবার মেজবৌদিকে বলছে। কিন্তু কারোর কাছ থেকেই আছে কি নেই কোনও সঠিক উত্তর পাচ্ছে না।"

"সে আমি জানি, বড়দি, মেজদি দুজনেই সেদিন বাবার আড়ালে বলেছিলেন—ছানিপড়া চোখে আবার চিঠি লেখা কেন।' সোমা সেদিনই বলেছিল, "ব্যবস্থা কর, আমরা বাবাকে আমাদের কাছে নিয়ে যাবো।"

"বাবাকে তো বলেছিলাম। অবশ্য সকলের আড়ালে, বাবা যে রাজি হলেন না, বললেন, তোমার দাদা, বউদিরা কি মনে করবে। আত্মীয়-স্বজনরা তো মন্তব্য করবার জন্য মুখিয়ে আছে। এতে তোমার দাদা-বউদিদের লজ্জার মধ্যে ফেলা হবে।"

বাড়ি থেকে অনেক দূরে বসে সুমিত বুক চেপে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। সোমা কী যত্নে ওর সামনে টেবিলে খাবার সাজিয়ে দেয়! আর বাবা! খেতে নিশ্চয়ই পাচ্ছেন, কিন্তু যত্ন! একটু দরদের সঙ্গে তদারক! না, তা পান না চন্দ্রকান্তবাবু। তাই চন্দ্রকান্তবাবুকে এখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই তিনি এই নিঃসীম রাত্রে বরফের দিকে তাকিয়ে কত কি ভাবেন।

ছোট ছেলের বউ সোমা বিয়ের পর মাত্র আট মাস কোলকাতায় ছিল। তারপরেই স্বামীর সঙ্গে চলে যায় দুবাই-এ। ঐ আটমাস চন্দ্রকান্ত মৈত্র ঠিক যেন কবে হারিয়ে যাওয়া মায়ের যত্ন পেয়েছিলেন। মায়ের সতর্ক দৃষ্টি সারা গায়ে মেখে আনন্দের হাওয়ায় ভাসছিলেন। বড় লক্ষ্মী মেয়ে সোমা, লক্ষ্মীর মতো মুখশ্রী দেখেই তো অতি সাধারণ অবস্থার পরিবার থেকে সোমাকে নিয়ে এসেছিলেন। কথাবার্তায় বিনীত, অথচ চটপটে, বুদ্ধিমতী। বড়বৌমা, মেজবৌমা, দুজনেই অবস্থাপন্ন বাপের মেয়ে। দাবি না থাকলেও প্রচুর গয়না আর

জিনিসপত্র নিয়ে তারা এই বাড়িতে এসেছিল। সেই তুলনায় সোমা প্রায় কিছুই নিয়ে আসেনি। এই বিয়ে স্থির হবার সময় বড়বৌমা মেজবৌমার দিকে তাকিয়ে শ্বশুরের সামনেই হেসে বলেছিল, "এই মেয়ে এসে যে প্রত্যেক কথায় তোৎলাবে, প্রতি পদে হোঁচট খাবে। এই মেয়ে আমাদের মতো পরিবারের সঙ্গে মিশবে কি করে?"

চন্দ্রকান্তবাবু একবার শুধু বলেছিলেন, "মানিয়ে নিতে না পারার তো কিছু দেখছি না। বি. এ. পাস, চেহারায় সুশ্রী, ব্যবহারে সপ্রতিভ। আর তাছাড়া যে বিয়ে করবে, সে তো নিজের চোখে দেখেছে, দু-চারটে কথাও বলেছে।"

বাপের আদেশে সুমিত যেদিন সোমাকে দেখে এলো, চন্দ্রকান্ত-বাবু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখেছিলেন ছেলের মুখের দিকে। মুখে খুশির ছায়া তিনি পড়তে পেরেছিলেন; তবু রাত্রিবেলা ছেলেকে ডেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "মনে এতটুকু দ্বিধা থাকলে বলবে, আমি পছন্দ করেছি বলেই তোমাকে আমি তা মেনে নিতে বাধ্য করবো না।"

সুমিত মাথা নীচু করে উত্তর দিয়েছিলেন, "আমার আপত্তি হলে তো আমি বাড়ি ফিরেই তোমাকে বলতাম।"

একেবারে নিভে যাওয়া চন্দ্রকান্ত মৈত্র আবার হাসি খুশিতে ভরে উঠেছিলেন—সোমা এ বাড়িতে বৌ হয়ে আসবার পর। স্পষ্ট বুঝতে পারতেন বড়বৌমা, মেজবৌমা শ্বশুরের ওপর ছোট বৌ-এর এতটা কর্তব্যনিষ্ঠা, এত আন্তরিকতা পছন্দ করছে না, আর করছে না বলেই সব বিষয়ে তাকে একঘরে করে রেখেছে। চন্দ্রকান্তবাবু আশ্বস্ত হতেন যখন দেখতেন সোমা বিনীতভাবে সবকিছু উপেক্ষা করছে। সবকিছু না দেখার, না বোঝার নিখুঁত অভিনয় করে যাচ্ছে। ভুলেও কোন সংঘর্ষের মধ্যে যাচ্ছে না। চন্দ্রকান্ত মৈত্র নিশ্চিন্ত হলেন। এবার তাঁর শান্তি, তাঁর মনের আরাম। এইবার শুধু বই পড়া, বিকেল হলে লাঠি হাতে নিয়ে ঠুক ঠুক করে কাছের পার্কে যাওয়া, দু-চারজন বৃদ্ধের সঙ্গে কিছুটা গল্প করা আর নাতি-নাতনীদের

সঙ্গে বসে একটু হুটোপাটি করা। বার্ধক্যে এর বেশী কাম্য আর কি থাকতে পারে!

বিয়ের মাত্র আটমাস পরে সুমিত বিরাট চাকরি পেল দুবাইতে। সুমিত খুশি হল। আবার বাবার কথা চিন্তা করে যাবার সিদ্ধান্ত নেবে কিনা ভেবে ইতস্তত করতে লাগল। একদিন দু'দিনের জন্য তো নয়, একেবারে পাঁচ বছরের কনট্রাক্ট সার্ভিস। বছরে একবার মাত্র আসা। বাবার কি হবে। বাবাকে কে দেখবে। দাদাদের কাছে সমস্যাটা একটুখানি বলতে না বলতে বড়দা চেঁচিয়ে উঠল, "কেন, বাড়িতে কি আর কোন লোক নেই যে তুই বাবার কথা চিন্তা করছিস! এতকাল তো তোর বৌদিই বাবা-মায়ের সব করে এসেছে।"

মেজদা হেসে বললো, "তুই যখন সকলের ছোট ভাই হয়ে জন্মেছিস, তখন ছোট হয়েই থাক্। এই সৌভাগ্য সকলের হয় না। তুই নিশ্চিন্ত থাক্, বাবা না খেয়ে, না ঘুমিয়ে থাকবে না।" দাদাদের এই মন্তব্য সুমিতকে আরও ভাবিয়ে তুলেছিল। চলে যাবার আগের কয়েকদিন সোমা গম্ভীর হয়ে ছিল, আর তারই মধ্যে একদিন শুনে ফেললো, বড় জাকে বলা মেজ জায়ের মন্তব্য—"অত ভাবনা-চিন্তা না করে বউটিকে এখানে রেখে গেলেই তো হয়। বাবার দেখাশুনো করতে পারবে।"

"বুঝলে টিনাদিদি, ওরা আর এই বুড়োহাবড়াকে ওদের মধ্যে রাখতে চায় না। ওরা যখন হাসবে, আমি তখন কাশবো, ওরা যখন হৈ-হুল্লোড় করবে, আমি তখন পারে যাবার দিন গুণবো··· সংসারে এমন প্রাণীকে কে চায় বল তো!"

"তা কেন, আমাদের দেশে বহু পরিবারেই তো ঠাকুমা-ঠাকুর্দা, দাদু-দিদিমা আছে।"

টিনার হঠাৎ মনে পড়েছিল ওর দিদিমার কথা। দাদু মারা যাবার পর মা কবারই বা নিজের বাপের বাড়ি গেছে! শুধু টাকা পাঠানো আর চিঠি লিখে খবরাখবর নেওয়া, এইটুকুতেই কি সব কর্তব্যের শেষ! টিনা জানে ওর মাসীমা কতবার কোলকাতায়

বোনের বাড়ি দেখবার, এখানে এসে থাকবার বেড়াবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছে, কয়েকবার দিদিমাও আসতে চেয়েছে। কিন্তু প্রত্যেকবারই মা টাকা পাঠিয়েছে, চিঠি লিখেছে, কটা মাস যাক, মা নিজে গাড়ি করে গিয়ে ওদের নিয়ে আসবে। টিনা খুব ভাল করেই জানে মার জীবনে ঐ কটা মাস আর আসবে না, কারণ যখনই মাসীমার চিঠি আসে, মা ভ্রূ কুঁচকে বলে, "মা না হয় বুড়ো হয়েছে, দিদিরও কি মাথাটা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে! এখানে এসে মা, দিদি থাকতে পারবে, না কারোর সঙ্গে কথা বলতে পারবে!"

টিনার চোখের সামনে সেই ছোটবেলা থেকে দশ বছর বয়স পর্যন্ত মায়ের একটা চেহারা ভাসতে থাকে। মায়ের আরেকটা চেহারা হল ঐ বয়স থেকে আজ পর্যন্ত। শেষের চেহারায় এসে পর্যন্ত মা পুরনো সব কিছুকে ভুলতে চাইছে, এই চেহারার মা মাসীমা দিদিমাকে এখানে নিয়ে আসতে চায় না, শোভনকে চিনতে চায় না, টিনাকে টিয়া নামে ডাকে না, তার গায়ে মাথায় আর হাত বুলিয়ে বুলিয়ে আদর করে না। এই চেহারার মায়ের কাছে এখন একটু আদরের জন্য আব্দার করলে বলে আদিখ্যেতা। বলে অনেক কাজ, এখন যাও! আশ্চর্য, মানুষ কেন এত বদলে যায়!

তেমনি, মা, আমিও তোমাকে আর আগের মতো ভালবাসি না। যদি ভালবাসতাম তবে সেই বেলা তিনটে থেকে পড়েথাকা তোমার লেখা চিঠিখানা তো কখন খুলে পড়তাম, কতবার পড়ে পড়ে কত লাইন মুখস্থ করে ফেলতাম। কিন্তু এখন তোমার ঐ শুখনো খটখটে উপদেশে ভরা চিঠি পড়তে আমার বয়ে গেছে। তবে তোমার ঐ এয়ার মেলে পাঠানো খামটা খুলবো। তারপর একবার মাত্র চোখ বুলিয়ে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ছুঁড়ে ফেলে দেবো। টিনা নিজের মনে খানিকটা বিড়বিড় করে।

চন্দ্রকান্ত দাদুর ঘরে কি কোন শব্দ হল? উনি কি কাউকে ডাকছেন! অবশ্য ওঁর ঘরের মেঝেতে কার্পেটের ওপর কম্বল বিছিয়ে

ওঁর নিজস্ব বেয়ারা বিপিন শুয়ে থাকে। বাবুর পুরনো আমলের লোক। যা হোক মনিবকে দেখাশুনো করে। কিন্তু আজ দিন কয়েক হল বাবুকে সমানে বলে যাচ্ছে, "আপনি না যান আমাকে টিকিট কেটে দিন, আমি বাড়ি ফিরে যাবো।"

চন্দ্রকান্তবাবু দিশেহারা হয়ে টিনাকে বলেছিলেন, "জানো টিনাদিদি, এইজন্য আমার সুমিতের মা বারবার বলতো, স্বামীর আগে সে মরতে চায় না। হাতে শাঁখা, সিঁথেয় সিঁদুর নিয়ে মরবার সখ তার নেই। বরঞ্চ স্বামীকে যত্ন-আত্তিতে রেখে, তাঁর শেষ জীবনের শেষ মুহূর্তটুকু পর্যন্ত সেবা করে, একটুকু দুঃখ অসুবিধের আঁচটুকু না লাগতে দিয়ে আগে আগে তাঁকে ওপারে পাঠিয়ে তারপর সে নিজে যাবে।"

টিনা বিস্মিত হয়ে বলেছিল, "সে কি! তবে যে আমি শুনি, সব বিবাহিতা মহিলাদের একটাই মাত্র প্রার্থনা যেন সধবা মরে, স্বামী পুত্র রেখে যেন যেতে পারে!"

"ঠিক বলেছো, সবাই তাই বলে। কিন্তু সুমিতের মা বলতো, তার অত পুণ্যের দরকার নেই। প্রায় সব সংসারে দেখেছে স্ত্রীহারা বৃদ্ধ স্বামীদের কি ভয়ানক অবস্থা। সেবা-যত্ন দূরের কথা, সংসারের কাছে সামান্যতম দাবি করার অধিকারটুকুও সে হারায়। এক গ্লাস জল চাইলেও তার অপরাধের সীমা থাকে না।"

"সত্যি!" টিনার আশ্চর্যবোধক প্রশ্নে চন্দ্রকান্তবাবু হেসে ফেলেন, "সত্যি প্রমাণ করবার জন্যই তো সুমিতের মা আমার আগে চলে গেল।"

চন্দ্রকান্তবাবুর ঘরে আলোটা কিন্তু জ্বলছেই। হয়তো উনি চুপ করে বিছানায় বসে আছেন। মনের ব্যথা বুকে টেনে নিয়ে কষ্ট পাচ্ছেন!

"বুকে কষ্ট হলে কোন ওষুধ খান না?" টিনার প্রশ্নে চন্দ্রকান্তবাবু নিজের গায়ে জড়ানো একটা পালকের মতো নরম সাদা তুষ

দেখিয়ে বলেছিলেন—"তখন এটা জড়িয়ে বসি। সুমিতের মা চলে যাবার দু'মাস আগে এটা কিনে দিয়েছিল। ঐ চাদরটা গায়ে জড়ালে মনে হয় সুমিতের মা নিজের শরীর দিয়ে যেন ওটাকে ওম্ করে রেখেছে।"

টিনার এবার ঘুম পাচ্ছে। টিনা এবার বিছানায় শুয়ে পড়বে। ঘুমোবে। ডন হোটেল এখন একেবারে নিঃস্তব্ধ এবার ডন হোটেলের ঘর এক এক করে খালি হবে, জাঁকিয়ে শীত পড়বার আগে একেবারে খালি। কালেভদ্রে দু চারটি সাহেব মেম আসে 'হোম'-এর আবহাওয়া উপভোগ করবার জন্য, আর কেউ আসে না। মিসেস ক্লার্ক তখন একেবারে একা। মিসেস দয়াল কথাবার্তা বলা প্রায় বন্ধ করে দিয়েছেন। চলে ফিরে বেড়ায় শুধু রামবাহাদুর, আর গুটি কয়েক বেয়ারা বাবুর্চি। তাও তাদের অনেকেই তখন ছুটি নিয়ে বাড়ি যায়।

ডন হোটেল ঘুমিয়ে পড়েছে। তার চারদিকে ঘিরে ধরেছে রাতের নিঃসীম অন্ধকার। মাঝে মাঝে কি যেন টুপটাপ্ ঝরে পড়ছে। ঘরের দরজা জানলা বন্ধ থাকলেও ভারী পর্দা ভেদ করে নাকে ইউক্যালিপ্টাসের গন্ধ ভেসে আস্ছে। টিনার ঘরের ঠিক সামনের লনে গোল করে কেয়ারী করা একটা বেড, তাতে কয়েকটা গোলাপ ফুলের টব। ই জি. হিল, ইতালী দ্য ফ্রান্স আর ব্ল্যাক প্রিন্স। বারান্দার যে অংশটুকু সারাদিন রোদে ভরে থাকে, সেখানে সবুজ রং করা তারের জালের গায়ে বাইয়ে দেওয়া হয়েছে লতানো গোলাপ মার্শাল নীল। হলদে রং-এর ছোট ছোট ফুল। গন্ধে ভরপুর। নিশ্চয়ই কুঁড়িগুলি ফুটতে শুরু করেছে। নইলে অত মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে কি করে! কিংবা বিকেলবেলায় টিনা দেখেছিল একটা ই. জি. হিল আর দুটো ইতালী দ্য ফ্রান্স ফুটি ফুটি। এখন ঐগুলি পাপড়ি মেলছে। ভোর হতে না হতেই পুরো ফুটে যাবে। আরো কয়েকটি টবে আছে হাইড্রোঞ্জিয়া গুচ্ছ আর লাল টুকটুকে জিরেনিয়াম।

টিনা হাত বাড়িয়ে টেবিলল্যাম্পটা জ্বালালো। চোখে পড়লো মার লেখা চিঠিটা। তখনও চাপা দেওয়া আছে। টিনা চিঠিখানা হাতে তুলে নিল। আলোর কাছে এনে চিঠিটা খুললো। প্রথম লাইনটা পড়েই টিনার মাথাটা চিঠির দিকে আরও ঝুঁকে গেল—"আমার টিয়ারাণী, আমাদের বুড়িয়া, অনেকদিন পরে আমাদের মেয়েকে টিয়া বলে ডাকছি। অবাক হচ্ছিস তো মা!"

দীর্ঘ চিঠির একেবারে তলার দিকে টিনা তাকালো, সেখানে স্পষ্ট করে লেখা আছে 'ইতি—তোর মা'—

কতদিন, কতদিন পরে মা টিনাকে টিয়া বলে ডাকছে!

"তিন মাসের বেশী হয়ে গেল আমি আর তোর বাবা ভারতবর্ষের বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। প্রথম কন্টিনেন্টে, তারপর স্টেট্‌স। এবার দুজনেই ক্লান্ত, শ্রান্ত। ক্লান্ত শুধু আকাশে উড়ে আর গাড়িতে চড়ে নয়। ক্লান্ত আমাদের কয়েক বছরের জীবনধারণে। টিয়া, তোর কতদিনের সখ দিদিমার বাড়ি যাবি, মাসীমার হাতের রান্না খাবি, পুকুরে দাপিয়ে স্নান করবি, গামছা দিয়ে মাছ ধরবি, গ্রাম দেখবি, এবার গিয়েই তোর সেই সখ মেটাবো। আমরাও একটু বিশ্রাম নিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচবো। টিয়া, মা হোয়ে তোকে কথা দিচ্ছি গুপ্ত ধনের আশায় রাশি রাশি সোনার তালের মধ্যে বসে আর মাথা ঠুকবো না। তোর বাবাকেও ঠুকতে দেবো না।

আমরা দুজনেই বড় ভয় পেয়েছি রে এখানকার অতি ধনী পরিবারের ছেলেমেয়ে বউদের দেখে। বেশ কিছু ছেলে মাথা কামিয়ে স্ত্রী-পুরুষ দুজনেই গেরুয়া রং-এ ছোপানো কাপড় জামা পরে, গলায় কণ্ঠি দিয়ে, খোল করতাল নিয়ে গান করছে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ!

আমি তাদের একদিন জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা কি চাও!

একজন উত্তর দিল—মুক্তি চাই।

'কেন?'

আমার সবিস্ময় প্রশ্নে ওরা অবাক হল। অবাক হয়েই বললো, তোমরা ভারতবর্ষের লোক হয়ে মুক্তি কেন চাই জিজ্ঞেস করছো!

আমি বললাম, তোমাদের মনের কথাটা তো জানতে ইচ্ছে করে।

তাহলে এসো তোমাকে একটা জিনিষ দেখাই।

ঘরের একটা জানলা খুলে দিল ওদের দলের ইলিনা বলে মেয়েটি। তার নতুন নাম হয়েছে রাধা। কতই বা বয়স মেয়েটির! বড় জোর পঁচিশ! চেহারা! তোকে ছোটবেলায় গল্প বলতে গিয়ে কুঁচবরণ রাজকন্যার কথা বলতাম মনে আছে তো! ইলিনা আমাদের সেই কাল্পনিক কন্যার চাইতেও অনেক অনেক সুন্দরী। তার ওপর আবার মেঘবরণ চুল, তবে কালো নয়, একটু কটা, পিঠ ছাপানো। নিখুঁত কাটা কাটা মুখে টিকলো নাকে রসকলি। কপালে চন্দনের ফোঁটা, গলায় কণ্ঠি, হাতে ঝুলনী। পরে আছে গেরুয়া রং-এ ছোপানো শাড়ি ব্লাউজ। পুরাকালের শ্রীরাধাকে দেখিনি। মর্ত্যের রাধাকে দেখে চোখ ফেরাতে পারি না। মুখে রা কাড়ি না।

সেই মেয়েটি আমাকে জানলা খুলে দিয়ে আঙুল বাড়িয়ে দেখালো সামান্য দূরে একটা খোলা মাঠ, তার ওপর স্তূপাকৃতি সামান্য পুরনো-হয়ে-যাওয়া মোটরগাড়ি, কতরকমের ঝকঝকে ফার্নিচার, ফ্রিজিডিয়ার, টি. ভি. সেট, রান্নাঘরে ব্যবহৃত নানা চেহারার ইলেক্ট্রিক গ্যাজেট।

'কি দেখছো?'

উত্তরে আমি বললাম—কি আবার, জাঙ্ক। তোমাদের জাঙ্ক ইয়ার্ড, ওতে দেখবার কি আছে! এ তো তোমাদের গোটা আমেরিকার যে কোন শহরে দেখা যায়। কারণ তোমরা কোন জিনিসপত্রই ছ' মাস এক বছরের বেশী ব্যবহার করো না।

'ঠিক,' ইলিনা উত্তর দিল, 'বাইরে যে জাঙ্ক দেখছো, ঐ জাঙ্ক এখন আমাদের প্রত্যেকের মনে। আমাদের যে অপরিমিত অর্থ আছে, সম্পদ আছে, তাই দিয়ে আমাদের মনের জাঙ্ক তৈরী হচ্ছে। বিশ্বাস করো, আমাদের শ্বাসনালী বন্ধ হ'য়ে যাচ্ছে, তাই আমরা এসব কিছু থেকে মুক্তি চাই। শুনেছি তোমাদের ভারতবর্ষে নাকি অদ্ভুত অভাব,

অচিন্তনীয় অনটন। অথচ তোমরা শান্ত, তোমরা নির্বিকার। তোমাদের ধর্ম নাকি ইহলোকের জন্য নয়, পরলোকের জন্য। তোমরা জন্মান্তরে বিশ্বাস করো, তাই এই জন্মে কোন সাধ না মিটলেও তোমরা অস্থির হও না, তোমরা পরের জন্মের জন্য অসীম নিষ্ঠা আর বিশ্বাস নিয়ে অপেক্ষা করো! জীবনে কিছুই যদি না চাইতে হয়, তা হ'লে এর চাইতে শান্তি আর কি আছে বল তো! তোমাদের ওপর দেবতার আরেকটি মহান আশীর্বাদ হিমালয়। তার প্রতি গুহায় নাকি মুক্তপুরুষ ইয়োগি গাইডরা বসে আছেন মুক্তি-মধু নিয়ে। আমরা তাই ভারতবর্ষে যাচ্ছি। ডলার আমাদের দুঃস্বপ্ন। আর এই দুঃস্বপ্নের কথা ভাবলেই আরো ডলার আসে। এত ডলার নিয়ে আমরা কি করবো! সেই তো ভাস্কে ফেলে দেবার সব জিনিস কিনবো। এইসব দেখে এখন আমরা ক্লান্ত, আমরা অসুস্থ, পীড়িত। ভারতবর্ষে যাবো। খালি পায়ে হাঁটবো, মাটির ওপর শোব। এক-বেলা খেয়ে অন্য বেলায় না খেয়ে খিদের মাধুরী বুঝবো। হিমালয়ের গুহায় গিয়ে খোঁজ করবো শান্তিদাতা গুরুদেবের। হরে কৃষ্ণ উচ্চারণেই যদি এতো মধু, তাহলে তো ভারতবর্ষ অমৃতকুম্ভ।

চিন্তা করে দেখ টিয়া ঐ রূপসী অল্পবয়সী মেয়ে, তার বিত্তবান, রূপবান স্বামী, তাদের ফুলের মতো সন্তান, সবাই মিলে সন্ন্যাসীর বেশ ধরে ভারতবর্ষের দিকে পাড়ি জমাচ্ছে। শুধু ওরা নয়, দলে দলে। ঐশ্বর্যের জাঙ্ক এখন ওদের কাছে আতঙ্ক। ওরা পালাচ্ছে।

সবকিছু দেখে আমরাও ভয় পেয়েছি। কেন জানি ইচ্ছে হচ্ছে আবার সেই ভবানীপুরের ছোট ফ্ল্যাটটিতে ফিরে যাই। নিজের হাতে রান্না করে তোদের খেতে দিই। তোর চুল আঁচড়ে বিনুনি করে লাল ফিতে বেঁধে দিই।

আরেকটা কথা, লজ্জা পাস না মা, এবার ফিরে গিয়েই তোকে বিয়ে দেবো। বিয়ে টাকার সঙ্গে দেবো না, বিয়ে দেবো একটি শিক্ষিত সজ্জন ভদ্র ছেলের সঙ্গে। অনেক দিন পরে আমার মনে পড়ছে

শোভনের কথা। শোভনের মতো ছেলে তো সংখ্যায় খুব বেশী নেই।"

টিনা চিঠিখানা একবার, দুবার নয়, অনেকবার পড়লো। নীচের দিকে খুঁটিয়ে দেখলো, সেখানে সত্যিই স্পষ্ট করে লেখা আছে 'তোর মা'—এবং মায়ের নিজের হাতে লেখা কোন সন্দেহ নেই।

টিনা ঘড়ি দেখলো, একটা কখন বেজে গেছে। ছোট কাঁটা দুটোর দিকে দৌড়চ্ছে। টিনা শুয়ে পড়লো। বেড ল্যাম্পটা জ্বালানো রইলো। টিনা গায়ে নরম উষ্ণ কম্বলটা টেনে নিল।

কি একটা শুনে টিনা উৎকর্ণ হল। তারপরেই বুঝতে পারলো পাশের ঘরে রীতা ভার্মা ঘুমের মধ্যে কাঁদছে। মাঝে মাঝেই শোনা যায় রীতা ভার্মা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কেমন যেন কষ্টের, বুকচাপা কান্না কাঁদে, বোধহয় স্বপ্নের মধ্যেও গান করে 'আই লস্ট্ মাই হার্ট অ্যাট সানফ্রান্সিসকো।' দিনের বেলায় রীতা ভার্মাকে এই কান্না নিয়ে কিছু বললে একটু হেসে বলে—"কই আমি তো কিছু জানতে পারি না!"

টিনার দুটি চোখ বুজে এলো। চোখ দুটি ভিজে উঠলো, চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়লো দু কানের পাশে। শোভন ফোন করেছিল—"টিয়া, তুমি কত বড় হয়ে গেছ, আর অনেক সুন্দর হয়েছো।" কিছুক্ষণ থেমে আবার বলেছিল—"টিয়া, তুমি কিছু বলবে না?" টিনা উত্তর দিয়েছিল—"কি বলবো!" অথচ সেদিন কত কথা জমেছিল শোভনের বুকে, টিনার বুকে। ওদের কারোই সেদিন মুখ ফোটেনি। যখন সময় চলে গেল, তখন কিনা মা লিখলো শোভনকে মনে পড়ছে। ওর মতো ছেলে বেশী নেই! শোভন এখন কোথায় কেউ জানে? জানার দরকার মনে করে?

চন্দ্রকান্ত মৈত্রের ঘরে তখনও আলো জ্বলছে। চন্দ্রকান্তবাবু আস্তে আস্তে বিছানা ছেড়ে উঠলেন। চোখে পুরু কাঁচের চশমাটা পরলেন। মেঝেয় ঘুমিয়ে থাকা বিপিনের পাশ কাটিয়ে চেয়ার টেনে

টেবিলের সামনে বসলেন, ড্রয়ার খুলে প্যাডের কাগজ বার করলেন। ড্রয়ার থেকে কলম তুলে নিলেন। লিখতে লাগলেন। আঁকাবাঁকা অক্ষর: রাত্রিবেলা, চোখে তেজ নেই,—স্নেহের সুমিত. আমার ছোটুন, এখানে আর থাকতে পারছি নারে। শীত বাড়ছে, আমার বুড়ো হাড় শিরশিরিয়ে কাঁপে। আমাকে কেউ নিয়ে যেতে চায় না, তুই আমাকে নিয়ে যা। আমি এবার থেকে তোর কাছে থাকবো··· চন্দ্রকান্তবাবুর মাথাটা টলে উঠলো। হাত থেকে কলমটা খসে পড়ে গেল মাটিতে। প্রায়-বুজে-আসা চোখের আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে দেখলেন সামনে দাঁড়িয়ে আছে সুমিতের মা। মুখ ভার করে বলছে, "আমি বলিনি, বেশী বয়সে স্ত্রী চলে গেলে কি হয়!" রাজ্যের ঘুম নেমে এলো চন্দ্রকান্ত মৈত্রের সারা শরীরে। কিন্তু সুমিত কি করছে গলা পর্যন্ত বরফে ঢেকে। ও কি বরফের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে! সুমিত—ছোটুন উঃ···।

শরীরে নাড়া খেয়ে চন্দ্রকান্ত মৈত্র চোখ মেলে তাকালেন। মাথাটার মধ্যে কি যেন টলমল করে নড়ছে।

বিপিন উদ্বিগ্ন মুখ নিয়ে তাকিয়ে বলছে, "কি হয়েছে বড়োবাবু! কেঁদে উঠলেন কেন!"

"একটু জল দে।"

চন্দ্রকান্তবাবু হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বসলেন। এই শীতের রাতেও বেশ খানিকটা জল খেলেন চন্দ্রকান্তবাবু। জল খাবার পর মনে হল বুকের ওপর এতক্ষণ যে পাথরটা চাপা ছিল, সেটা যেন সরে গেছে।

"আপনি কখন উঠেছিলেন! আমাকে ডাকেননি, কিছু করেননি, আপনার গলায় অমন শব্দ শুনে ধড়ফড়িয়ে উঠে দেখি ঘরে আলো জ্বলছে।"

"দেখতো, আমি ছোটুনকে যে চিঠিখানা লিখেছিলাম, সে কাগজটা কোথায়!"

"চিঠি কোথায় এত রাত্তিরে! ঐ তো দুখানা সাদা কাগজ পড়ে রয়েছে।"

"তাই তো।" চন্দ্রকান্তবাবু শুয়ে পড়লেন। বিপিন গায়ের ওপর পরপর দুখানা কম্বল ঢাকা দিয়ে দিল। একবার দেখলো বুড়োবাবুর পায়ে মোজা ঠিক আছে কি না, না খুলে গেছে। তারই হয়েছে যত জ্বালা। এই বুড়ো, দুর্বল মানুষটাকে ছেলে, ছেলের বউরা কোলকাতার বাড়িতে রাখতে চাইছে না। অথচ এখানে শীত জাঁকিয়ে আসছে, আর ধারে কাছে আপনার জন নেই। যেমন আগে ভাগে সব সম্পত্তি, টাকা-পয়সা ভাগ বাঁটোয়ারা করে দিয়ে দেওয়া! মায় মায়ের অমন মোটা ভারি সোনার গয়নাগুলি পর্যন্ত বৌদের এক্ষুনি না দিলে চলছিল না। বিপিন চুপ চুপি বারণ করেছিল। ব্যাপার বুঝে সেই বছর যখন দিদিমণি এলো সে পর্যন্ত বারণ করে গেল। তবু বুড়োবাবু শুনলো না। ভীমরতি আর কাকে বলে! এখন মর এই শীতে ঠকঠকিয়ে! বেচারী নিশ্চয়ই কোন স্বপন দেখছিল। বিপিন আরেকবার 'যত জ্বালা আমার' বলে শুয়ে পড়লো, ঠিক করলো কোলকাতায় একবার ফিরে যেতে পারলে হয়। যেটুকু লেখাপড়া জানে তার জোরেই ছোটুনবাবু আর বৌদি-মণিকে লিখে দেবে বুড়োবাবুর কত কষ্ট।

তনিমা রায় স্তব্ধ হয়ে বসে আছে বিছানার ওপর। দুপুরবেলার ব্যাপারটা এখন মনে হচ্ছে যেন স্বপ্নে দেখা। তখন একটা বেজে গেছে, হোটেল ডন-এ লাঞ্চ পিরিয়ড শুরু হয়েছে। তনিমা সান্যাল সকালেই মিসেস ক্লার্ককে অনুরোধ করেছিল রুম সার্ভিসের জন্য তার দুপুরবেলার ভাতটা যেন ঘরেই দেওয়া হয়। ডাইনিং হলে আজ আর তনিমা যাবে না। মিসেস ক্লার্ককে বলা হয়েছিল শরীর খারাপ।

কিন্তু তারপর কি হল! এতো সাবধান, সতর্ক হয়েও।

তনিমা রায় ভাবতে শুরু করলো, সত্যিই কি আজ দুপুরবেলা কেউ এসে দরজায় নক্ করেছিল! তনিমা রায় দরজা খুলে দিয়েছিল এবং তারপরেই চম্‌কে পিছিয়ে এসেছিল!

"ভেতরে আসতে পারি?" আগন্তুক লোকটি ভেতরে ঢুকে অনুমতি চাইলো।

"আপনি আমার অসুস্থ ছেলের জন্য অনেক করেছেন। আমি কৃতজ্ঞ—"

"মিসেস ক্লার্ক বাড়িয়ে বলেছেন। আমি কিছু করিনি। কান্না শুনে স্থির থাকতে পারিনি. তাই—"

তনিমা রায় একখানা হাত দিয়ে নিজের মুখ চেপে ধরলো।

"স্থির থাকবার তো কথা নয়। মিসেস ক্লার্ক আমাকে নিশ্চয়ই কিছু বলেছেন। তবে আমাকে সবকিছু জানিয়ে দিয়েছে আমি যে বইখানা পড়ছিলাম আর পাতা মুড়িয়ে রেখেছিলাম. বইয়ের সেই অংশটুকু।"

তনিমা রায় দুচোখ মেলে এবার তাকালো সামনের নিষ্ঠুর লোকটির দিকে। কানের কাছে কিছু চুলে পাক ধরেছে. শরীরে সামান্য মেদ, এ ছাড়া আর কোন পরিবর্তন হয়নি।

নীলেন্দুর সঙ্গে তনিমার কতদিন ঝগড়া হয়েছে ওর ঐ বই পড়তে পড়তে পাতার কোণ মোড়া নিয়ে। নীলেন্দু যতবার বই-এর পাতা মুড়িয়ে রাখতো, ততবারই তনিমা চেঁচামেচি করে বকে একটা কার্ড সরু লম্বা করে কেটে তাতে কালি দিয়ে সুন্দর একটু আঁকিবুকি এঁকে লম্বা করে নীলেন্দুর নামের হরফগুলি লিখে পাতার মধ্যে রেখে দিত। চোখ পাকিয়ে বলতো, "ফের যদি দেখি তুমি স্কুলের ছেলের মতো পাতা মুড়িয়েছো তো হাতের আঙুল মটকে দেবো।"

তনিমা রায় কি এবার মনের ভুলে গতকাল খোকনের বাবার বই পড়তে পড়তে একজায়গায় থেমে সেখানকার পাতার কোণ মুড়ে রাখা জায়গাটায় একটা কাগজ লম্বা আর সরু করে কেটে রেখে দিয়েছিল! সে মনে করেছিল অনেক পথ-প্রান্তর পেরিয়ে বাড়ি পৌঁছে অবসরমতো খোকনের বাবা যখন ঐ বইয়ের নির্দিষ্ট পাতাটা খুলবে এবং পাতলা কাগজ থেকে কাটা সরু ফালিটা মাটিতে পড়ে যাবে, নিশ্চয়ই চোখে পড়বে না। শুধু তো একটা কাগজের টুকরো। তাতে কোন নামের হরফ সাজানো নেই, কোন আঁকিবুকিও নেই।

কেন ঐ কাজটা করেছিল তনিমা রায়! কিছু না করলে তো ঐ লোকটা নিষ্ঠুর ঘাতকের মতো আজকে তনিমার ঘরের মধ্যে এসে উপস্থিত হতো না, এতদিন পরে ঐ মুখের দিকে তাকিয়ে তনিমার বুকের মধ্যে রক্তক্ষরণ হতো না।

"সামান্য একটা কাগজের টুকরো দেখলেই কোন মানুষকে সনাক্ত করা যায় না"—কথা বলে তনিমার মনে হল বুকটা এবার চার টুকরো হয়ে ফেটে যাবে!

"ঠিক কথা, তবে ঐ সরু লম্বা কাগজটির দুটো মুখ এত নিখুঁত গোল করে কেটে পেজমার্ক বসাতে আমার জীবনে শুধু একজনকেই দেখেছি। আর তাই দেখেই সনাক্ত করেছি।"

লোকটি আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে! তার না গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে হোটেলের সামনে! এক্ষুণি তো সে সপরিবারে যাত্রা করবে। বাড়ি ফিরে যাবে।

গম্ভীর নিশ্বাস ছেড়ে নীলেন্দু বললো, "যাচ্ছি, শুধু একটা অনুরোধ তনু, নিজেকে একটু যত্ন করো। তুমি বড় রোগা হয়ে গেছ।" তনিমা বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মতো মাথা তুলে চীৎকার করে লোকটাকে কি ঠেলে ফেলে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু পারলো না। লোকটি তার আগেই চলে গিয়েছিল অপেক্ষমান গাড়ির কাছে। তনিমা রায় আড়ষ্ট হয়ে শুনলো গাড়ি স্টার্ট নিল। হর্ন বাজিয়ে গাড়ি চলে গেল।

রাতের অন্ধকারে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ডক্টর কল্যাণ সোম। মন খারাপ লাগছে ডক্টর কল্যাণ সোমের। খুব খারাপ লাগছে। কিন্তু কেন!

ঘাড় ঘুরিয়ে কল্যাণ সোম কয়েক মুহূর্ত বেডরুমের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। ঘরে অতি মৃদু নীলচে আলো। কুমকুম শুয়ে আছে। পা থেকে গলা পর্যন্ত দুখানা মোটা কম্বল ঢাকা দেওয়া। কুমকুমের

মুখখানা শুখনো, ম্লান। বুজে থাকা চোখের নীচে কালচে ছাপ। কুমকুমের শরীর খারাপ। কুমকুম সন্তানসম্ভবা। ডক্টর কল্যাণ সোম চোখ ফিরিয়ে নিলেন।

বছর দশেক আগে একবার অপর্ণা খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। লজ্জায় সঙ্কোচে লাল হয়ে স্বামীর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলেছিল, "ভালো বুঝছ না গো। কি হবে বল তো। লোকের কাছে আমি মুখ দেখাবো কি করে! খোকা কি ভাববে?"

সেদিন কল্যাণ সোমেরও লজ্জা করেছিল। এই বয়সে আবার নতুন করে পিতৃত্বের স্বাদ পাওয়া! তবে তার কয়েকদিন পরেই নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। প্রকৃতির বিধানেই অপর্ণা নারীজীবনের একটা অবশ্য নিয়মের হাত থেকে অব্যাহতি পেয়েছে। একটু আগে, এই যা।

"কদিন একেবারে মরে পড়েছিলে।" একটু হেসে ঠাট্টা করে কল্যাণ সোম স্ত্রীকে বলেছিলেন।

"যতই বল, আর বাপু তুমি আমার কাছে আসবে না, অনুনয়-বিনয় করবে না, মনে থাকে যেন।" অপর্ণা মাথা ঝাঁকিয়ে বললো।

"বুঝতে পারি বয়স হচ্ছে, তবু মাঝে মাঝে ইচ্ছেটা পাগলের মতো জেগে ওঠে।"

অপর্ণা তাড়াতাড়ি স্বামীর হাত দুখানা টেনে নিজের বুকে চেপে ধরেছিল।

কুমকুম মা হতে যাচ্ছে। প্রথম দিন জানতে পেরে কল্যাণ সোম বুক ঠুকে বলেছিলেন, "আবার প্রথম যৌবন থেকে জীবনঃশুরু হল।"

কিন্তু আজ খবরের কাগজ পড়ে কি হল কল্যাণ সোমের! স্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকায় পার্সোনাল কলমে পৃথিবীতে একটি শিশুর আগমনবার্তা ঘোষিত হয়েছে।

আনন্দ বাবা হয়েছে। লাবণ্যে ভরা নাতি হয়েছে কল্যাণ সোমের। তিনি জীবিত, অথচ তাঁকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে, অস্বীকার করে নাম দেওয়া হয়েছে অপর্ণা সোমের। নামের আগে মৃতের কোন চিহ্ন নেই। তাঁকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে।

কল্যাণ সোমের মুখে একটু হাসি খেলে গেল। আনন্দ জানে তার বাবা স্টেট্‌স্‌ম্যান কাগজে পার্সোনাল কলমটি রোজ পড়ে। একটা অদ্ভুত আকর্ষণ আছে বিয়ে, জন্ম, মৃত্যুর স্মৃতিচারণের ঐ লেখাগুলিতে। শত ব্যস্ততার মধ্যেও কল্যাণ সোম একবার ঐ কলমটির ওপর চোখ বুলোবেনই।

কল্যাণ সোমের উন্নত মাথা বুকের কাছে ঝুঁকে ঝুলে এলো। ছেলের কি নাম রাখবে আনন্দ! কেমন দেখতে হয়েছে! ওদের বংশের ধারা সেই খাঁড়ার মতো উঁচু নাক পেয়েছে তো! আর! আর, অনেক সময় নাতি-নাত্‌নীরা তো ঠাকুমার গায়ের রং পায়। অপর্ণার গায়ের কিছুটা রং নাতিটা পাবে না? আচ্ছা, ও যখন কেঁদো গাঁট্টা-গোঁট্টা হয়ে উঠবে, তখন ঘোড়া বানিয়ে পিঠে চেপে সারা বাড়িময় ঘুরবার জন্য একটা দাদু তো চাই! ও খুঁজবে না? ওর বাবা আনন্দ কি করবে তখন! অপর্ণা বেঁচে আছে, বেঁচে নেই কল্যাণ সোম!

"তুমি শোবে না, অনেক রাত হয়েছে।" কুমকুমের কথায় ঘাড় ফেরালেন কল্যাণ সোম। তারপর আবার সামনের দিকে তাকালেন, দু হাত জোড় করে বিড়বিড় করে বললেন, "ঈশ্বর, প্রলয় দাও, ধ্বংস দাও, আমাকে তুমি এই মুহূর্তে মৃত্যু দাও। আমাদের খোকাকে আমার আর অপর্ণার আনন্দকে তুমি আশীর্বাদ কর, ওকে সুখী কর।"

হাতের স্পর্শে পাশে ফিরে তাকালেন কল্যাণ সোম। কুমকুম উঠে এসেছে। স্বামীকে শুতে যেতে অনুরোধ করছে। কল্যাণ সোমের মনে হল কুমকুমের দেহের একটা বিশেষ অংশ স্ফীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন গোটা দেহটাই কেমন বেঢপ ফুলে উঠেছে। কুমকুমের ক্লান্ত সাদা চোখ দুটোয় কেমন যেন বিভ্রান্তি ফুটে আছে।

হঠাৎ রাগ হয়ে গেল কল্যাণ সোমের। "তুমি কেন উঠে এসেছো এত রাত্রিতে। যাও, এক্ষুণি চলে যাও।"

"আঃ তুমি বড্ড চিন্তা কর। চল, তুমিও শোবে চল।"

"তুমি যাও, তুমি যাও। আমি এখন একটু এখানে থাকবো।" কল্যাণ সোমের গলায় অধৈর্যের স্বর। কুমকুম অবাক হয়ে একবার স্বামীর মুখের দিকে তাকালো, তারপর ধীর পায়ে চলে গেল। স্বামীর এমন অধৈর্য ও এই প্রথম দেখল।

কল্যাণ সোম বুঝতে পারলেন তাঁর পা থেকে মাথা পর্যন্ত কাঁপছে। কেন এত কাঁপছেন! শীতে, লজ্জায়, ঘৃণায় না রাগে!

গাড়ি চলছিল হুহু করে। মণিমালার ঘুম ভেঙে গেল। ট্রেনটা যেন একটু বেশী দুলছে। ঘণ্টায় কত মাইলে যাচ্ছে কে জানে। বাইরের গাছপালা, ছোট ছোট স্টেশনগুলি স্যাট্ স্যাট্ করে মিলিয়ে যাচ্ছে। বাড়ি ফিরে যেতে এখনও কালকের সমস্ত দিন, কালকের রাত। পরশুদিন ভোরবেলা হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে তারপর বাড়ি ফেরা।

ছেলে মেয়ে দুটোই বার্থের একেবারে ধারে এসে গেছে। গভীর ঘুমে ওদের কচি কচি মুখগুলি কেমন ভারী হয়ে উঠেছে। মণিমালা উঠে ওদের ভেতর দিকে ঠেলে দিল। মাথায় বালিশ ঠিক করে দিল, এ কদিনে বলতে নেই, দুজনেরই স্বাস্থ্য একটু ফিরেছে। মেয়েটার তো দুটো গালই লাল হয়ে উঠেছে। অবশ্য কোলকাতায় ফিরে গেলেই সব লাল গায়ের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে যাবে।

মণিমালা ওপরে বাঙ্কের দিকে তাকালো। পরিমলও গভীরভাবে ঘুমোচ্ছে। মাথাটা বালিশের একপাশে ঝুঁকে পড়েছে। গাড়ির ঝাকুনিতে নড়ে উঠছে। মণিমালা স্বামীর মাথাটা ঠিক করতে গিয়েই লক্ষ্য করলো দু চোখের নীচে কালো দাগ। পরিমলের চোখে চশমা আছে। আর চশমা থাকলে চোখের কোলে দাগ পড়ে, চামড়া একটু কালচে হয়। তাই বলে এতটা! পরিমলের মুখখানাতেও কি

ক্লান্তির ছাপ। এ কদিনে বিশ্রামেও তো কই কোন পরিবর্তন হল না! মণিমালার নিজেরও তো স্বাস্থ্য কি সুন্দর ফিরে গেছে। শুধু পরিমলেরই কোন শারীরিক উন্নতি হল না। অথচ মুটুদা বৌদি সমানে বলেছে, 'পরিমলের যা পরিশ্রম যায়, ও যেন ওখানে গিয়ে টানা বিশ্রাম নেয়। নইলে ওর শরীর একেবারে ভেঙে পড়বে।' মণিমালা উত্তর দিয়েছিল, "ওর আর ওখানে কি কাজ থাকবে বৌদি! ও থাক্না ওখানে যত খুশি শুয়ে বসে।"

কিন্তু তাই কি হয়েছে! মণিমালা জোর করে পরিমলকে দিয়ে আরেকটা বই ধরায়নি বি. এ. অনার্সের জন্য! যে বইটা লিখতে অনেক মাথা খাটাতে হবে, পড়াশুনো করতে হবে। আর এই বই-এর কথা মুটুদা-বৌদির কাছে একেবারে গোপন। পাবলিশার বলেছে অনার্সের স্ট্যাণ্ডার্ডে এই ধরনের বই বাজারে একদম নেই। এই বই ছাপা হলে রয়্যালটি বাদে বেশ মোটা টাকা পরিমল পাবে। "আর তাই দিয়ে আমাদের ছেলেমেয়ে দুটো অনেক পড়তে পারবে, অনেকখানি এগোতে পারবে"—পাবলিশারের কথা শুনেই মণিমালা স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলেছিল।

কিন্তু চলন্ত গাড়িতে দাঁড়িয়ে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে মণিমালার চোখ দুটি জলে ভরে উঠলো কেন! স্বামীর মুখ এত ক্লান্ত, এত করুণ কবে থেকে হয়েছে! মণিমালা ভাল করে তাকিয়ে দেখেনি কেন? সে শুধুই ফলের রস করেছে, ছানা কেটেছে, ডিম সেদ্ধ করে খাইয়েছে!

কী একটা আশঙ্কায় মণিমালা শিউরে উঠলো। গভীর মমতা মণিমালা স্বামীর মাথাটা বালিশের ওপর তুলে দিল। পরিমলে ঘুম ভেঙে গেল।

"তুমি ঘুমোও নি?" পরিমলের প্রশ্নে মণিমালা মাথা নাড়লো তারপর বললো, "এই শোন, অনার্সের বইটা লিখো না, আর দরকার নেই।" পরিমল হেসে ফেললো, বললো, "কী আশ্চর্য, এই চলন্ত ট্রেনে, মাঝরাত্রিতে ভেবে চলেছো বই লিখবো কি লিখবো না।"

"ঠিকই ভেবেছি। তুমি এবার থেকে কোলকাতাতেও বিশ্রাম নেবে।"

"আর পরিশ্রম করে মরবে তুমি।" পরিমল হাসলো।

"মরবো তো তোমাদের জন্যই। তুমি ঘুমোও।" মণিমালা মোটা গরম চাদরটা পরিমলের গলা অবধি টেনে দিল।

সোরাবজী হাউসের ডান দিক ঘেঁষে একটা ছবির মতো বাংলো আরেকটু উঁচু জমির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ির সদর দরজা থেকে লাল ইটের সিঁড়ি নেমে এসেছে একেবারে রাস্তার ধার পর্যন্ত। সেখানে শক্ত তারের জাল দিয়ে তৈরী, ফ্রেমে আটকানো লম্বা গেট। পিলারের গায়ে গৃহকর্তার নাম। মিস্টার আর. এন. চোপরা। অবসরপ্রাপ্ত এক পদস্থ সামরিক অফিসার। স্বামী-স্ত্রী থাকেন। আর আছে একটি কি দুটি ভৃত্য। সন্ধ্যের পর মাত্র একটি মৃদু আলো সামনের ঘরে জ্বলতে দেখেছে টিনা। এতদিনের মধ্যে টিনা মাত্র দুদিন মিস্টার চোপরাকে দেখেছে। একদিনও দেখতে পায়নি মিসেস চোপরাকে।

পিলারের গায়ে বাড়ির নামটাও লেখা রয়েছে। প্রথম দিন নাম পড়ে টিনা চমকে উঠেছিল। পরে মিসেস ক্লার্ককে জিজ্ঞেস করেছিল, নিজের সখের বাড়ির নাম কেউ 'ম্যালস্টর্ম' রাখে। এ নামে চোখ পড়লেই যে মাথা ঘুরে যায়।"

"ঠিক কথা, আমিও তোমার মতো প্রথমটায় চমকে গিয়ে খোদ বাড়ির মালিককেই জিজ্ঞেস করেছিলাম নিজের বাড়ি নিয়ে এ কোন্ ধরনের কৌতুক। ভদ্রলোক কি উত্তর দিলেন জানো!"

"কি?"

"বললেন আমার ক্ষমতা থাকলে গোটা বিশ্বের ঐ নাম দিতাম।"

"যুদ্ধ করে করে বোধহয় ভদ্রলোক মানুষের জীবন সম্বন্ধে ঐরকম পেসিমিস্ট হয়ে পড়েছেন।"

টিনার দিকে তাকিয়ে মিসেস ক্লার্ক মাথা নাড়লেন, "তা নয় টিনা, যুদ্ধ করা তো ওঁর প্রফেসন। আসলে ওঁর তিনটি উপযুক্ত ছেলের মধ্যে বড় আর ছোটটি চলে গেছে দুর্ঘটনায়। মেজোটি আছে কসৌলির টি. বি. স্যানাটোরিয়ামে। আজকাল টিউবার কিউলিসিস-এ বিশেষ কেউ মারা যায় না। অথচ এই তো কিছুদিন আগে চিঠি এসেছে ছেলের অবস্থা ভালো নয়। বাবা-মা যেন অতি অবশ্যই চলে যান। ওঁরা চলেও গেছেন।"

"কিন্তু ওঁর অন্য গেটের গায়ে যেটা লিখে রেখেছেন তার মধ্যে তো আশা আছে, আলো আছে।"

"তা আছে টিনা, কারণ আমরা কোনো অবস্থাতেই আশা ছাড়ি না, হতাশ হতে চাই না।"

"তাই হবে বোধহয়"—

টিনা তাই ঐ রাস্তায় যেতে গিয়ে প্রতিবার একটু থম্‌কে দাঁড়িয়ে ঐ লেখাটি পড়ে—

Ring out the old, ring in the new,
Ring happy bells, across the snow ;
The year is going, let him go,
Ring out the false, ring in the true.

পুরাতনকে বিদায় দাও, নতুনকে আহ্বান কর,
বরফ পেরিয়ে সুখের ঘন্টা বাজুক
যে বছর চলে যায়, তাকে যেতে দাও
মিথ্যাকে বিদায় দিয়ে সত্যকে চাও।

টিনার বড় ভালো লাগে টেনিসনের লেখা এই লাইন কটি। "আমার বাংলা অনুবাদটিও খারাপ নয়।" টিনা একটু হেসে আপন মনে বলে।

টিনা চেয়ার ছেড়ে ওঠে। জানলার কাছে গিয়ে পর্দা সরিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকায়। আকাশের গায়ে সামান্য

স্বচ্ছতার আভাস। অর্থাৎ রাতের কালো চলে গিয়ে এবার দিনের আলো আসছে। সূর্যদেব জেগেছেন, একটু পরেই মাটির পৃথিবী আলোয় ভরে যাবে। কয়েক ঘন্টা নিথর হয়ে থাকা পৃথিবীতে আবার জীবনের সাড়া জাগবে।

টিনা আবার আবৃত্তি করলো—

Ring out the old, ring in the new,
Ring happy bells, across the snow ;

আশ্চর্য, মানুষ কোন অবস্থাতেই আশা ছাড়তে পারে না, তাই বুঝি সে বার বার দুঃখের বরফ পেরিয়ে সুখের ঘণ্টাধ্বনি শুনতে চায়!

আকাশের গায়ে এবার লালের ছোপ পড়বে। আর একটু পরেই দুজন চারজন ভ্রমণার্থী বেরিয়ে পড়বে বরফের গায়ে সূর্য ওঠার আলো দেখবার জন্য।

টিনা তার ঢিলে রাত্রিবাসের ওপর একটা মোটা স্কার্ফ জড়িয়ে নিল। একটু শব্দ না করে বাইরের দিকে দরজা খুলে সামনের বারান্দায় বেরিয়ে এসে আবার দরজাটা ভেজিয়ে দিল। আর আধঘণ্টা চল্লিশ মিনিটের মধ্যেই বেড-টি নিয়ে ভেতরের দরজায় ঠুকঠুক করবে বেয়ারা কিংবা হয়তো মিসেস ক্লার্ক নিজে। টিনা সামনের বাগানের দিকে তাকিয়ে দেখলো সত্যিই ই.জি-হিল প্রায় সব কটা ফুটেছে। তাই সারারাত অত গন্ধ মাতামাতি।

টিনা নেমে এলো সিঁড়ির সামনে কাঁকর বিছানো রাস্তায়। তারপর বাগানের পাশ দিয়ে চলে গেল বাড়ির পেছনে ছাঁটা ঘাসের সবুজ লনে। প্রথমবার মা-বাবার সঙ্গে এখানে এসে এই লন থেকে টিনা তিন চারদিন সূর্যোদয় দেখেছে। টিনা পুব আকাশের গায়ে তাকালো। জ্যোতির্ময় সূর্যদেব কোন্ গহ্বর থেকে ধীরে, অতি ধীরে উঠে আসছেন। আকাশে লাল আবার ছড়িয়ে পড়ছে, সেই লালের ছোপ লাগছে নীচের বরফ মুকুটে। মাথা উঁচু করে বেড়েওঠা বিশাল গাছগুলি এখন একেবারে চুপ। তাদের ডালে, পাতায়, ফলে ফুলে এখন আর কোনো কানাকানি নেই, সবাই এখন ভক্তিভাবে বিভোর

হয়ে আলোর দেবতাকে আহ্বান জানাচ্ছে। বরফ শিখরে সরু তুলি দিয়ে লাল রঙের আঁচড়, প্রতি মুহূর্তে স্পষ্টতর হচ্ছে। এর পর গলে গলে পড়বে।

টিনা আরও এগিয়ে পশ্চিমদিকে তাকালো। চাকর বেয়ারাদের আউট হাউস। সার সার কয়েকটা ঘর, প্রথম ঘরটায় থাকে মিসেস দয়ালের নিজস্ব মালি সুজন। তার বউ গোলাপী আর দুটি সন্তান। বড়টি মেয়ে, মীনাকুমারী। বছর তিনেক বয়স। সাদা খরগোশের মতো তুলতুলে, গাল দুটো লাল টমেটো। টিনা অনেকটা সময় কাটায় ওকে চটকে আদর করে। ওর একটা ভাই হয়েছে মাস দেড়েক বড়জোর। একটা গোলাপী গোল আলুর পুতুল। টিনা নাম দিয়েছে বরফ-সাহেব।

ঐ ভোরে সুজন উঠে পড়েছে। ওর বউও উঠে বসে আছে। ওর বউয়ের ফর্সা মুখে গাল দুটো আর ঠোঁট ফেটে লাল। মুখে সব সময় হাসি। কানে পাথরের ফুল, গলায় বড় বড় রঙীন পুঁতির তিন ছড়া মালা, নাকে মাকড়ির মতো নোলক, সিঁথি ভর্তি মেটে সিঁদুর। স্বামী স্ত্রী দুজনের গায়ে মোটা কম্বল জড়ানো।

মিসেস ক্লার্ক হেসে বলেছিলেন, ঠিক যেন গভর্নমেণ্টের বিজ্ঞাপন। সুখী পরিবার, স্বামী-স্ত্রী। দুটি সন্তান। এর বেশী একটিও নয়।

ওরা সত্যিই সুখী। টিনা যখন ওদের ঘরের কাছে গেল, দেখল সুজন দুটো কলাইয়ের মগ ভর্তি করে চা করেছে। আগুন গরম ধোঁয়া উঠ্‌ছে। সুজন এক হাতে একটা মগ এগিয়ে দিয়েছে গোলাপীর সামনে। আরেক হাতে একটা আস্ত হাফ-পাউণ্ড পাঁউরুটি ধরে বউকে গোটাটা খেয়ে ফেলবার জন্য কাকুতি মিনতি করছে। বউ শুনছে না। তার বক্তব্য সে ছিঁড়ে খানিকটা নেবে, আর বাদবাকিটা নেবে সুজন, নইলে কিন্তু সে শুধু চা টুকুই খাবে।

টিনাকে দেখে দুজনেই হাসলো। ছোট্ট ঘরের মধ্যে পাশাপাশি লাগানো তিনটে খাটিয়া। ওপরে বিছানা কম্বল পাতা। মীনাকুমারী শুধু মুখটুকু বার করে ঘুমোচ্ছে। আর ঐ পুতুলটা যে কোথায়

পুঁটুলী হয়ে আছে টিনা দেখতে পেলো না। টিনার প্রশ্নে গোলাপী একগাল হেসে বললো কম্বলের তলায় আছে, বড় জাড়। এখন বাইরে আসবে না। দরজার একপাশে টিনের একটা ছোট বালতী উনুন। তাতে কাঠকয়লা দিয়ে আগুন ধরানো হয়েছে। চায়ের জল হয়েছে। এবার ঘরটা একটু গরম করে, হাত-পা সেঁকে তবে অন্য কাজ।

সুজন মালী উঠে দাঁড়ালো। একগাল হেসে বললো আজ নাকি বেশ কয়েকটা গোলাপ ফুল টিনা বাবার ঘরে ফুলদানিতে সাজিয়ে দিতে পারবে।

গোলাপী জিজ্ঞেস করলো এতো ভোরে এই ঠাণ্ডায় টিনা বাবা একা কোথায় যাচ্ছে!

"এমনি. একটু রাস্তা দিয়ে হেঁটে হাতিটিব্বার দিকে যাবো। আজ ওখান থেকে সূর্য ওঠা দেখবো।" টিনা একটু হেসে বললো।

সুজন অবাক হয়ে বললো একা ঐ জায়গায় যাওয়াটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না। ও জায়গা বড় খারাপ। দেওতাজীর অভিশাপ আছে। এসব তো টিনা বাবার জানা আছে।

টিনার হাসি পেলো—"কেন সুজন, কি অভিশাপ দিয়েছেন তোমার দেওতাজী?"

সুজন কিন্তু হাসলো না। মুখ আরও গম্ভীর করে বললো, টিনা বাবা যেন এখুনি ফিরে আসেন, নইলে ক্লার্ক মেমসাহেবকে বলে দেবে। ভার্মা মেমসাহেবকেও বলবে।

টিনা খুব হাসলো। ওর খুব ভালো লাগে অত্যন্ত চুপচাপ, শান্ত মানুষটির এমন আচমকা বকুনিতে। টিনাকে মাঝে মাঝেই ওর বকুনি শুনতে হয়। বিশেষ করে টিনা যখন আউট হাউসের পেছন দিকে ওদের ক্ষেতি দেখতে গিয়ে ঝুঁকে দাঁড়ায়। পাহাড়ের ঢালু গায়ে খানিকটা জায়গা নিয়ে সুজন কী সুন্দর ক্ষেত করেছে, করেছে অন্য বেয়ারারাও। আলু, টমেটো আর কি সব শাকের ক্ষেত। একটা ফালি মতো জায়গায় কিছু বজরা গাছও রয়েছে। কি যে ভালো লাগে থাকে থাকে এতো সবুজ দেখতে আর তক্ষুনি টিনার মনে পড়ে

যায় দাদুর বাড়ির কথা। ওখানেও কি সবুজ, কি সবুজ! তবে ওখানকার আকাশ এখানকার মতো অত নীল নয়।

মামারবাড়ির জন্য টিনার মন কেমন করে উঠলো আর এরপরেই চমকে দেখলো ও কখন এসে দাঁড়িয়েছে হাতিটিব্বার সামনে। মনে হয় সামনে,—আসলে অনেকটাই দূরে। প্রথম দেখলে মনে হয় পেছনের বরফ-পাহাড়ের গায়ে হেলান দিয়ে হাতি পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে। পাথর ক্ষয়ে গিয়ে ঠিক হাতির মতো চেহারা হয়েছে। চারখানা পিলার নেমে এসেছে চারখানা পায়ের মতো। আবার একটা মোটাসোটা শুঁড়। প্রকৃতির কি অপূর্ব খেয়াল! কি অদ্ভুত একটা পাথুরে ভাস্কর্য! কোন্ কালে এক সাহেব এই জায়গাটার নাম রেখেছিলেন পিলারস্ পয়েন্ট। আবার সানরাইজ পয়েন্টও বটে। সারা শহরের মধ্যে এখান থেকে সূর্যোদয় দেখার দৃশ্য সবচাইতে ভালো। এখানে দাঁড়ালে দেখা যায় দুদিকে কয়েক শো মাইল জুড়ে বরফের মেলা। প্রতিদিন সূর্যদেব যখন ওঠেন আর অস্ত যান, তখন বরফের এই লম্বা লাইনের গোটাটাই কালার্ড পিকচার হয়ে যায়। স্টিল নয়—মুভি। প্রতি মুহূর্তে থরথর করে কাঁপে আর রং পালটায়।

টিনা এসে যেখানে দাঁড়ালো, সেখানে অনেকটা লম্বা ফুট চারেক উঁচু দেয়ালের ওপর কাঁটাতার দেওয়া। সামনে একটা লোহার গেট। গেট পার হলে আবার কয়েক গজ সবুজ ঘাস আর পাথরে মেশানো খানিকটা সমান জায়গা। তারপরে কোন্ নীচু পর্যন্ত রাক্ষুসে গহ্বর! একটু ঝুঁকে দেখলে দেখা যাবে একটা ক্ষীণ পাহাড়ী নদী নুড়ির ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে। এসব বর্ণনা দিয়েছে রামবাহাদুর। এখানে যা কিছু ভয়াবহ, তাই নিয়েই রামবাহাদুরের বিশদ বর্ণনা। বিশেষ করে টিনা মেমসাহেবের মতো যদি অমন একটি উৎসুক মনোযোগী শ্রোতা থাকে।

লোহার গেটটা বন্ধ। তবে তার পাশে সরু ফাঁক আছে। একজন রোগা মতো লোক শরীরটাকে একটু বেঁকিয়ে ওপাশে যেতে পারে। এপাশে একটা ছোট প্লেটে লেখা আছে—হ্যাপি ভ্যেল।

রামবাহাদুর বলেছে, ওপাশে লেখা আছে সুইসাইড পয়েন্ট। সুতরাং সাবধান, উধার মত্ যাইয়ে। টিনার খুব হাসি পেল। কে কবে দেওয়ালের ওপাশের গায়ে সুঁচলো মুখ পাথর দিয়ে ঐ ভয়ঙ্কর কথাটা লিখে রেখেছে। একপাশে সুখ আর অন্য পাশেই মৃত্যু। যে লিখেছে সে দার্শনিক, রসিক দুইই। আর ঠিক ঐ জায়গাটায় দাঁড়িয়ে নীচের দিকে তাকালে তাই-ই নাকি মনে হয়। মিসেস ক্লার্ক বলেছেন, সুজন বলেছে, রামবাহাদুর বলেছে ঐরকম দেখতে গিয়ে অন্তত ডজনখানেক নারীপুরুষ ওখান থেকে পড়ে গিয়ে মারা গেছে। এদের মধ্যে দুটি ছেলেমেয়েকে তো মিসেস ক্লার্ক দেখেছেন, কত কথা বলেছেন। ছেলেময়ে দুটি সদ্য বিয়ে করে ঐ বর্ফক্ষর রাজ্যে এসেছিল হানিমুন করতে। ইনস্পেকসন বাংলোয় উঠেছিল। সকাল বিকেল হেঁটে হেঁটে ঐ দুটি ছেলেমেয়ে নিত্য নতুন পথ আবিষ্কার করতো, আর প্রতিদিন ওখানে দাঁড়িয়ে সানরাইজ দেখতো। এখান থেকে ফিরে যাওয়ার মাত্র একদিন আগে ওরা ঐখান থেকে পড়ে গেল। কোন্ নীচে ওদের ক্ষতবিক্ষত প্রাণহীন দেহ পাওয়া গেল। তারপর কত কাণ্ড, কত কি। এই ঘটনার পরেই তো ইট গেঁথে কাঁটা তার দিয়ে জায়গাটির শেষ সীমানার কিছুটা আগে পথ আটকে দেওয়া হয়েছে।

"ওখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেই হাতিটিব্বা নড়ে ওঠে, ওর শুঁড় নড়ে ওঠে, ওর চারটে পা দুলে দুলে নাচে আর যে লোক ওখানে থাকে, তাকে টেনে খাদে ফেলে।" সুজন বেশ ভীত কণ্ঠে টিনাকে কথাগুলি বলেছিল, আর তাই শুনে টিনা হাততালি দিয়ে হেসেছিল।

"বল যে ওখানে দাঁড়িয়ে নীচের দিকে তাকালে মাথা ঘুরে মানুষ পড়ে যায়। তা নয়, হাতি নেচে নেচে ডাকে, আর কত কি বলবে বল।"

টিনার রকম দেখে সুজন আর কিছু বলেনি। শুধু মুখ গম্ভীর করে রেখেছিল। দুদিন পরে টিনার ঘরে ফুল দিতে এসে খুব মিনতি

করে বলেছিল, ঝুলা দেবীর মন্দিরে ওর বহু পুজো মানত করেছে, টিনা বাবা যেন কিছুতেই ওদিকে না যায়।

"আচ্ছা ঠিক আছে, আমিও তোমাদের ঝুলা দেবীর মন্দিরে এই মানত করছি একদিন আমি ওখানে যাবো আর বেঁচেবর্তে ফিরে আসবো। আর তারপরেই আমি ঝুলা দেবীকে পুজো দেবো। তোমাদের অনেকগুলি প্রসাদী লাড্ডু খাওয়াবো"—উত্তরে সুজন হতাশ হয় মাথা নাড়তে নাড়তে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল।

সূর্যদেব উঠছেন। সামনের আকাশ জুড়ে রকমারি লাল রঙের খেলা। আবার তীরের ফলার মতো লাল রং বরফের পেছনে টান টান হয়ে আকাশের গায়ে ছিটকে আধখানা গোলের আকার নিয়েছে। সুন্দর। কি যে ভালো লাগছে টিনার। মনের এই ভালো লাগার মুহূর্তে হঠাৎ যদি শোভন পাশে এসে দাঁড়াতো! দু বছর আগে শোভন ফোন করে যা জানতে চেয়েছিল, আজকে এসে শোভন যদি ঐ একই কথা জিজ্ঞেস করে তবে কি টিনা সেদিনকার মতো চুপ করে থাকবে! 'মোটেই না, আমি বলবো, শোভন, তুমি আরও অনেক অনেক কথা বল, আমি শুনবো। তুমি যা জানতে চাইবে, বলবো। আমি তোমাকে বলবো শোভন তুমি কত বড় একটা পুরুষ মানুষ হয়ে গেছ। কি দীর্ঘ, সুঠাম, সতেজ বুদ্ধিদৃপ্ত চেহারা তোমার। শোভন, আজ আমি সবকিছু ছিঁড়ে, ভেঙে তোমার প্রশ্নের উত্তর দেবো। তোমার পাশে গিয়ে দাঁড়াবো। তুমি আমার কাছে একবার এসো।' টিনা কার ভীত ডাকে পেছনের দিকে তাকালো। সুজন ছুটে আসছে। "টিনা বাবা, উধার মত যাইয়ে।" এই সরল লোকটার প্রাণে কি মমতা!

টিনার মজা লাগলো। টিনা সুজনকে ভয় দেখাবে। টিনা যদি এক্ষুণি গেটের পাশের ফাঁকটুকু দিয়ে ওদিকে যায়, হাতিটিব্বা নাচবে না, তার চারটে পাও নাচবে না, নাচতে থাকবে সুজন। ভীত বিবর্ণ মুখে টিনার নাম ধরে ডাকবে আর নাচবে। ব্যাপারটা কল্পনা করেই টিনার অদ্ভুত মজা লাগলো। এরপর যখন সুজন সারাদিন ধরে

টিনাকে বকতে থাকবে, ভয় দেখাবে, মিসেস ক্লার্ককে বলে দেবে, ডার্মা মেমসাহেবকেও বলবে, তখন ওর মুখের দিকে টিনা মুগ্ধ হয়ে দেখবে মানুষের মুখ কত পবিত্র, কত সুন্দর।

ফাঁকা জায়গাটুকু দিয়ে গলে ওপাশে যেতেই জুতো মোজা পরা পায়েও জ্বালা ধরলো। কি কাণ্ড! পাহাড়ী লাল পিঁপড়ের বাসা, তার মাথায় পা! তাই নাইলনের মোজা ভেদ করেও পায়ের চামড়ায় হুল ফোটানোর জ্বালা। টিনা একটু সামনের দিকে এগিয়ে গেল, তারপর দেয়ালটা ঘেঁষে দাঁড়ালো। টিনা দেখলো কয়েক ইঞ্চি দূরেই এব্ড়ো খেব্ড়ো করে লেখা রয়েছে সুইসাইড পয়েণ্ট। অস্পষ্ট, কিন্তু লেখাটা মুছে যায়নি। টিনা একটু দেখবার চেষ্টা করলো নীচে কারও নাম লেখা আছে কি না। কিছু দেখতে পেলো না।

টিনা এবার সামনের দিকে তাকালো। হাতিটিব্বা ঘন মেঘের রং মেখে দাঁড়িয়ে আছে। সূর্য যত আকাশপথে এগোতে থাকবে, বরফ পাহাড়েরও রং বদলাবে, সঙ্গে সঙ্গে রং পালটাবে হাতিটিব্বার। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই হাতিটিব্বা একেবারে স্বাভাবিক পাহাড়ে রং মেখে দাঁড়িয়ে থাকবে।

হাতির সঙ্গে কি আশ্চর্য মিল হাতিটিব্বার! খানিকটা তাকালেই থাকি মনে হয় এই বুঝি হাতিটিব্বার শুঁড় তুলে উঠলো, চারটে পা নাচড়া করলো।

টিনার শ্বাস বন্ধ হয়ে এলো, হাতিটিব্বা তো সত্যিই নড়ে উঠেছে, ওর শুঁড় তুলছে। সামনের দিকে পা ফেলে ফেলে ও দিব্বি এগিয়ে আসছে। নিশ্চয়ই আসছে। এতে কোন ভুল নেই, অবিশ্বাস নেই।

সুজন পেছনে এসে "টিনা বাবা" বলে ওরকম চীৎকার করে উঠলো কেন! সুজন টিনার চাদরটা জোরে টেনে ধরলো। গা থেকে চাদরটা খুলে সুজনের হাতে চলে গেল। সুজনের ভয়ঙ্কর চীৎকারে পাহাড়ের গা ফেটে ফেটে গেলো। চারদিক থেকে অনেকগুলি চীৎকার প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে এলো। একই সঙ্গে আর্তনাদ করে উঠিয়ে উঠলো যে-কজন ভ্রমণার্থী এদিকে বেড়াতে এসেছিল।

ঊনচল্লিশ হাজার ফুট উঁচু দিয়ে উড়ে আস্ছে প্যান অ্যামের জাম্বো। দেশে ফিরে আসছে সমীরণ ব্যানার্জী তার স্ত্রী জয়া ব্যানার্জী। ছেলেমানুষী খুশীতে টগ্‌বগ করে ফুটছে জয়া ব্যানার্জীর মন। আর মাত্র ঘণ্টা কয়েক তারপর পালম, এয়ারপোর্ট। দিল্লীতে কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম নিয়ে ট্রেন ধরে, তারপর দিন ছোট পাহাড়ী স্টেশনে পৌঁছে সেখান থেকে ট্যাক্সি করে সোজা হোটেল ভন। আগের থেকে কোন খবর নয়। আচমকা মেয়ের সামনে গিয়ে দাঁড়ানো। বুড়ির মুখখানা তখন কেমন দেখাবে!

"বুঝলে, মনে হচ্ছে প্লেনটা যথেষ্ট জোরে যাচ্ছে না।" জয়া ব্যানার্জী ছটফট করে উঠলো।

সমীরণ ব্যানার্জী স্ত্রীর কথা শুনে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে একটু হাসলো, তারপর বললো, "তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে জয়া মহাভারতের গল্প। বক রাক্ষসরূপী ধর্ম দেবতা যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞেস করছিলেন— পৃথিবীর মধ্যে সবচাইতে দ্রুতগামী কি! যুধিষ্ঠির উত্তর দিয়েছিলেন— মন। সুতরাং তোমার মনের সঙ্গে এখন চাঁদে যাওয়ার রকেটও পেরে উঠবে না।"

"যা বলেছো। আমাদের টিয়াপাখিটার জন্য যে বড্ড মন কেমন করছে।"

"আমরা তো ওর কাছেই ছুটে যাচ্ছি" সমীরণ ব্যানার্জী জয়া ব্যানার্জীর হাতের ওপর হাত দিয়ে চেপে ধরলেন। সত্যিই মেয়েটার জন্য মন কেমন করছে।

প্লেনটা বাম্প্ করছে। নিশ্চয়ই এয়ার পকেটে পড়েছে। এই সময় বড় অসোয়াস্তি হয় জয়া ব্যানার্জীর ডাক্তারের উপদেশ মতো জয়া ব্যানার্জী তাড়াতাড়ি একটা ট্রাঙ্কুইলাইজার খেয়ে নিল। মাথাটা পেছন দিকে হেলিয়ে দিয়ে চোখ বুজলো। ঘুম আসছে। খুব গভীর নিশ্চিন্ত সুখী সুখী ঘুম।
